বুদ্ধদেব বসু

মৌলিনাথ

ডি. এম. লাইব্রেরি

৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট

কলকাতা ৬

১

একটি গ্রীষ্মের সকাল

১

সকালবেলাটি জ্যোতির্ময় হ’য়ে দেখা দিলো। কাল রাত্রে যে বৃষ্টি হয়েছিলো আকাশে তার চিহ্নমাত্র নেই, বাতাসে আছে তার স্মৃতি। আজ আকাশ কূলে-কূলে নীল, আয়োজন-উজ্জ্বল, দিগন্ত থেকে দিগন্তে অবারিত। মেঘ নেই, এক ফোঁটা শাদা মেঘও লেগে নেই কোথাও; নগ্ন বিশাল উন্মুক্ত আকাশ থেকে রৌদ্র ঝরছে অপরিমাণ আবেগে, যেন সূর্যদেব তাঁর শাশ্বত পিতৃত্ব ভুলে প্রেমিকের রূপে দেখা দিয়েছেন, তাঁর অজস্র তারুণ্যের তেজে প্লাবিত ক’রে দিচ্ছেন তাঁর কন্যকা এই পৃথিবীকেই। স্থিরমতি অবিচল পৃথিবীর মাতৃত্বময় হৃদয় থেকে নিশ্বাস উঠছে উত্তরে—ক্লান্তির নয়, সহিষ্ণুতারও না, বরং সুখের, তৃপ্তির, যেন বহুকাল ভুলে-থাকা কোনো বিরহের আকস্মিক অবসানের তপ্ত শ্বাস। তাপ উঠছে মাটির বুক থেকে, সূক্ষ্ম তাপ, তাতে ক্লেশ নেই, তীব্রতার সূচীমুখের প্রথম সুখকর স্পর্শটুকু মাত্র, যে-স্পর্শ হাওয়াতেও এখনো লাগেনি—সেই হাওয়া, যে ভুলতে পারেনি হ’য়ে-যাওয়া বৃষ্টিকে, অথচ আজকের উজ্জ্বলতাকেও মেনে নিয়েছে—শুধু মেনে নিয়েছে তাও নয়, তাকে স্নিগ্ধ ক’রে তুলছে কালকের স্মৃতিকণার মৃদুতা পৃথিবী ভ’রে ছড়িয়ে দিয়ে। আশ্চর্য লীলা সৌরমণ্ডলের, আশ্চর্য সকাল। আশার যদি কোনো রূপ থাকতো, উৎসাহের যদি কোনো ছবি হ’তো, এই সকালটি যেন তা-ই। গ্রীষ্মের যে-প্রাণসাধনায় পূরীষে ফুল ফোটে, জঞ্জালের স্তূপ মাটিতে মিশে তার উর্বরতা বাড়ায়, এবং ফুল-ঝরানো শুকনো তাপে পুড়ে-পুড়েই আমের বুকে ঘনমধুর জ’মে ওঠে, তারই উদ্দীপনা এই রৌদ্রে, তারই কল্যাণময় প্রণয় এই হাওয়ায়। এ-রকম সকাল বছরে একটি-দুটির বেশি আসে না; চৈত্র-বৈশাখের কোনো এক

অপ্রত্যাশিত তিথিতে হঠাৎ সে দিনের দিগন্তে এসে দাঁড়ায়;—পৃথিবীর লোক বাজার করে, রান্না করে, আপিশে যায়; হয়তো ও-সব করতে তাদের ভালোই লাগে সেদিন, কিংবা একটু বেশি ভালো লাগে, কিংবা হঠাৎ বোঝে, বুঝে অবাক হয়, কেমন একরকম বিনম্র বিস্ময়ে পথের ধারে ঘুঁটের গন্ধে চকিতে উপলব্ধি করে যে ও-সব কাজ—যাতে মনে হয় কষ্ট ছাড়া কিছু নেই—ও-সব কাজ প্রতিদিনই ভালো লাগে তাদের, ও-সব আছে ব'লেই বেঁচে থাকা সার্থক। হয়তো রাস্তায় বেরিয়ে জোরে নিশ্বাস নেয় কেউ, মনে হয় ফুশফুশে বেশি হাওয়া যাচ্ছে, হয়তো মনে-মনে একবার বলে, 'বাঃ, বেশ তো!'—আর রোগশয্যায় শুয়ে কেউ হয়তো ভাবে, 'আজ আমি ভালো আছি'—কেন ও-রকম হয় কেউ বোঝে না।

যে-কোনো শহরে, যে-কোনো ভিড়ে, যে-কোনো কলকারখানা বস্তিধোঁয়ার চ্যাঁচামেচি নোংরামির মধ্যে এই সকালটি সুন্দর হ'তো, কিন্তু এর আনন্দময় মদির মূর্তিটি এমন পরিপূর্ণ ক'রে অন্য কোথাও কি প্রকাশিত হ'তে পারতো, যেমন হয়েছে এই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে? নামের মধ্যে প্রাচীনতা নিয়ে নতুন গ'ড়ে উঠছে পাড়া—ঠিক পাড়াও হয়নি এখনো, হবে ব'লে উদ্‌যোগ মাত্র শুরু করেছে। এখনো বেশির ভাগই মাঠ, যার বুক চিরে সিঁথির মতো পথ বেঁকেছে, যার গর্ত ঘাস আগাছা খোদলের স্বচ্ছন্দ প্রচুরতার ফাঁকে-ফাঁকে এখন পর্যন্ত চারটি কি পাঁচটি যা বাড়ি উঠেছে, তা প্রান্তরের সহজ বিস্তারে বাধা না-দিয়ে ঠিক সেইটুকু যেন যোগ করেছে শুধু, যেটুকু না-হ'লে, মানুষের হাতের হালকা ষেই ছোঁওয়াটুকু না-পেলে প্রকৃতি ঠিক প্রস্ফুটিত হয় না, সম্পূর্ণ হয় না। শহরের বাইরে বসতি। মাইলখানেক দক্ষিণে, রেললাইনের ঘুণ্টি-গেট

পেরিয়ে, তবে আরম্ভ হ'লো শহর, গন্ধে আর গোলমালে ভরা ঢাকার শহর, যার বিখ্যাত ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়ার খুরে ঐতিহাসিক ধুলো উড়ছে, হাওয়ায় যার প্রাদেশিক ভাষার লয়দার আলস্য ছড়ানো, আর তারই সঙ্গে ককনি বুলির প্রখর স্বর—বণিকশ্রেণীর কড়া অথচ মিষ্টি টান, আর তার চেয়েও বিশিষ্ট, আশ্চর্য, একেবারেই স্থানীয় এবং স্বতন্ত্র, উর্দু-বাংলার তিনমিশোলি রবোল্লাস—আর যার, যেই পুরোনো এবং পরিতৃপ্ত শহরের, শাঁখা শাড়ি বাখরখানির অলি-গলি এঁকে-বেঁকে শেষ হয়েছে বিশীর্ণ বুড়িগঙ্গার ধারে নবাব-বাড়ির লাল পাথরের সূর্যাস্তচ্ছটায়। এই ঢাকা, যা লক্ষণযুক্ত, চিহ্নিত, সময়ের স্বাক্ষরে প্রামাণ্য এবং জীর্ণতাস্পৃষ্ট, তার সঙ্গে আড়ি ক'রে, রেষারেষি ক'রে, অথচ অস্তিত্বের জন্য তারই উপর নির্ভর ক'রে স্ফুট হয়েছে উত্তরবর্তী অভিনব রমনা, বাতিল-হওয়া বঙ্গভঙ্গের সুখস্মৃতিবহ উপনগর—কিংবা উপবন—বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন, জ্ঞানী, গুণী, ছাত্র—ছাত্রী—মহিলামুক্তির বিহারভূমি, আধুনিকতার পীঠস্থান।

এই রমনারই পূর্ব প্রান্তে, আকাশে-বাতাসে তারই সমান অংশীদার, কিন্তু গৌরবের ভারে গম্ভীর নয়, অপরিণত, সদ্য-আরব্ধ, জায়মান পুরানা পল্টন। দক্ষিণে তার মাইল-ছড়ানো মাঠ, দূরের দিকে ফুটবল খেলার জনতালোভন প্রাঙ্গণ, কিন্তু কাছে এলে শুধুই প্রান্তর—হাওয়া আর আলো ছাড়া কিছুই খেলে না সেখানে;—আর প্রান্তর-পাড়ার সীমান্তরেখাও স্পষ্ট হ'তো না, যদি-না দাঁড়াতো, দাঁড়িয়ে থাকতো, ম্যুনিসিপালিটির কাঁচা রাস্তায় শুকনো পাতার বংশাবলী ঝরিয়ে, আকাশ ভ'রে অবিরল মর্মরধ্বনি তুলে, অচল-চঞ্চলের মিলন-তোরণের মতো উন্নত প্রশস্ত বলীয়ান একটা বটগাছ। শুধু দক্ষিণে নয়, চারদিকেই তার

সবুজ, উত্তর পুব গ্রাম্য উচ্ছ্বাসে ঘনশ্যামল, আর কোথাও-কোথাও সেই সব সেগুনের ভিড়ে নিবিড়, যাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী কাটা পড়েছে পুরানা পল্টনকে বাসযোগ্য করতে। শুধু ক-টি বাড়ি ছাড়া বানানো কিছুই চোখে পড়ে না আশে-পাশে, যদি-না তথ্যের খাতিরে স্বীকার করা হয় ছোট্ট একটা টিলাকে, বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু একটা ঢিপি, পাড়ার নামের সামরিক ইঙ্গিতটুকু যার দান, আর যার গায়ে, ঐ ইঙ্গিতটিকে কিঞ্চিন্মাত্র সার্থক ক'রে, এখনো মাঝে-মাঝে আঘাত করে সেপাইনবিশের বন্দুকচর্চার প্রতিধ্বনি। সব মিলিয়ে পুরানা পল্টনের ভাবটা ভারি ছেলেমানুষি, শুধু নতুন ব'লে নয়, এলোমেলো সবুজ ব'লে নয়, অসমাপ্ত ব'লে, সমাপ্য ব'লে—এর সমস্তটাই যেন হ'য়ে-ওঠা, হ'য়ে-উঠতে-থাকা, কিশোর—মানে, কৈশোরের সেই লাবণ্যে জড়ানো যার নিজেকেই সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই, অথচ যে নিজেকে ঠিক জানেই না এখনো—শুধু অপরিণত নয়, পরিণতির যোগ্য, অপরিণামদর্শী। যা-কিছু বয়স্ক, আত্মচেতন, শৃঙ্খলাবদ্ধ, তার যেন স্থান নেই এখানে, যা-কিছু দায়িত্বের ভারে মন্থর এবং মূল্যবান সব যেন অবান্তর; দেয়ালে এখনো গৌণ, আশ্রয় ছাড়িয়ে আকাশের অনিশ্চয়তাই বিস্তীর্ণ, মানুষ এখনো সমর্থ এবং অত্যন্ত হ'য়ে উঠে পরিবেশের প্রভুত্বপ্রয়াসে নামেনি।

পাড়াটা মনে-প্রাণে তরুণ, এই হ'লো কথাটা। আর তাই এই অলৌকিক সকাল, উত্তরায়ণে প্রগতিশীল যুবা সূর্যের এই অমূল্য উপঢৌকন, দিনের বৃন্তের উপরে কম্পমান অচিরস্থায়ী এই সকালবেলাটি—সে যেন তার দেবশৈশব নগ্নতা, তার স্বচ্ছ স্বাধীন অপরূপ সৌন্দর্য, সমস্ত উন্মোচিত ক'রে এখানে দাঁড়িয়েছে। আলো, আনন্দ, উৎসাহ,

একটি গ্রীষ্মের সকাল

অনুপ্রাণনা—শুধু-যে বাইরে খোলা মাঠে আকাশের তলায় তরঙ্গ তুলেছে তা নয়, দেয়ালের সীমার মধ্যেও নিশ্বাস ছড়ালো তার, আলোর নিশ্বাস, সূর্যের উজ্জীবনী সত্তাসার। পুরানা পল্টনে ঘর বলতে যে-ক-টি আছে তার মধ্যে এমন নেই যেখানে আজ সকালবেলার সোনার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা পায়নি। বিশেষত একটি ঘরে—ছোটো একটি একতলা বাড়ির সিঁড়ি উঠে প্রথম ঘরটিতে—সেখানে যেন ঘর আর নেই, এমন বান ডেকেছে আলোর, এমন অবিরল অথচ মৃদুমন্দ হাওয়া, আর এমন অবারিত আলিঙ্গন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আকাশের। ঘরটি ছোটো, তার উপর চার-পাঁচটা জানলা-দরজা এমনতর বেপরদারকম খোলা যে বাইরে থেকে কেউ এলে হয়তো মনে হবে সে বাইরেই আছে এখনো—ঠিক তাও নয়, বাইরেটাকে ঠিক উপলব্ধি করবে এখানেই, কেননা ঐ অল্প একটু দেয়ালের বাধায় অসীম যেন সীমার মধ্যে গ্রাহ্য হয়েছে, অর্থ পেয়েছে, পেয়েছে স্পষ্টতা, যাথার্থ্য, সুষমা, রূপ—মনে হবে আকাশ যেন সহনীয় হ'য়ে, বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে নেমে এসেছে ঘরের মধ্যে, যেন এই সকালবেলার বলতে-না-পারা ব্যাকুলতা হঠাৎ এই ঘরের মধ্যে গুনগুন গান হ'য়ে উঠলো। সত্যি সে শুনবে—যদি কেউ এখন এই ঘরে আসে—শুনবে মৃদু স্বরের গুনগুনানি, মৃদু, অপরিস্ফুট, কিন্তু আবেগময়, আবেগের ছন্দে বাঁধা;—সত্যি শুনবে ছন্দ যদি মন দিয়ে শোনে, বিদেশী ভাষায় কোনো-এক আনন্দে ভরা বেদনার সুর, স্বপ্নে-পাওয়া কথা, কবিতা। কবিতা—অনির্বচনীয়কে ব্যক্ত করার এই মায়াজাল, এই হৃদয়গ্রাহী ছলনা, তাতে—ঠিক তাতেই—ধ্বনি পেয়েছে অপরূপ সকালবেলাটি, বাণী পেয়েছে নিঃশব্দ নীলিমা। ঐ সকালবেলার আলোর খেলাঘরে ইংরেজি কবিতা পড়ছে একলা ব'সে একজন যুবক।

যুবক ? সন্থ যুবক, কিশোর, কিশোরের চেয়ে যুবক বেশি, সমবয়সির তুলনায় যুবক বেশি। শৈশবে যে তার শ্রী ছিলো না, স্বাস্থ্য ছিলো না, কৈশোরের প্রথম আঘাতেই শরীরে যে তার গচ্ছিত গোপন লাবণ্য ফুটেছিলো, বয়ঃসন্ধির সংকটকালে সে যে যন্ত্রণায় ম'রে গিয়েছিলো প্রায়, আবার সেই জন্মান্তর সাধিত হওয়া মাত্র সে যে স্বচ্ছন্দে অধিকার করেছিলো তার রাজত্ব, তার যৌবরাজ্য—এই পৃথিবী—আর এখন সে যে যৌবনের আবেগে, জীবনের আবেগে কম্পমান, অসংখ্য তীব্র অনুভূতির আকাশপাতাল উথালপাথালে অবিরাম অস্থির—এ-সমস্তই লেখা আছে তার মুখে, যার দৃষ্টি আছে তার জন্য পরিষ্কার লেখা আছে। তেমন ক'রে তার দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে জন্ম থেকেই যৌবনের জন্য সাধনা করেছে তার দেহমন, যে ছোটো ছেলে হ'য়ে বেঁচে থাকতে সত্যি তার ভালো লাগেনি কখনো, শৈশবস্মৃতির কিছুই এখন মূল্য নেই তার কাছে—শৈশবটা বলতে গেলে অবান্তর তার জীবনে—কখনো নিশ্বাস ফেলে না বালগোপাল ছেলেবেলার জন্য, ঐ অপরিহার্য বছর ক-টা কাটিয়ে উঠে সে বেঁচেছে, সত্যি বেঁচেছে, বাঁচতে সত্যি শুরু করেছে ডুবতে-ডুবতে কৈশোরের ঘূর্নি পেরিয়ে যৌবনের তীরে পা দেবার পর থেকে। ঠিক যে এখনো শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে তা নয়, কিন্তু ভঙ্গি খুব সহজ, যেন আঙুল-তোলা আদেশের ভাব, কেননা এটা বুঝেছে যে সে পৌঁচে গেছে, এখন এই পৃথিবী তাকে কিছুই না-দিয়ে পারবে না, শুধু সে ইচ্ছে করলেই যৌবনের বন্ধুদূত জীবনের যে-কোনো দরজা খুলে দেবে তার জন্য ; তার ঈষৎ ফোলা-ফোলা নীলচেমতা চোখের পাতায়, তার ঠোঁটের সবল অথচ সুকুমার ভোগেচ্ছু ভঙ্গিতে, এই কথাই যেন লেখা আছে যে যৌবনের আবিষ্কারে কখনোই সে ক্ষান্ত হবে না, ক্লান্ত

হবে না—যেন সে সেই দুঃখে-দাগানো শান্তিহীন মানুষদেরই একজন হ'য়ে জন্মেছে, যারা যৌবনের অচিরস্থায়িতায় বিশ্বাস করে না। এই যুবক, সে যে উত্তরকালে জীর্ণ দেহেও বুড়ো হ'তে চাইবে না, আপত্তি করবে, অস্বীকার করবে, তথ্যটাকে উড়িয়ে দেবে রীতিমতো, এবং খুব সম্ভব সে এত বড়োই দুর্ভাগা যে বুড়ো হ'তে সত্যি কখনো পারবেও না—হয়তো এই কথাও ধরা পড়বে যদি তেমন দ্রষ্টা কেউ লক্ষ্য করে এখন তার মুখের দিকে।

সুশ্রী মুখ। ঠিক মনোহর না হোক, প্রীতিসঞ্চারী। গাল দুটি ঈষৎ ভেঙেছে, বাল্যোচিত পেলব স্ফীতিটুকু ঝরিয়ে দিয়েছে সময়মতো—কিংবা হয়তো ঠিক সময়ের একটুখানি আগেই—কিন্তু বালকের শ্যামলিমা—দৈবাৎ যারা ধবধবে ফর্শা হ'য়ে না জন্মায় সেই সব বাঙালি বালকের তরুণ গাছপালার মতো শ্যামলিমা—কোনো যাত্রার দলের বিড়ি-ফোঁকা কৃষ্ণের মুখে যার বিস্ময়কর পরম প্রকাশ হঠাৎ কখনো নিশ্বাস কেড়ে নেয় আমাদের—সেই শ্যামলিমার আভা মোছেনি মুখ থেকে, কেননা—একটু তাকালেই বোঝা যায়—মুখখানায় ক্ষৌরকর্মের প্রয়োজন যদিও ঘটেছে, সেটা কৈশোরের চিহ্নাশক নিত্যকর্মে পরিণত হ'তে দু-এক বছর দেরি আছে এখনো ;—বয়স তার আঠারোর বেশি না, বড়ো জোর সবেমাত্র উনিশ। এখন, এই আনমনা কিংবা একমনা মুহূর্তে, যখন সে কবিতা ছাড়া কিছু ভাবছে না—কিংবা কিছুই ভাবছে না, শুধু ছন্দের নেশায়, ধ্বনির আনন্দে ভরপুর হ'য়ে আছে—এখন তার বয়সের লক্ষণ, হয়তো তার স্বভাবেরও লক্ষণ, স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার মুখে : মুখের ভাবটি নিষ্পাপ, স্বার্থপর, কূটচক্রী ; সরল, পবিত্র, অথচ স্পৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট, হঠকারী, যেন অবিচারে অপ্রতিরোধ্য তার

প্রবণতা, যেন, এমনকি, নড়তে-থাকা ভোগেচ্ছু ঠোঁট দুটিতে কোথায় যেন, কখন যেন, নিষ্ঠুর। আত্মবিরোধী মুখ, সৌষম্যহীন, হঠাৎ বাধা পেয়েছে থুতনিতে এসে—ছোটো থুতনি, বেসুরো, ছন্দোপাতক, ছোট্ট একটি মেয়েলি টোলের আভাসমাত্র ফুটিয়ে যেন ফাঁকি দিয়েছে তাকে, ধরিয়ে দিয়েছে তার মৌল ছেলেমানুষি, তার দুর্বলতা, অনতিক্রম্য অসহায়তা—আবার সেই সঙ্গেই এঁকে দিয়েছে যেন অনাক্রমণীয় আভিজাত্যের টীকা তার কপালের গর্বিত নীল শিরায়, এঁকে দিয়েছে উন্নত নাকের ঋজু-নেমে-আসা রেখায় ত্যাগের, দুঃখের, পরিশ্রমের, আত্মপীড়নের প্রতিজ্ঞা। সুন্দর মুখ, কিন্তু গূঢ় কোনো পোকায়-ধরা সুন্দর; অনম্য নিয়মের, অমিত স্বেচ্ছাচারিতার মুখ; সংযমের, প্রশ্রয়ের, বীরের, পলায়নপন্থীর মুখ; অর্জুনের মুখ, অন্যায়রকম সৌভাগ্যভাগী কৃষ্ণসখার;—কবির মুখ, সত্যি বলতে—শিল্পীব মুখ।

এই যুবক, তরুণ, কবিতায় আর তরুণতায় বিহ্বল এই মানুষ—কবি, কবিকিশোর—সে-যে ব'সে-ব'সে গুনগুন কবছে কবিতা, এর চেয়ে স্বাভাবিক—যখন পৃথিবীতে যেন স্তব্ধতা আর উজ্জ্বলতা ছাড়া কিছু নেই, তখন এর চেয়ে সুসংগত আর কি কিছু হ'তে পারে? যে-কবিতা তার মনে পড়েছে আজ, স্বতই উঠে এসেছে মুখে, তাও ঠিক শোভন, সমঞ্জস—বলা যেতে পারে যথোচিত, মান্য—তাও ঠিক মিলে গেছে আশে-পাশের সমস্ত-কিছুর সঙ্গে, যেন গ'লে যাচ্ছে—মুখ থেকে বেরোনোমাত্র গ'লে যাচ্ছে হাওয়ায়, সোনালি-সবুজ সুন্দর ভঙ্গুব এই বৈশাখের সকালবেলায়। এই বাংলায়, বাংলার মাতাল-ক'রে-দেয়া বৈশাখী উত্তাপে, কোনো-এক সম্ভবপর কবির মুখে নিঃসৃত হচ্ছে সুইনবর্ন—সুইনবর্ন, কবিদের মধ্যে দানবিক ছেলেমানুষ; চিরকুমার, কামাতুর—কৌমার্যের

অক্ষম কামোন্মাদনায় হিংস্র; শুধু সাহিত্যের সংরাগ ঢেলে প্রেমের জ্বালা জুড়োবার ব্যর্থতায় যে আরক্তিম, রক্তাক্ত; ধ্বনিময় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভিত্তিহীন প্রাসাদের কারুশিল্পী; প্রগল্‌ভ কবি, অর্থহীন, অসংবৃত; স্বতোচ্ছ্বাসিত, আত্মময়, কৃত্রিম,—মোহাচ্ছন্ন এবং মোহজাতক, শুধুই মোহজাতক—ছেলেমানুষ। টেবিলের উপর খোলা আছে এই কবির কাব্য—আর তার পাশেই, যেন এই কবিতার সমস্ত তিক্ত মাধুরীতে মূর্ত ক'রে, এই উন্নয়মান সূর্যের বন্যাকে সংহত, সুস্মিত এবং ইন্দ্রিয়লোভন ক'রে, প'ড়ে আছে শাদা পাথরের থালায় কয়েকটি রোদ্দুর রঙের চাঁপা, মাংসল, উদ্ধত, পীন, রূপে নির্লজ্জ, স্পর্শে নির্ভয়, রৌদ্রের নিবিড়চুম্বিত ঘ্রাণভাণ্ডার। কিন্তু চাঁপার গন্ধের স্বতন্ত্র কোনো চেতনা নেই যুবকটির—অন্তত তা-ই মনে হয় তার হাতের অসতর্ক ভঙ্গি দেখে, যে-হাতে একটি ফুল তুলে সে তখনই আবার ফেলে দিলো—বইয়ের দিকেও চোখ নেই তার, তাকিয়ে আছে বাইরে, চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে, যে-ভাবে মানুষ শরীরটাকে নিষ্ক্রিয় রেখে ভিতরে-ভিতরে মনের তাপে জ্বলতে থাকে, সেই রকম এলিয়ে-থাকা অলস জীবন্ত ভঙ্গিতে। মাথা ভরা লম্বা ঘন চুল তার, একটু কোঁকড়া, বেশামাল, একটি এইমাত্র লুটিয়ে পড়লো কানের কাছে, সেইটি সে এক আঙুলে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে জড়াতে লাগলো, আর বলতে লাগলো গুনগুন ক'রে সেই কথা, যে-কথা বলতে চুম্বনের মতো আনন্দ ছড়ায় তার শরীরে:

'There lived a singer in France of old
By the tideless dolorous midland sea,
In a land of sand and ruin and gold
There shone one woman—and none but she.'

আবার বললো থেমে-থেমে, যেন রসনার সমস্ত আস্বাদ দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দকে আপ্লুত ক'রে-ক'রে আবার বললো, 'In a land of sand and ruin and gold'। নিশ্বাস পড়লো তার, নিশ্বাসের সুরে বললো, 'কী সুন্দর! কী সুন্দর!' কিন্তু ব'লে কী হবে, সুন্দরের কি কোনো ভাষা আছে? যে নিজেই পূর্ণপ্রকাশিত তাকে আবার প্রকাশ করবে কে? কিন্তু তবু—কত ভাগ্যে ভাষা আছে, ধ্বনি আছে, আছে বাণী—কবিতা—নয়তো এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য কেমন ক'রে সহ্য করতো মানুষ? কত ভাগ্যে তার জন্য সাজানো আছে—তার হাতের কাছেই, এমনকি তার মনেরই মধ্যে সাজানো আছে সুইনবর্নের স্তবকের পর স্তবক, নয়তো আজ ঘুম থেকে উঠেই চারদিক থেকে এই সুন্দরের আঘাত, এই আক্রমণ, প্রত্যক্ষ অত্যাচার—সে-ই বা সহ্য করতো কেমন ক'রে? মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলো সে, যেন প্রত্যক্ষের দখল ছাড়াতে, যেন সুখভোগের ক্ষণিক বিলাসী ক্লান্তিতে, কিন্তু হঠাৎ চাঁপার গন্ধ যেন লুকিয়ে-থাকা বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো তার উপর, আহত হরিণের মতো কেঁপে উঠলো সে, তারপর চোখ মেলে, যেন সমস্ত দৃষ্টিকে বাইরের গভীরতায় প্লাবিত ক'রে দিয়ে, আবার মৃদুস্বরে আরম্ভ করলো :

'Wilt thou yet take all, Galilean? but these thou
shalt not take,
The laurel, the palms and the paean, the breasts of the
nymphs in the brake.
Breasts more soft than a dove's—'

হঠাৎ বাধা পড়লো কবিতার আবৃত্তিতে; ব'লে উঠলো, 'আরে!' ঐ বটগাছের কাছে, মুনিসিপালিটির শাদা ধুলোর রাস্তা যেখানে বেঁকেছে, সেখানে একটি ঘোড়ার গাড়ি এইমাত্র মোড় নিলো।

২

পুরানা পল্টনে ঘোড়ার গাড়ির আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কালে-ভাদ্রে দু-একটি আসে; আর আসে যখন, প্রায় আগে থেকেই ব'লে দেয়া যায় ঐ অল্প ক-টি বাড়ির মধ্যে কোনটি তার গন্তব্য। যদি পিচের রাস্তা ছেড়ে ডাইনে বেঁকে একটু পরেই আবার বাঁয়ে ফেরে, তাহ'লে অবশ্য বুঝতে হবে যে বকুলবাটিকায় বেড়াতে এলেন ঈশানবাবুর মোগলটুলির আত্মীয়রা। আর যদি সোজা চ'লে যায়, যদি বটগাছ পেরিয়েও এগিয়ে চলে, তাহ'লে কমলেশবাবুর বাড়ির সামনেই থামতে হবে—যদি-না—তাও হয় ক্কচিৎ কখনো—নয়নেন্দুর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন সুদূর ফরিদাবাদ থেকে তাঁর ভাগ্নি-জামাই। কিন্তু বটগাছ থেকে যে-গাড়ি বাঁয়ে ফেরে, সেটি—হয় সেটি যাচ্ছে ঐ যেখানে নতুন বাড়ি উঠেছে সেখানে—যার ছাদ-পেটানো গানের সুর দুপুরগুলিকে উদাস ক'রে দেয় আজকাল—আর নয়তো সেটি দাঁড়ায় সেই একতলাটির সামনেই, যার জানলা-খোলা ঘরে একজন সদ্যযুবকের পদ্য আওড়ানো হঠাৎ এইমাত্র থেমে গেলো।

চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসলো সে, ভালো ক'রে গাড়িটার দিকে তাকালো। বাড়ি কদ্দুর উঠলো, তা-ই দেখতে মহিলাগণ আসছেন? কিন্তু কেন এ-সব অনর্থক প্রশ্ন, কেন আর নিজের মনে লুকোচুরি? সে তো, জানে, গাড়িটায় প্রথম বার চোখ পড়ামাত্র সে তো জেনেছে, তার চোখে পড়েছে—গাড়ি যখন মোড় নিচ্ছে ঠিক তখনই চকিত নিশ্চিত একটিমাত্র মুহূর্তেই সে দেখে নিয়েছে এক টুকরো নীল, নীলের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আভা, হাঁটুর উপর শাড়ির ভাঁজের মিলিয়ে-যাওয়া নির্ভুল নীলিমা—আর তারপর তার দ্রুত-হওয়া হৃৎপিণ্ড অন্য সব কথা

তাকে ব'লে দিয়েছে। নীল, আকাশ-নীল, হালকা-নীল, স্বপ্ন-নীল। চিত্রা পরে ব'লেই ঐ রং তার ভালো লাগে? না কি তার ভালো লাগে ব'লেই চিত্রা পরে? কী জানি, এখন আর মনে পড়ে না। আর কী-বা এসে যায় তাতে—যা-ই হোক আর না-ই হোক। চিত্রা যা করে তা-ই তার ভালো লাগে; তার যা ভালো লাগে তা-ই করে চিত্রা। ও-দুয়ে তফাৎ নেই আর; মিশে গেছে, এক হ'য়ে গেছে। এখন, গাড়ি এগিয়ে আসতে, আরো স্পষ্ট হ'লো শাড়ির রং, কিন্তু আড়ালে-থাকা দর্শকের চোখ দূরে চ'লে গেলো গাড়ি ছাড়িয়ে, অথচ দৃষ্টিপথে সেটাকে রেখে, যেন এই অভ্যর্থনার তুমুল সময়ে, হৃৎপিণ্ডের উতরোল ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে, খুব বেশি দেখে ফেলতে সে চায় না, বড্ড বেশি দেখে ফেলতে তার ভয়। ভালোই যে এটা পালকি-গাড়ি, জানলা নেই, আরোহীদের মুখ দেখা যায় না; দরজার ফাঁক দিয়ে একটু মাত্র আভাস শুধু উন্মোচিত, শুধু একটু নির্বস্তুক নীল, হাঁটুর ভাবলেশহীন অথচ কত অর্থভরা ভঙ্গিটুকু! গাড়ি কাছে এলো, চাকা থামার শব্দ শোনা গেলো, হয়তো ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়েও তাকালো কেউ—অন্য কেউ; কিন্তু যুবকটি আর তাকালো না, উঠে গেলো না, উঠলো না চেয়ার ছেড়ে, ঠিক একই ভাবে ব'সে থাকলো প্রতীক্ষায় বাণবিদ্ধ হ'য়ে, রুদ্ধশ্বাস।

বেশিক্ষণ না, সেই স্তব্ধতার, নিঃসাড়তার, উত্তেজনার কয়েকটি মুহূর্ত। ফটক খোলার ছোট্ট আওয়াজ পাওয়া গেলো, পায়ের শব্দ সিঁড়িতে—এমনকি—তীব্রমধুর যন্ত্রণাদায়ক মুখবন্ধ!—হালকা একটু হাসি। একটু পরে অভ্যাগতরা ঘরে এলেন। প্রথমে এলেন প্রৌঢ়া একজন মহিলা, তাঁর পিছনে—দেখেই বোঝা যায়—তাঁর দুই মেয়ে,

আর সবার পিছনে, অন্যদের একটু পরে, বছর পনেরোর একটি ছেলে, যে তার বয়স ছাড়িয়ে হঠাৎ অনেকটা লম্বা হ'য়ে গেছে ব'লে, এবং অন্তত পক্ষে পুরুষ ব'লে, মা বোনের এস্কর্টের পদ অপ্রয়োজনেও পেয়ে গেছে। মেয়ে দুটির মধ্যে ছোটোটির বয়স বছর বারো, ফুটফুটে দেখতে, ফ্রক পরনে—কিন্তু শিগগিরই তার আর ফ্রক পরা চলবে না। বড়ো বোনের কুড়ি-একুশ বয়স। নীল যার পরনে এ সেই মেয়ে, নীল শাড়ি প'রে দরজার ধারে দাঁড়িয়েছে, চোখ দুটিতে হাসির আভাস অথচ যেন হাসিও নয়, হাতের বই দুটি কোলের কাছে আলতো ক'রে ধরা। একবার সে তাকালো যুবকটির দিকে—যে অতিথি দেখে, মহিলা দেখে, উঠে দাঁড়াবার সৌজন্যটুকুও রক্ষা করলো না—তারপর একটু তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললো—বললো কোনো তুচ্ছ কথা, প্রতিদিনের সাধারণ কোনো কথা—হয়তো শুধু, 'বই দুটো রাখো', কিংবা নিজেই ও-দুটো টেবিলে রেখে চ'লে যেতে-যেতে বললো, 'মাসিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।'—কিন্তু কী বললো তাতে কিছু এসে যায় না; কোনো কথাই শুনলো না যুবকটি, শুধু শুনলো গলার আওয়াজ, স্বর—সেই অশরীরী বিশুদ্ধ সত্তা, নীলিমার তরঙ্গকম্পন। মিলিয়ে গেলো শব্দের রেশ, মেয়েটি চ'লে গেলো বাড়ির ভিতরে, অন্যেরাও গেলো, আবার যুবকটি একলা।

—কিন্তু এ-রকম, এ-রকম তার আগে কখনো লাগেনি। এত সে ভালোবাসে চিত্রাকে! ঘরে এলো, একটু দাঁড়ালো, একটু কথা ব'লে চ'লে গেলো—আর তাতেই, শুধু এইটুকুতেই সারা শরীরে এ কী আবেশ তার, চেতনার নিস্পন্দতা যেন, আবার হৃদয়ের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আনন্দের, জীবনানন্দের, বর্বর বাঁশির মতো নিঃস্বন! কখনো ভাবেনি এ-রকম হবে; একটু আগেও, ওদের আসতে দেখেও ভাবতে পারেনি কেমন

লাগবে সত্যি যখন চোখে দেখবে তাকে—প্রায় প্রত্যহ যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকে দেখেই হঠাৎ তার স্নায়ুতন্ত্রে ছিলার মতো টান পড়বে কে জানতো—কে জানতো এমন উন্মাদের মতো স্পন্দিত হবার শক্তি রাখে তার হৃৎপিণ্ড, এমন বেগে রক্ত ছড়াতে পারে শুধু তার শরীরে নয়, তার জীবনে, তার ভবিষ্যতে, তার সারসত্তায়, কবিতায়—যত কবিতা এখনো সে লেখেনি কিন্তু লিখবে, যা তাকে লিখতেই হবে, যার ঋণে ইতিমধ্যেই তার জীবনসুদ্ধু বিকিয়ে গেছে, সেই সব আশ্চর্য, চিন্তামাত্রে চমৎকারী কবিতায়। নিজের প্রণয়ের প্রতিভায় নিজেই অবাক হ'য়ে গেলো সে, স্তম্ভিত, মুহ্যমান—যেন নিজের সম্ভবপরতার বিপুলতার সামনে নিজেই একেবারে নিঃশেষ বিনয়ে বিচূর্ণ হ'য়ে গেলো।

চাঁপার ধারালো গন্ধ আঘাত করলো তাকে, রৌদ্র-জ্বলা নীল হাওয়া ঝলমল করলো চোখের সামনে। কিন্তু স্বতন্ত্র কোনো আহ্বানে আর সাড়া দিতে পারলো না সে ; অন্য কিছু ভাবতে পারলো না চিত্রাকে ছাড়া, কিংবা চিত্রাকে দেখে হঠাৎ তার অস্তিত্বের এই উন্নয়নের রহস্য ছাড়া ;—কিংবা, সত্যি বলতে, কোনো কিছুই ভাবতে পারলো না, শুধু সেই রহস্যবোধের দিগন্তপ্লাবনে মগ্ন হ'য়ে ব'সে থাকলো। আর, একটু পরে, চিত্রা যখন ফিরে এলো, তার নীল শাড়ির সমস্ত সুকোমল সৌজন্য নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন সে কিছু বললো না, কোনো কথাই বলতে পারলো না এই মেয়েকে, যে তার অত্যন্ত চেনা হ'য়েও কত দূরে স'রে গেছে এখন, সুদূরের সমুদ্রপারে দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্রা তার দিকে তাকিয়ে থাকলো একটু ; যেখানে একটি চুলের গুছি কানের কাছে কোঁকড়া হ'য়ে নেমেছে সেই দিকে তাকালো, তার ভারি, নীলচে, এখন প্রায় চোখ ঢেকে নেমে-আসা চোখের পাতার দিকে

তাকালো। হাসি আরো স্পষ্ট হ'লো মেয়েটির চোখে, কিন্তু ঠোঁট পর্যন্ত ছড়ালো না, চোখ থেকেই মিলিয়ে গেলো চোখের কোণের প্রচ্ছন্ন কোনো বিষাদের ছায়ায়। ঠিক তখনই চোখ তুললো যুবকটি; চোখোচোখি হ'লো দু-জনের। চিত্রা বললো, 'কী? মৌলি?' স্নেহ ফুটলো কথাটায়, প্রায় আদর, অন্তরঙ্গতার অভ্যাসের আরাম—আবার সেই সঙ্গে যেন আহ্বান, যুদ্ধে আহ্বান, আর ঈষৎ, অতি মৃদু, সতর্ক একটু ঠাট্টার সুর। দেখা হ'লে এই কি তাদের প্রথাসিদ্ধ সম্ভাষণ? না কি চিত্রা আজই প্রথম বললো, বিশেষ কোনো অর্থ দিয়েই বললো? যা-ই হোক, কথাটা কিছু নয়, এমন কিছু নয়, এমন কোনো প্রশ্ন নয় যার উত্তর চাই। উত্তর আশাও করেনি চিত্রা, কেননা ব'লেই সে চোখ ফেরালো, চোখ ফেললো টেবিলের উপর পাতা-খোলা বইটাতে, তারপর হাত বাড়িয়ে—সরু সোনার রুলি-পরা হাত বাড়িয়ে টেবিলের পাশের আরাম-চেয়ারটা একটু বেঁকিয়ে কাছে টেনে এমনভাবে বসলো যাতে সন্দেহ থাকলো না যে এই ঘরের পরিবেশে তার বাড়ির মতোই স্বাচ্ছন্দ্য।

'সুইনবর্ন পড়ছিলে?'

'না। ঠিক পড়ছিলাম না।' মৌলি এটুকু ব'লেই থামলো।

'একটু পড়ো না শুনি।'

সত্যি কি চিত্রা মৌলির মুখে কবিতা শুনতে চায়, না কি এটা তার ঢিল ছোঁড়া, বঁড়শি ফেলা শুধু—যে-কোনো একটা ছুতো ক'রে মৌলিকে ধ'রে ফেলার চেষ্টা? মৌলির এই ভাব, মুখের উপর ছেয়ে-নামা এই ভাব, যখন তার চোখের পাতা ভারি হ'য়ে চোখ দুটিকে প্রায় ঢেকে দেয়, যখন হাসি থামে, ফুর্তি থাকে না, যখন যৌবনের চলোর্মিস্রোত হঠাৎ যেন থেমে যায় দূরকালের গ্লেসিয়ারের স্পর্শ পেয়ে—মৌলির এই ভাবটির

সঙ্গে ভালোই চেনা আছে চিত্রার। তখন তার একা থাকাই ভালো—কিংবা হয়তো আরো ভালো চিত্রাকে যদি কাছে পায়—কেননা চিত্রাই পারে পাখির মতো ঠুকরে-ঠুকরে তাকে উত্যক্ত ক'রে সান্ত্বনা দিতে—হয়তো তখনই সবচেয়ে তার চিত্রাকে চাই—অন্তত, যতক্ষণ এই সময়টুকু আছে, সে-কথা ভেবে চিত্রা যদি রোমাঞ্চ পায় তো ক্ষতি কী।

'পড়বে ?'

'না।' সুইনবর্ন বন্ধ ক'রে ঠেলে রাখলো মৌলি, চিত্রার ফেরৎ-আনা বই দুটো দু-আঙুলে নাড়লো একবার।

'বই দুটো পড়লাম,' এই সুযোগটুকু ছাড়লো না চিত্রা। 'ভালো বুঝলাম না।'

'বোঝবার আর কী আছে।'

'সত্যি বলতে, এই এম. এ. পরীক্ষাটাই সমুদ্রের মতো লাগছে এখন।'

'ও কিছু না ; ছেলেখেলা।'

'তোমার কাছে ছেলেখেলা, মৌলি, কিন্তু আমার—'

'ও-সব বোলো না। চুপ করো।'

যে-রকম ক'রে কথাটা বললো মৌলি, ঐ 'চুপ করো'-টা যে-রকম নিচু গলায় অথচ তীব্র স্বরে বেরিয়ে এলো, আর বলবার সময় তার কপালের রাজদণ্ডের মতো শিরা যে-রকম ক'রে ফুলে উঠলো একটু, তাতে চিত্রা অবাক না-হ'য়ে—মৌলিকে এত ভালো ক'রে চিনেও অবাক না-হ'য়ে পারলো না। একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'আজ কি কথা বলবে না ? কী হয়েছে তোমার ?'

কী হয়েছে ? কী হয়েছে তা কি মৌলি বলতে পারে, না কি বলতে গেলে তার কোনো অর্থ হয় ? কী হয়নি তার, কী বাকি আছে,

কোথায় এতটুকু ফাঁক রেখেছে এই দিন, এই অলৌকিক সকালবেলা? বৈশাখ মাস—গ্রীষ্ম, বসন্তের অসহনীয় সম্পূর্ণতায় বৎসরের যাত্রারম্ভের সময়; যৌবন—যৌবনের অনির্বচনীয় পবিত্র যূপে আত্মাহুতির অনির্বাণ যজ্ঞধূম; কবিতা—কবিত্ব—না, আর ভুলিয়ে রাখার, ভান ক'রে থাকার সময় নেই; আছে, পেয়েছে, জন্মেছে তা-ই নিয়ে—আর-কেউ এখনো না জানুক সে তো জানে—সে তো জানে তার মনের তলায় কী আছে, কোন খনি, মহাদেশ, সাম্রাজ্য—যা কোনোদিন, যে-কোনো দিন, বিস্ময়ের তরঙ্গ তুলে প্রকাশিত হবে শুধু তার আদেশ, তার অঙ্গুলিহেলনের ইঙ্গিতমাত্র পেলে। আর, যেন এতেও যথেষ্ট হ'লো না, যেন এই বৈশাখের সকালে যুবক হ'য়ে, কবি হ'য়ে, বেঁচে থাকাটাই যথেষ্ট হ'লো না; যেন এই শ্রী, ঋদ্ধি, শক্তির চেতনা—একে সংহত ক'রে, গুচ্ছ ক'রে বাঁধতে হ'লে বেদনার একটি সূত্র চাই—প্রেম এলো, চিত্রা এলো। যে-মুহূর্তে এলো, যে-মুহূর্তে ভালোবাসা তার দেহের মধ্যে আবদ্ধতার দুঃখ নিয়ে কাছে এলো, সে-মুহূর্তে ফুটে উঠলো সমস্ত জীবন, জীবনের সমস্ত সুখ, আনন্দ, সম্ভাবনা একটিমাত্র মুহূর্তের বৃন্তে আকাশ-জোড়া পদ্মের মতো ফুটে উঠলো। এখন আমি একে নিয়ে কী করবো? একে আমি সইতে পারবো কেমন ক'রে?

'অমন ক'রে তাকিয়ে আছো কেন? কী?'

চিত্রাই কথা বললো আবার, একটু ক্ষীণ স্বরে; ব'লেই মুখ নামালো। কোনো মিনারের গম্বুজের মতো উঁচু দেখালো লম্বা ক্ষীণ তনুটির উপর তার পর্যাপ্ত খোঁপা; তার ডিমের ছাঁদের মুখ—ম্লান রঙের—মৌলির ভাষায় বতিচেলি-মুখ—সেই মুখের পরিষ্কার একটি প্রোফীল এঁকে দিলো নীল-সোনার পটভূমিতে তার ঠিক পিছনের পুবের জানলা—

আর হঠাৎ, সে যখন একটু নড়লো—না কি কেঁপে উঠলো?—তখন সেই রঙের বিন্যাসে তার শরীরকেও সাজিয়ে দিলো একটি রোদের রেখা, নীল শাড়ির উপর দিয়ে ছুটে এসে একটি সোনালি তীর বিদ্ধ হ'লো তার বুকের সেই ছোট্ট, নিচু অংশটিতে, ঠিক যার উপর থেকে মেয়েদের দুই স্তনের পৃথক যাত্রা শুরু হয়। যেন দেবতার এই প্রণয়চিহ্নে লজ্জিত হ'য়ে মাথা আরো নিচু হ'লো তার, শরীরের তুলনায় ছোটো মুখটি আরো ছোটো দেখালো, আর—আপাতত কোনো কারণ যদিও নেই—স্পষ্ট একটি লালের ফোঁটা রাঙিয়ে দিলো তার পাণ্ডুবর্ণ গাল।

'না, তাকাবো না।' মৌলি মাথা ঝাঁকালো, যেন তাড়িয়ে দিলো ঐ মাথার মধ্যে যা-কিছু তার চলছে এখন। তা-ই হোক তবে—আপাতত তা-ই হোক—এই রমণীয় ছলনা, জীবনের এই সমতলের সৌভাগ্যভূমি, যেটা আছে ব'লে আসলটাকে কোনোরকমে সহ্য করা অন্তত সম্ভব হয়। মেনে নেয়া যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনে তাদের প্রকাশ্য জীবন। চেয়ারে একটু এলিয়ে বসলো সে, পা দুটোকে সামনে টান ক'রে দিয়ে বললো, 'বলো। খবর বলো। এম. এ. পরীক্ষা সমুদ্রের মতো লাগছে এখন?'

নিশ্বাস পড়লো চিত্রার। যেন চেনা গাঙে নাইতে নেমে আঠাঁই জলে পড়েছিলো হঠাৎ, পায়ের তলায় মাটি পেয়ে নিশ্বাস ফেললো। আস্তে মিলিয়ে গেলো গাল থেকে লালের বিন্দুটি, ঠোঁটে যেন কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটলো। মাথা সোজা করলো সে—আর সঙ্গে-সঙ্গে সোনালি তীর ভদ্রভাবে ঝ'রে পড়লো তার পায়ের কাছে;—হেসে তাকিয়ে বললো, 'সত্যি তা-ই। কোনোদিকেই কূল দেখতে পাচ্ছি না।'

'এ-সব সাধারণ কথা তুমি বললে আমার অপমান লাগে, চিত্রা।'

একটি গ্রীষ্মের সকাল

'ভুলে যাও কেন, আমিও সাধারণ?'

'না। সাধারণ কিছুই ভালোবাসি না আমি। আর সত্যি—ভাবতে গেলে—পৃথিবীতে কিছুই তো প্রায় সাধারণ নয়। বাদ দিতে পারো অধিকাংশ লোকসংখ্যা—আর এম. এ. পরীক্ষার মতো দুটো-একটা বাজে বিষয়কে।'

'ও-রকম বলো ব'লেই তো বন্ধুমহলে তোমার বদনাম।'

'কী ব'লে বদনাম?'

'অসহ্য অহংকারী ব'লে। তোমার অনার্সের ফল বেরোবার পর—মনে আছে?—যারা তোমাকে প্রশংসা জানাতে গিয়েছিলো, তারা তোমার মুখ থেকে ভদ্রগোছের জবাবও কিছু পায়নি।'

'ভালো লাগেনি সেই প্রশংসা। খারাপ লেগেছিলো।'

'যেটা স্বতঃসিদ্ধ সেটা নিয়ে আর কথা কেন—এই তো তোমার মনের ভাবটা?'

'তাও নয়। কথাটা এই যে এ-সবে আমার কিছু না। এ-সবের মধ্যে আমি নেই। অন্য কাজ আছে আমার।'

'অর্থাৎ—এটা এতই তুচ্ছ যে এ নিয়ে প্রশংসা পেতেও তোমার আপত্তি?'

'তুচ্ছ—মূল্যবান—এ-সব কথার তুলনা ছাড়া মানে নেই। আমার কাজ অন্য—অন্য কিছু।'

' "অন্য কিছু!" ঐ এক কথা তোমার মুখে। তোমার বন্ধুরা যখন পড়াশুনোর কথা বলে, ফলস্টাফের চরিত্র নিয়ে তর্ক তোলে, তুলনা করে গ্রীকদের সঙ্গে টমাস হার্ডির, তুমি তখন মাথা ঝেঁকে হেসে বলো, "রাখো ও-সব! অন্য-কিছু বলো!"—তারপর তাদের টেনে নিয়ে যাও

আদিত্যর দোকানে, চা-শিঙাড়ার ফরমাশ দাও, আর তারা যখন খেতে-খেতে আড্ডা জমায়, তুমি শুয়ে পড়ো লম্বা হ'য়ে গাছের তলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে।—তুমি কি ভাবো এতে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না?'

'আর কী-কী আমি অন্যায় করি, বলো। শুনি তোমার মুখে।'

'তারপর—তারা কেউ যখন তোমাকে কিছু জিগেস করে, মনে করো সিম্বলিজম-এর অর্থ, কিংবা ধরো ক্লাইভ বেল-এর "ইসথেটিক ইমোশন" বিষয়ে তোমার মত জানতে চায়—কিংবা দেখতে চায় তোমার ক্রিটিসিজম-এর নোটের খাতা—তুমি তাদের বলো, "ও-সব কিছু নেই আমার। আমি কিছু জানি না।" এতে তাদের কেমন লাগে তা বোঝো?'

'কিন্তু সত্যি যে তা-ই। সত্যি আমার নোটের খাতা কিছু নেই। সত্যি আমি কিছু জানি না।'

'কেউ বিশ্বাস করে না ও-কথা। ভাবে তোমার তুকতাক সব লুকোচ্ছো। ছোটো ভাবে তোমাকে।'

'তা মন্দ কী। কোনো বিদ্যে শিখিনি শুধু ফাঁকি দেবার বিদ্যে ছাড়া—এর কিছু-একটা শাস্তি তো আমার প্রাপ্যই।'

'ফাঁকি?'

'বিশুদ্ধ ফাঁকি। আমার কাছে যারা পরামর্শ চায় তারা প্রত্যেকে আমার দশ গুণ অন্তত পড়েছে। তাদের কাছে আমি হঠাৎ এটা-ওটা শিখে ফেলি কত সময়—খুব কাজে লেগে যায় সে-সব—তারা তা জানে না। কিংবা জানে হয়তো—সন্দেহ করে—আমাকে ধ'রে ফেলতে

চায় ব'লেই পিড়াপিড়ি করে ও-রকম। আর মাঝে-মাঝে কেমন ধরাও প'ড়ে যাই ছাখো না?'

'সেদিন বি. কে. পালের ক্লাশের কথা বলছো?'

'শুধু সেদিন কেন, ক্লাশে কোনো কথা উঠলে কোনোদিন আমি ঠিক-ঠিক কিছু জবাব দিতে পারি! আমি যে কত কম জানি প্রোফেসররাও তা কি জানেন না ভেবেছো?'

'তা জেনেও তোমার খাতায় যখন দারুণরকম নম্বর তাঁরা বসিয়ে দেন, উদাহরণস্বরূপ প'ড়ে শোনান অন্য ক্লাশে, তখন কেমন লাগে বলো তো সেই অন্য ছেলেদের, যারা পড়াশুনো করেছে তোমার দশ গুণ?' বলতে-বলতে চিত্রার মুখে একটি আতপ্ত আভা ছড়িয়ে পড়লো, গর্বের, গৌরবের দীপ্তি, যেন এই সব অসামান্য কৃতিত্বে তারও কোনো অংশ আছে, দায়িত্ব আছে, যেন, সত্যি বলতে, তারই অলংকার এ-সব, তারই সম্পত্তি। কোমল দেখালো ডিমের ছাঁদের মুখটি, চোখের ভাব স্নিগ্ধ, আর যখন ছোটো মাথাটি ঈষৎ হেলিয়ে মৌলির দিকে তাকালো, তখন সেই দৃষ্টি যেন প্রায় মাতার, প্রায় কোনো ইতালিয়ান ছবির কুমারী মেরী মাতার। 'আর তুমি,' একটু স্বার্থপর খুশির সুরে কথা শেষ করলো চিত্রা, 'তুমিও কিনা তাদের রাগিয়ে দাও শুধু! না, মৌলি, বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহার তুমি ভালো করো না।'

চিত্রার মুখের এই ভাবটি, তাকে নিয়ে চিত্রার যেন আঁচলে-বাঁধা এই গৌরববোধ, এটা মৌলির ভালো লাগে না, রীতিমতো আপত্তিকর লাগে, আবার এতেই কেমন চিত্রার উপর মমতাও তার বেড়ে যায়। একটু হেসে, যেন চিত্রার এই দুর্বলতাকে একটুখানি প্রশ্রয় দিয়ে, কিন্তু

অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'আমার দোষ অনেক। একটিমাত্র গুণ যে বন্ধুরা আমাকে ভালোবাসে।'

'তোমাকে ভালো না-বেসে উপায় আছে, মৌলি!' ব'লে চিত্রা একটু থামলো। দমকা হাওয়া এলো ঘরে, যেন কথাটাকে উড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো অন্য জানলা দিয়ে। হাত বাড়িয়ে টেবিলের কাগজে চাপা দিলো চিত্রা, তারপর যেন আগের কথাটাতেই জোর দিয়ে, অথচ তার ওজন কমিয়ে বললো, 'আর তাই তো তোমাকে সহ্য করা এক শক্ত। জানো, তোমার বন্ধুরা তোমাকে ঈর্ষা করে না—ঈর্ষা পর্যন্ত করে না? তোমাকে ঈর্ষা করারও যোগ্যতা ওদের আছে, এ-কথা ভাবতে পারে না কেউ। আর তুমি—তাদের নিয়ে কী করো তুমি? তাদের কথাবার্তা শোনো, টুকে নাও মনে মনে, যার কাছে যেটুকু পাবার ঠিক-ঠিক আদায় ক'রে নাও, তারপর—তারা যখন তাদের কোনো দাবি জানায়, তাদের ন্যায্য পাওনাটুকুই চায় তোমার কাছে, তখন তাদের চায়ের দোকানে বসিয়ে দিয়ে নিজে স'রে আসো একলা হ'য়ে গাছের তলায়। তারা বোঝে—তুমি যে-অন্যায় করো তাদের উপর তা তারা বোঝে—কিন্তু—তবু—তুমি যখন লম্বা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে হাসো, তোমার ঐ দু-চোখ ভরা আনন্দ নিয়ে তাদের দিকে তাকাও, তখন তোমাকে ভালো না-বেসেও তারা পারে না। অন্যায়—সমস্তটাই অন্যায়! এই অন্যায়ের কিছু তো প্রতিকার তুমি করতে পারো। চেষ্টা ক'রেও তাদের কিছু কাজে লাগতে কি পারো না?'

কী-কথা এ-সব? প্রণয়ের এ কী গুণ্ঠিত অথচ লজ্জাহীন উচ্ছ্বাস! অন্যদের পক্ষ নিয়ে, বন্ধুদের ছদ্মবেশ প'রে, ভক্তির এ কী কুল-খোয়ানো আত্মনিবেদন! এ-সব কথা কি বন্ধুদের, না কি চিত্রার, চিত্রারই

নিজের—এ-সব বলতে, ব'লে-ব'লে নিঃশেষে নিজেকে লুটিয়ে দিতে, কিংবা আজ এক নিশ্বাসেই বহুদিনের রুদ্ধ সঞ্চিত ব্যর্থ কামনার প্রতিশোধ নিতে—এর জন্যই সে কি আজ এসেছে এই বৈশাখের সকালবেলায়? তার কথা শোনার পর একটু স্তব্ধ হ'য়ে থাকলো মৌলি, তার বাঁ হাতের তর্জনীপ্রান্তে আবার জড়ালো একটি চুলের গুছি, যেমন হয় যখনই আনমনে কিছু ভাবে সে। একটু পরে চুল ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পারলে আমি তোমারই তো কাজে লাগতাম। পড়িয়ে দিতাম তোমাকে।'

'থাক। অনেক শিখেছি তোমার কাছে। পাঠ্য পড়াটা বাদ দাও।'

মুখ উঁচু করলো মৌলি, ঘাড়ের উপরে করোটির হাড় যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানটা ঠেকিয়ে দিলো চেয়ারের কাঠে। নরম আওয়াজে হেসে উঠে বললো, 'ঠিক বলেছো, চিত্রা। তা কথাটা কী জানো—ঐ যে তুমি চেষ্টা করতে বললে না?—কিন্তু চেষ্টা ক'রে কিছুই পারি না আমি—চেষ্টাই করতে পারি না—যা-কিছু আমি ক'রে ফেলি সব নিজে-নিজেই হ'য়ে যায়, কেমন ক'রে হয় আমি বুঝি না। আর যা-ই করি, মাস্টারি আমি করতে পারবো না কখনো।'

'তুমি কোন দুঃখে মাস্টারি করবে, মৌলি? শালগ্রাম শিলা কেউ কি শিলনোড়ার কাজে লাগায়?'

'কিন্তু—তুমি ঠিক বলছো—চেষ্টা আমার করা উচিত, চেষ্টা করতে শেখা উচিত এতদিনে। বন্ধুরা কিছু জিগেস করলে পালিয়ে বেড়াই—লজ্জার কথা বইকি। কিন্তু—কী হয় জানো?' মৌলি একটু থামলো, টেবিলের উপর সুইনবর্নের বইটা হঠাৎ খুলেই বন্ধ করলো

আবার। একটু নিচু গলায়, যেন প্রায় আপন মনে বললো, 'এই কবিতা পড়ছিলাম একটু আগে—না, পড়ছিলাম না, ভাবছিলাম। কবিতা আমি পড়তে পারি না, চিত্রা! তেমন যদি কবিতা হয়, পড়তে পারি না। গলা ধ'রে আসে, বুক ভেঙে আসে যেন, প্রায় কান্না পায়। তাহ'লে কেমন ক'রে বোঝাবো তার মানে কী।'

চিত্রার চোখের মুগ্ধতা মৌলিকে যেন স্পর্শ ক'রে গেলো। 'অনেক দেখেছি, মৌলি, তোমার মতো কবিতা-পাগল আর দেখিনি!'

'পাগল—পাগল না-হ'য়ে উপায় আছে! শব্দে কী মোহ! ভাষায় কী জাদু! ছন্দে কী শক্তি! ধ্বনি—শুধু ধ্বনিতে কী উল্লাস!' মৌলির চোখের পাতা নীলচে হ'য়ে নেমে এলো চোখের উপর, কেমন-যেন সলজ্জ বিস্ময়ের সুরে আস্তে-আস্তে বললো, 'কবিতা যারা পড়ে না তারা কেন বেঁচে থাকে, চিত্রা, আর কেমন ক'রেই বা বেঁচে থাকে!'

ক্ষীণ হাসি ফুটলো চিত্রার ঠোঁটে, যেন বেদনার, যেন করুণার হাসি। যৌবনের, কবিত্বের, কবিকল্পনার মুখের দিকে আর যেন তাকাতে পারলো না সে, চোখ সরিয়ে নিয়ে গুনগুন নরম গলায় বললো, 'কিন্তু তোমার মতো সবাই হ'লে তুমি কেমন ক'রে বাঁচতে, মৌলি?'

পুরো খুলে গেলো মৌলির চোখ, হাসির আওয়াজ ছোট্ট হ'য়ে বেরোলো তার গলা দিয়ে। 'ঠিক! এখানেও তুমি ঠিক বলছো, চিত্রা। ঠিক কথা—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যে কবিতা পড়ে না, সে তো আমাদের ভাগ্য, সৌভাগ্য! সবাই যদি কবিতা পড়তো তাহ'লে তুমি কি ভেবেছো এই যাকে আমরা সংসার বলি তা ছিন্নভিন্ন ধ্বংস হ'য়ে যেতো না?'

'তোমার কী মনে হয়?' হাসির ঝিলিক লাগলো চিত্রার চোখে।

'ঐ দ্যাখো—তুমি বললে কথাটা, আর এক্ষুনি আমি তোমার কাছেই নিজের ব'লে চালাচ্ছি! চোর না-হ'য়ে কবি হবার কি উপায় নেই?' মৌলি হাসলো, যেন শিশুদের মতো স্প্রতিভ সরল কৌতুকে। একটু পরে অন্য সুরে বললো, 'কিন্তু কিসে আমার অবাক লাগে, জানো? অবাক লাগে তাদের দেখে, যারা কবিতা পড়ে, কিন্তু পাগল হয় না। তারা পাশ করে, তাঁরা পাশ করান, ভালোমানুষ ভদ্রলোক তারা। কবিতা প'ড়ে পাগল তারা হয় না। আঘাত পেয়ে শিউরে ওঠে না তারা—না, থরথর শিউরে ওঠে না কবিতার আঘাতে—বিস্ফোরণে। আমি কি আনতে পারি সেই আঘাত, আমি কি পারি তাদের জ্বালিয়ে দিতে নিজে আমি যেমন জ্বলছি? এই এটা—এটা ছাড়া চেষ্টার যোগ্য আর কী আছে বলো তো? কিন্তু পারি না—আমার মধ্যে যা আছে তা দিতে পারি না আমি। সেটা সম্ভব নয়।' শেষের কথাটায় বিষাদের সুর লাগলো, সেই বিষাদের চকিত পূর্বাভাস যেন, যা গুণী কবির গনগনে উনুনে হঠাৎ কখনো শীতের মতো নামে, নিবিয়ে দেয় ভাষা, শব্দ, সুর, বুঝিয়ে দেয় সব কথাই ব্যর্থ, কোনো কথাই বলা যায় না।

বেদনার ব্যাকুলতা ফুটলো চিত্রার মুখে, কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠলো তার ঠোঁটের কোণ। 'তুমি তো দাও, মৌলি, অজস্র দাও—' তার নিজেরই আগের কথার খণ্ডন ক'রে ব'লে উঠলো সে—'তোমারই মতো ক'রে দাও তুমি—হালকা হাওয়ায় ছড়িয়ে দাও তোমার আগুন। ওরা নিতে পারে না—আমরা নিতে পারি না—যার মধ্যে যা থাকে না সে তা নিতেও পারে না, মৌলি। তাই তো দ্যাখো, যদিও তোমাকে আমি পেয়েছিলাম—'

'"ছিলাম" কেন?'

'মানে, পেয়েছি—' একটু ফ্যাকাশে মুখে ব্যাকরণের ভুল শুধরে নিলো চিত্রা,—'তবু তো ত্যাখো মহেন্দ্রবাবুর কাছে পড়তে যাই মাঝে-মাঝে।'

'জানি সে-কথা,' মৌলি একটু বাঁকা ক'রে হাসলো। 'কিন্তু কাল তোমাকে দেখলাম না?'

'এসোসিয়েশনের মাটিঙে? যাইনি। ফোলিও-তত্ত্ব কত আর শোনা যায়!'

'ওখানে ভুল করলে। মহেন্দ্রবাবু শেক্সপিয়রটা জানেন। পণ্ডিত লোক।'

ও-কথা কেন বললো মৌলি? কেন হঠাৎ নামিয়ে দিলো নিজেকে, প্রায় যেন শত্রুপক্ষে চ'লে গেলো? মনে-মনে অবশ্য, তাদের সব ক-টি অধ্যাপকের মধ্যে, মহেন্দ্রবাবুকেই সবচেয়ে কম পছন্দ করে সে,' সত্যি বলতে অবজ্ঞা করে। তথ্যকীট, কমা-জ্ঞানী মহেন্দ্র ঘোষ, অক্ষরের মূর্তিপূজক, সাহিত্যের উৎকুনভুক রসরক্তহীন পতঙ্গ। এই সব কথা, আরো একটু প্রাকৃত ভাষায়, বন্ধুদের কাছে—চিত্রার কাছেও—কখনো সে যে প্রকাশও করেনি তা নয়। যাকে বলে পাণ্ডিত্য—গবেষণা—সেই সমস্ত ধূসর অধ্যবসায়ী জগৎটাকে সে কেমন-একরকম বিস্ময়ের চোখে ত্যাখে—অবোধ বিস্ময় যেন—ভাবটা যেন এ-সব আবার এখানে কেন, কী হয় এ-সব দিয়ে? বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়তে এসে ঐ জগতের সঙ্গে না-হ'লেই-নয় সংশ্রবটুকু কোনোরকমে সে রক্ষা ক'রে চলে অবশ্য—বলা যেতে পারে ভদ্রতাটুকু বজায় রাখে—মন যাকে দিতে পারে না তাকে অন্তত কিছু সময় দেবার শিষ্টাচার—কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর ক্লাশে তাও আর সম্ভব হয় না, নীরসতার বিরাট ওজনে মাথা তার নুয়ে আসে, চোখ

জড়িয়ে আসে ক্লান্তিতে, প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে যন্ত্রণার খোঁচা খেয়ে জেগে ওঠে, যখন মহেন্দ্রবাবু তার দিকে তাকিয়ে—পুরু কাচের চশমার ভিতরে বড়ো-বড়ো গোল-দেখানো চোখ দুটি ঠিক তারই উপর নিবদ্ধ ক'রে আস্তে-আস্তে চিবিয়ে-বলা কোনো-একটি নিঁখুত বাক্য শেষ করেন। যন্ত্রণা, প্রায় শরীরের যন্ত্রণা মহেন্দ্র ঘোষের মুখে শেক্সপিয়রের ছন্দোবদ্ধ শোনা, তাঁর চেষ্টাকৃত চিবিয়ে-বলা নিখুঁত নিষ্প্রাণ উচ্চারণে লাল গরম আগুন-জ্বলা কবিতা শোনা; যন্ত্রণা—শরীরের, আত্মার যন্ত্রণা সেই দৃশ্য দেখা, যখন—হাজার মানুষের সমান জীবন্ত যে-একজন কবি, সেই কবির শবব্যবচ্ছেদের কৌশল যখন কৃতজ্ঞ ছাত্রদের সামনে উদ্‌ঘাটন করেন মহেন্দ্র ঘোষ! তাহ'লে এখন—চিত্রার এই অতি মৃদু পরিহাসটুকুর উত্তরে, মৌলিনাথেরই উদ্ভাবিত 'ফোলিওতত্ত্বে'র উল্লেখের পরে, মৌলি কেন গম্ভীর হ'য়ে ও-কথা বললো, চিত্রাকে প্রায় চপলতার জন্য শাসন করলো যেন, চ'লে গেলো তার নিজের ইচ্ছার, রুচির, এমনকি স্বভাবের বিরুদ্ধে? এ কি শুধু ছেলেমানষি খামখেয়াল, চমক লাগাবার প্রলোভন? না কি আজ আকাশময় বৈশাখের এই দিনটিকে পেয়ে, চিত্রার নীল শাড়ির উদার স্মৃতিসৌরভে প্লুত হ'য়ে সবই আজ সহজ হ'য়ে গেছে তার কাছে, মহেন্দ্র ঘোষকে ক্ষমা করাও সহজ হয়েছে? না কি ঐ ক্ষমা তার পক্ষে স্বভাবতই সহজ;—নিকৃষ্টের প্রতি উৎকৃষ্টের যে-সহাস্য সহনশীলতায় কোনো চেষ্টারই প্রয়োজন হয় না, তারই একটা কপট ভঙ্গি শুধু প্রকাশ পেলো ঐ কথায়? না কি তার অগোপন অবজ্ঞায় একটু লুকিয়ে-রাখা চোরা চাউনির ঈর্ষারও মিশোল আছে—না কি মহেন্দ্র ঘোষকে মনে-মনে একটু ঈর্ষাও করে মৌলিনাথ, এমনকি—তাও কি সম্ভব?—অচেতন মনে তাঁরই মতো—তাঁরও

মতো—হ'তে চায়, তেমনি আত্মস্থ, অনস্থির, তৃপ্ত, উপায়নিপুণ, তথ্যের মজবুত মাটিতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত? কে জানে, কে বলতে পারে কবি-মনের খবর, কে জানে কেমন ক'রে চলে সেই জটিল প্রচ্ছন্ন যন্ত্র, কত রকম স্বতোবিরোধের বাষ্পচাপে, কত বিচিত্র বিপরীতের প্রয়োজনীয় চক্রচরতায়! 'বাঃ, ছাখো তো এঁকে!' এ-রকম কথাও কি মৌলিনাথ কখনো ভাবেনি? ' মহেন্দ্র ঘোষের ক্লাশে ব'সে, তাঁর অতিযত্নবান উচ্চারণে যন্ত্রণাবিদ্ধ হ'তে-হ'তেও কখনো কি ভাবেনি—'ছাখো তো এঁকে! কেমন আরামে আছেন, কেমন পরিপাটি তৈরি হ'য়ে ক্লাশে আসেন, যে-কোনো প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাবটি এঁর জিভের ডগায়, আর জুতোজোড়াটি কী চকচকে পরিষ্কার! স্পষ্ট বোঝা যায় পড়াতে এঁর ভালো লাগে, সারা জীবন পড়িয়েই কাটাবেন, ভাবনা কিছু নেই এঁর। আমি কেন এ-রকম হলাম না? আমার কেন কিছু ভালো লাগে না, নয়তো পাগলের মতো ভালো লাগে;—কী আমি বলতে চাই আমি জানি না, কী আমি লিখে ফেলি নিজে বুঝি না;—কেন আমি কাপড়জামার কথা একটুও না-ভেবে চোরকাঁটার ঘাসের উপর শুয়ে থাকি?'—হয়তো এই সবগুলি ভাবই মৌলির কথাটায় ছিলো—অনায়াসের প্রতি অবজ্ঞা, নির্দিষ্টের দিকে আকর্ষণ, অন্যকে দিয়ে নিজের কোনো অভাবের পূরণকামনা, আর সেই সঙ্গে—খুব সম্ভব—ঈর্ষাও ছিলো একটু, বাস্তবের প্রতি ভাবুকতার ঈর্ষা, সাধারণের প্রতি প্রতিভাবানের সূক্ষ্ম গোপন অনুচ্চারণীয় ঈর্ষার ঈষত্তম দংশন। তাই হয়তো একটু পরেই সে আবার বললো, 'হ্যাঁ—পণ্ডিত লোক। চোখকান মন-প্রাণ প্রভৃতির গোলমেলে বালাই নেই, একেবারেই পণ্ডিত।'

'সব মানুষ এক রকম হয় না, মৌলি।

'জানি সে-কথা। আমি মহেন্দ্রবাবুর কথা ভাবছি না; আমি তোমার কথা ভাবছি।'

'এতদিনেও কি বোঝোনি যে আমার কিছুই তোমার মতো নয়?

'না, তোমার কিছুই আমার মতো নয়। তুমি মেয়ে, আমি পুরুষ। সেখানেই ব্যবধান, সেখানেই আনন্দ।'

'যে-মেয়ে তোমার যোগ্য তার দেখা কোনো-একদিন তুমি পাবে, মৌলি—হয়তো পাবে।'

'আমার ভাবনা এই যে আমি তোমার যোগ্য হবো কেমন ক'রে। কত আমার অভাব, কত আমি দুর্বল, তা কি আমি নিজের মনে জানি না?'

'কত তোমার শক্তি তা কি তুমি জানতে পেরেছো এখনো?'

'এটা তো জানলাম যে আমি তোমার কাজে লাগি না; তোমাকে মহেন্দ্রবাবুর কাছে পড়তে যেতে হয়।'

'তুমি আবার আলাদা ক'রে কোন কাজে লাগবে, মৌলি!'

'সবই আমার ইচ্ছে করে। মনে হয় সব পারবো তোমার জন্য। পারি না, তা তুমি মেনে নিয়ো না, চিত্রা। আমাকে চেষ্টা শেখাও, কষ্ট শেখাও। মহেন্দ্রবাবুর কাছে আর যেয়ো না তুমি।'

'তুমি বলো তো পরীক্ষাই না দিলাম।'

'তা বলি না। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর কাছে আর যেয়ো না। আমি বারণ করছি তোমাকে।'

মৌলির এই কথায় কৌতুক ফুটলো না চিত্রার মুখে, বরং আরো গম্ভীর হ'লো, চোখের কোণের লুকোনো বিষাদ হঠাৎ যেন চোখ ছেয়ে নামলো তার, চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো—মৌলির দিকে না, খোলা

দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে, যেখানে বারান্দা পেরিয়ে ঘাসের উঠোন চোখে পড়ে। আর, যেন তারই কোনো গোপন প্রার্থনার উত্তরে, সেই দরজার কাছে বিধবা একজন মহিলাকে দেখা গেলো; তাঁর পরনের থানধুতিটি যেমন ধবধবে শাদা, তেমনি শাদা কাপড়ে ঢাকা চায়ের ট্রে হাতে ক'রে আসছেন। চিত্রা তাঁকে দেখামাত্র উঠলো, এগিয়ে গিয়ে বললো, 'আমাকে দিন, মাসিমা'; ট্রে এনে টিপয়ে নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। মহিলাটি কাছে এসে ঢাকনা তুললেন। ধোঁয়া উঠলো দুধের জগ থেকে, চিকচিক করলো বড়ো দানার চিনি, নধর মোটা শবরি কলা হলদে ছায়া ফেললো উজ্জ্বল শাদা জাপানি পেয়ালায়, আর সেই পেয়ালার গায়ে তারই সোনালি প্রান্তটুকুর মতো সরু একটি রোদের সুতো ঝিলিক দিলো হঠাৎ, গরম টোস্ট টাটকা মাখনের সূক্ষ্ম সুস্থ সাত্ত্বিক একটি সুগন্ধ মুহূর্তের জন্য ঘ্রাণগোচর হ'য়েই পরিব্যাপ্ত গ্রীষ্মসৌরভে মিলিয়ে গেলো।

মৌলি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে বললো, 'ডিম নেই, মা?'

'না, ডিমওলা কাল আসেনি তো—'

'সকালে আমার ডিম ছাড়া কিছু ভালো লাগে না।'

'রাখুকে পাঠিয়েছি বাজারে—'

'সে আসতে-আসতে আমার কি আর ইচ্ছে থাকবে।'

'কম মিষ্টি দিয়ে নরম সন্দেশ করেছি। খাবি তো?'

'আচ্ছা।'

'এমন অসুবিধে এখানে জিনিশপত্রের—দু-মাইল দূরে বাজার—' মৌলির মা চিত্রার দিকে তাকালেন।

একটি গ্রীষ্মের সকাল

'বাঃ! একদিন ডিম না-হ'লে কী হয়!' বললো চিত্রা। 'কত রকম তো আছে।'

'যার যেমন অভ্যেস তেমনি হ'লে তো ভালো লাগে।'

'না মাসিমা,' চিত্রা হাসলো, 'আপনি আদর দিয়ে-দিয়ে ছেলেকে নষ্ট করছেন।'

'নষ্ট করছি বুঝি?' মহিলাটি হাসলেন। 'তা আমার সন্দেশের জন্য ভাবনা নেই চিত্রা থাকতে। বড়োটা তোর, চিত্রা, কিশমিশ দিয়েছি বেশি ক'রে।' উপুড়-করা পেয়ালা দুটো সোজা করলেন তিনি, চামচে-প্লেট অদরকারেও একবার গুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'চিত্রা তাহ'লে চা তৈরি কর—আমি যাই ওদিকে।' যেতে-যেতে একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমরা খাও, কেমন?'

তাঁর চ'লে যাওয়ার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে চিত্রা বললো, 'আশ্চর্য মা তোমার!'

'সব মা-ই আশ্চর্য।'

'কিন্তু মায়েদের মধ্যেও সব কি আর সমান!'

'না, সব সমান কোনোখানেই নেই,' মৌলি ঠোঁটের কোণে হাসলো একটু। 'ওটা বানানো কথা, কম-বেশি নিয়েই বাস্তব।'

টী-পটের ঢাকনা তুলে ভিতরে একবার উঁকি দিলো চিত্রা, আস্তে চা নেড়ে বললো, 'ঐ বেশিটা একটু বেশি মাত্রায় পেয়েছো তুমি।'

'আঃ! চায়ের গন্ধ!' জোরে নিশ্বাস নিলো মৌলি, তারপর চিত্রার চা-তৈরি-করা হাতটির মৃদু ব্যস্ততার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সকলেই সব পায়, চিত্রা; নিতে পারে দু-চার জন।'

'থাক, ও নিয়ে আর জাঁক কোরো না। নিতে তুমি পারো তা সত্যি, নিংড়ে সবটুকু নিতে জানো, কিন্তু যারা দেয় তাদের কথা ভাবো কখনো ?'

'সবটুকু ? অসম্ভব, চিত্রা। মাত্র কয়েকটি ফোঁটার বেশি কিছুতেই সম্ভব না। খ্যাখো ঐ বাইরের দিকে তাকিয়ে। এর কতটুকু তুমি নিতে পারো তোমার ছোট্ট জীবনে, ছোট্ট শরীরে ?'

চা ঢালতে নিচু হ'লো চিত্রার মুখ, চামচে পেয়ালায় ক্ষীণ ভঙ্গুর টুংটাং আওয়াজ দিলো। মুখ তুলে বললো, 'তোমার সব পাওয়া কি বাইরেই ?'

'আমার মা-র কথা ভাবছো ?'

'তোমার কথাই ভাবছি। আচ্ছা, তোমার মা-র কথাই ধরো। তোমার খাওয়া-পরা, তোমার সুখ-সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য, তা-ই নিয়েই তিনি ব্যস্ত সারাদিন। আর কোনোদিন তার এক চুল উনিশ-বিশ হ'লে তোমার কি তা সহ্য হয় ?'

কালচেমতো ঘন-ব্রাউন চায়ের উপর প্রথম দুধ প'ড়ে কেমন ক'রে কুটিল প্যাঁচে সোনালি রং ফুটিয়ে তোলে, সেই তার প্রিয় দৃশ্যটি একমনে দেখছিলো মৌলি। চিত্রার কথা শুনে একটি যেন ক্ষমা-চাওয়া হাসি ফুটলো তার মুখে ; নিচু গলায় বললো, 'ডিমের কথাটা বললাম ব'লে ? তা সকালবেলা একটি ক'রে ডিম কি খুব বেশি চাওয়া ?'

'কত বেশি তোমার চাওয়া তা তুমি জানো না, মৌলি।'

'কেন জানবো না। নিজের কথা সবই জানি আমি।'

'যে তোমাকে কলের মতো সব জুগিয়ে যায় তাকে তুমি ফিরেও খ্যাখো না তা কি তুমি জানো ? তুমি কি জানো তোমার মা-র উপর অত্যাচার করো তুমি ?'

একটি গ্রীষ্মের সকাল

'অত্যাচার করি!' লম্বা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে মৌলি হেসে উঠলো। 'থাক, আর মন্দ বোলো না। চা খাওয়া যাক।' ছোট্ট, অসমাপ্ত, তাপের জন্য স্পর্শমাত্রেই শেষ-হওয়া প্রথম চুমুকটি দিয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখলো সে, শাদা ধোঁয়া আস্তে-আস্তে পেঁচিয়ে উঠলো রোদ্দুরে, স্বচ্ছ আভা হ'য়ে মিলিয়ে গেলো।

চিত্রা জিগেস করলো, 'রুটি দেবো তো?'

'রুটি?···সকালবেলা কিছু চিবিয়ে খেতে আমার ইচ্ছে করে না। তা দাও একটু।'

'মাখনের উপর সন্দেশ মাখিয়ে দেবো?'

'কেমন সন্দেশ? এলাচ দিয়েছে?'

'খেয়ে দেখতে পারো।'

মৌলি চামচে দিয়ে এক ফালি সন্দেশ তুলে আলগোছে জিভের উপর ফেললো। নরম, কম-মিষ্টি, একটু ভেজা-ভেজা মিহিন সন্দেশ জিভের উপর গ'লে গেলো যেন সুইনবর্নের কোনো শুভ্র সিলেবল, কৈশোরের লাজুক মন্থর কামোন্মেষের মতো এলাচের গোপন গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত মুখে। চিত্রা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কেমন? ভালো না?'

'ভালো? আমি একে বলি হৃদয়নন্দন!'

'কলাটাও মন্দ লাগবে না বোধহয়।'

'কলা?'—মৌলি ঠোঁটের ভঙ্গি করলো একটু—'নাঃ! ঠাণ্ডা—আর বড্ড সলিড। ভালো লাগে না আমার। এই সন্দেশটা বানাতে তুমি শিখে নাও।'

'এটাও শিখতে হবে আমাকে?' চিত্রা হাসলো, কেমন ভীরু, বিষণ্ণ

আবার একটু ঠাট্টা-করা, মৌলিকে প্রায় হারিয়ে-দেয়া হাসি। 'আর? মুদি গয়লা কয়লাওলার হিশেবপত্তর?'

'আবার আমার মা-র কথা?' মৌলি হাসলো না, চোখে যেন অভিযোগ নিয়ে, তিরস্কার নিয়ে চিত্রার দিকে তাকালো।

'সন্দেশ তাহ'লে এমনিই খাবে?' একটি মাখন-লাগানো ঈষদুষ্ণ টোস্ট প্লেটে ক'রে এগিয়ে দিলো চিত্রা। নিজেরটি হাতে তুলে বললো, 'আচ্ছা মৌলি, একটা কথা জিগেস করি তোমাকে। তোমার মা-র সুখদুঃখের কথা তুমি ভাবো কখনো?'

' "ভাবা" বলতে কী বোঝো? বাজার থেকে হাতে ক'রে চালতে নিয়ে আসা?'

'ঠিক তা-ই। সেটাই। তাতেই বোঝা যায় অন্য জনের অস্তিত্ব তুমি স্বীকার করো।'

'আলাদা ক'রে প্রমাণ দিতে হবে?'

'ঐ তো! আলাদা ক'রে কারো কথাই তুমি ভাবো না। যে তোমাকে ভালোবাসবে প্রতিদানের আশা তাকে ছাড়তে হবে।'

'প্রতিদান? ভালোবাসা কি ব্যবসাদারি?'

'বিনিময় ছাড়া ভালোবাসার অস্তিত্ব কোথায়?'

'ঠিক বলেছো। ভালোবাসাটাই বিনিময়। তার যদি অস্তিত্ব থাকে, তাহ'লে কোনো-না-কোনো রকমের বিনিময়ও আছে নিশ্চয়ই।'

একটু বিস্ময়, একটু বিস্মিত বেদনা ফুটলো চিত্রার মুখে, ঠোঁটের রেখায় প্রায় কেমন ভয়ের ম্লানিমা, যেন সে জানে, হৃদয়ের গভীরতম অন্তঃপুরে নিজেই জানে যে এ-সব কথা তার অর্থহীন, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে বালিশের কানে একবার কোনো কথা বললে সে-কথা আর ফিরিয়ে

নেয়া যায় না। একটু চুপ ক'রে থাকলো সে, একটি আঙুল আস্তে একবার বুলিয়ে গেলো কপালে, যেন মুছে দিলো কোনো অবিস্মরণীয়ের আকস্মিক ছায়াপাত, তারপর আবার বললো, চোখ-ভরা কল্যাণময় সাহস নিয়ে, চোখের কোণে বরদাত্রী ঠাট্টা নিয়ে এর পরেও তর্ক করলো—'কিন্তু তোমার বিনিময় কী-রকম? তোমার মা একে-ওকে ব'লে ডবল মজুরির দরজি আনাবেন বাড়িতে, আর তুমি দয়া ক'রে গায়ের মাপটি দিতে উঠে দাঁড়াবে—এই তো তোমার বিনিময়?'

'কী করবো বলো। আমার কাজ আছে—অন্য কাজ।'

'কিন্তু—ভাবো কখনো?—তুমি ছাড়া যার কাজ থাকবে না এমন মানুষ কোথায় পাবে তুমি চিরকাল?' ব'লে চিত্রা তার চোখ দুটি সম্পূর্ণ তুলে ধরলো মৌলির দিকে, প্রশ্ন ভরা চোখ, সাহসে ভরা, এমনকি—চোখের কোণে বিষাদ যেখানে লুকিয়ে ছিলো, সেখান এখন স্পর্ধার মতো ঝিলিমিলি উজ্জ্বল।

আর সেই উত্তর-চাওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে মৌলির হঠাৎ মহেন্দ্র ঘোষকে মনে পড়লো। মনে পড়লো তাঁর সুস্থির চলা, তাঁর 'wh' ব্যঞ্জনবর্ণের চেষ্টাকৃত, ত্রুটিহীন উচ্চারণ, নিজের পরিধির মধ্যে তাঁর আত্মবিশ্বাস—আত্মপ্রসাদ—যা কিছুতেই সহ্য করা যায় না অথচ যাতে দোষ ধরাও সম্ভব নয় কোনোরকমেই। সেটাই সবচেয়ে অসহ্য যে দোষ ধরার উপায় নেই, ভুল তিনি করেন না কখনো—কাঁটায়-কাঁটায় সেমিকোলনটি পর্যন্ত ঠিক আছে সব সময়। এ-কথা কি কল্পনাও করা যায় যে মহেন্দ্র ঘোষের জন্য বাড়িতে কখনো দরজি গেছে? না; নিজেই গেছেন দোকানে, পাঁচ দোকান ঘুরেছেন, দশ রকম কাপড় দেখেছেন, তখনকার পক্ষে সবচেয়ে পছন্দসই জামাটি অন্যদের চাইতে কয়েক আনা

কম খরচে তৈরি করিয়েছেন যখনই তাঁর দরকার হয়েছে। কথাটা ভাবতে হাসি পেলো মৌলির, অবজ্ঞার ঢেউ উঠলো মনে—যারা নিপুণ, যারা নির্বোধ, যারা তৃপ্ত, সেই নিকৃষ্ট সাধারণ মানুষদের সমস্ত সংসারটারই উপর অবজ্ঞা—কিন্তু সেই সঙ্গে ঈর্ষাও লাগলো একটু, কোনো-এক সূক্ষ্ম গোপন উন্নিদ্র ঈর্ষার দংশন।

এ-সব কথা স্রোতের মতো ব'য়ে গেলো তার মনের উপর দিয়ে, মুহূর্তের বেশি সময় লাগলো না। 'চিরকাল?' একটুমাত্র দেরি ক'রে চিত্রার কথার সে জবাব দিলো, 'সে যে অনেক! সে যে অনেক দূর! অত দূর পর্যন্ত কিছুই এখনো ভেবে দেখিনি।' ব'লে হেসে উঠলো যেন চিত্রা কোনো মজার কথা বলেছে, কিংবা যেমন শিশুরা হাসে যখন কোনো লজ্জা ঢাকতে চায়।

চিত্রার চোখ কোমল হ'লো, করুণার ছায়া পড়লো তাতে। চোখ সরিয়ে নিলো মৌলির দিক থেকে, সামনের পেয়ালা-সাজানো টেবিলটার দিকে তাকালো, বাইরে আকাশের দিকে দেখলো একবার। 'সত্যি! চিরকাল অনেক দূর। আপাতত—' হঠাৎ থামলো, যেন অন্য কিছু বলতে গিয়ে কথা বদলে নিলো—'আপাতত বেশ লাগছে। সন্দেশ খেলে না?'

'আর খাবো না। ইচ্ছেটা জীইয়ে রাখা ভালো।

'আরো ভালো ভালোর প্রতি সুবিচার করা,' ব'লে মৌলির সন্দেশের ভগ্নাংশটকু নিজের প্লেটে তুলে নিলো চিত্রা। দু-আঙুলে একটু ক'রে ভেঙে নিয়ে, এক-এক চুমুক চায়ের সঙ্গে খুব আস্তে শেষ করলো ওটকু, তারপর:

'কিন্তু হাসির কথা নয়, মৌলি; ভেবে ত্যাখো,' বলতে-বলতে গম্ভীর

হ'লো চিত্রার মুখ, 'যে-ত্যাগ মা দিতে পারে তা কি কোনো বন্ধুর কাছে কেউ পায় কখনো, না কি—' একটু থামলো সে, তার ম্লান গালের ঠিক মধ্যিখানে লাল ফোঁটাটি দেখা দিলো আবার—'না কি কোনো স্ত্রীর কাছেই পায়? লোকে তোমাকে ধন্য বলবে, মৌলি, জগতে তুমি আনন্দ বিলোবে অনেক, কিন্তু, মৌলিনাথ, বিয়ে করলে স্ত্রী তোমার সুখী হবে না।' শেষের কথাটা হালকা গলায় বললো, কিন্তু ধার লাগলো স্বরে, ঝলসে উঠলো চোখের দূর কোণ দুটি।

এবার চিত্রাকে বিঁধলো মৌলির চোখ, উদ্ধত চোখ, ক্ষমাহীন, আর আর সেই সঙ্গে যেন অসহায়, হেরে-যাওয়া, প্রার্থনায় আত্মবিস্মৃত। আস্তে-আস্তে বললো, 'সুখ! সুখী!' যেন ও-সব কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। 'তুমি কি এ-সব তুচ্ছ কথা বলবে, চিত্রা, যখন আমরা দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, মন্দিরের সামনে, বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে যখন আমরা ভয়ে কাঁপছি যেহেতু আর উপায় নেই! উপায় নেই, ডাক শুনেছি আমরা, আর উপায় নেই, আর উদ্ধার নেই আমাদের। ভয় কোরো না, শুধু তোমার হাতটি তুলে আস্তে একটু ছোঁও একবার, দরজা খুলে যাক।'

কী নির্লজ্জ মৌলি, কথা থামিয়েও থামলো না, চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো চিত্রার ডিমের ছাঁদের ম্লান রঙের ইটালিয়ান ম্যাডোনার মতো মুখের দিকে, করুণায় কোমল-হ'য়ে-আসা চোখ দুটির দিকে। আর হঠাৎ সেই চোখের পাতা কেঁপে উঠলো, নিবে গেলো চোখের কোণের ঝিলিমিলি, আরো ম্লান দেখালো মুখটি, হলদেমতো ফ্যাকাশেমতো শাদা, গালের হাড় উঁচু হ'য়ে ফুটলো, গম্বুজের মতো খোঁপা যেন মনে হ'লো এলিয়ে ভেঙে ছড়িয়ে যাবে। চোখে ঝাপসা দেখলো চিত্রা, যেন

অনেকখানি কুয়াশা পার হ'য়ে ঝাপসা দেখলো দরজার ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা অন্য দু-জন মানুষকে।

৩

ঘরের নীরবতা, নিবিড়, স্পন্দমান নীরবতা, মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হ'লো না। কুয়াশা কেটে গেলো, হাওয়া বইলো আবার, চিত্রা একটু ন'ড়ে ব'সে ডাকলো, 'গীতা। বেণু! আয়।'

সেই বারো বছরের ফুটফুটে মেয়েটি এগিয়ে এলো, পিছনে তার সত্যগোঁফের ছায়া-পড়া হঠাৎ-লম্বা-হওয়া দাদা। সেই জানলা-খোলা ঘরে, ফুল ফল খাদ্য পানীয়ে উজ্জ্বলতর বৈশাখী হাওয়ায়, চাঁপার গন্ধে চায়ের পেয়ালায় আবিষ্ট মন্থর পরিবেশে, মুখোমুখি দু-জন মানুষের অসমাপনের তীব্রতার মধ্যিখানে, দ্বিধান্বিত লাজুক পায়ে এগিয়ে এলো ওরা, শবরি কলায় আলো-করা চায়ের টেবিলের একটুখানি দূরে এসে দাঁড়ালো। চিত্রা আড়চোখে একবার তাকালো মৌলির দিকে, দেখলো তার চোখের ছায়াচ্ছন্নতা, তার কপালের ঈষৎ ফুলে-ওঠা রাজদণ্ডের মতো শির।

'মৌলি! একবার তো বসতেও বলতে পারো ওদের। কেমন বেচারা মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।'

'বোসো, গীতা। বেণু, বোসো।'

মৌলির এই কর্তব্যপরায়ণ আমন্ত্রণে সাড়া দিলো না কেউ। বেণু তার সত্যপ্রাপ্ত পুরুষের গলায় গমগম ক'রে বললো, 'নাঃ, বসবো না। মা জিগেস করলেন তুমি কি এখন যাবে, দিদি?'

'এই—একটু পরে। তোরা খেয়েছিস?'

'কখন!'

'আর-কিছু ইচ্ছে আছে নাকি? সন্দেশ একটু?' ব'লে চিত্রা দু-জনের দিকেই তাকালো, আর দু-জনের হ'য়ে বেণুই আবার উত্তর দিলো, 'নাঃ। যা পেয়ারা, দিদি, ঐ গাছটায়!' ব'লেই মৌলির দিকে তাকিয়ে একটু লাল হ'লো।

'খুব পেয়ারা হয়েছে, না?' যে-চোখে একটু আগেই মেঘ ছিলো, হয়তো বিদ্যুৎ, ঝড়ের সংকেত, সেই চোখেই এখন নির্মল হ'য়ে ছড়ালো গার্হস্থ্য প্রসন্নতা; চোখে হেসে চিত্রা বললো, 'কিন্তু এতক্ষণে একটাও বোধহয় নেই?'

'যাঃ! আমি মোটে এই দুটো-একটা—তুমি খাবে, দিদি? এনে দেবো?'

'এখন না। নিয়ে চলিস কয়েকটা।'

'হ্যাঁ, তা-ই বেশ ভালো হবে। যেতে-যেতে গাড়িতে খাওয়া যাবে বেশ। তাহ'লে যেতে দেরি আছে?'

'বেশিক্ষণ না।'

'কতক্ষণ? ধরো—কুড়ি মিনিট?'

'অত ঘণ্টা-মিনিটের হিশেব দিতে পারবো না,' চিত্রা এবার প্রকাশ্যেই হাসলো, প্রায় শব্দ ক'রেই। 'খানিক পরে যাবো আরকি।'

'না, যদি দেরি থাকে তাহ'লে তারকদের বাড়ি ঘুরে আসি একবার।'

'বেশ তো; ঘুরে আয়।'

'ওদের সাইকেলটা পেলে গাড়ি আনারও সুবিধে হয়। সেই স্টেশনে তো যেতে হবে গাড়ির জন্য।'

'ওটাই রেখে দিলে হ'তো।

'বা রে, খামকা বেশি ভাড়া দেবো কেন? সাইকেল না পাই হেঁটেই নিয়ে আসবো এক ছুটে। আনিনি আগে?'

'সত্যি, বেণু সঙ্গে থাকলে ভাবনা নেই!'

মুখ টিপে হাসলো ছেলেটা—চেষ্টা ক'রেও লুকোতে পারলো না। বুক টান করে বললো, 'যাই তাহ'লে। আমি ঠিক সময়মতোই আসবো—' আলগোছে শার্টের আস্তিন টেনে কব্জির দিকে একটা কটাক্ষ হানলো বেণু—'এই তারকের সঙ্গে খানিকক্ষণ—তারপর—বড়ো জোর আধ ঘণ্টা লাগবে আমার।'

'আমাদের খুব তাড়া নেই তেমন।'

'না, না, সময়মতোই সব করা ভালো।' বেণু একবার ঘরের চারদিকে তাকালো, মৌলির সঙ্গে চোখে-চোখে কোনোরকমে একটা সম্ভাষণ সেরেই ঘুরে দাঁড়ালো, বেরিয়ে গেলো এখনো-ঠিক-অভ্যেস-না-হওয়া মস্ত পায়ে এঁকে-বেঁকে।

চিত্রা হেসে বললো, 'ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে বাবা ওকে ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন, সেই থেকে বেণু বেজায় পাংচুয়্যাল হ'য়ে পড়েছে। কাঁটায়-কাঁটায় সব করা চাই। ওর সময়মতো নাওয়া-খাওয়ার তাড়ায় বাড়িতে সব অস্থির আছি আমরা।'

এই হালকা আদরের মতো পরিহাসের ছোঁওয়ায়, জীবনের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধের এই ঝিরিঝিরি আরামদায়ক হাওয়াটুকুতে, মৌলি সাড়া দিলো না। সামনের পেয়ালাটা হাতে তুলেই নামিয়ে রেখে বললো, 'চা কি আছে আর?'

চিত্রা চা ঢাললো মৌলির পেয়ালায়, নিজেও নিলো আর-একটু।

পেয়ালা নিতে মৌলি যখন ঝুঁকেছে, হাত বাড়িয়েছে চিত্রার দিকে, তখন তার চোখে পড়লো, যেন এই প্রথম বার চোখে পড়লো অন্য জনকে, অন্য মেয়েটিকে। জিগেস করলো, 'গীতা চা খায় না ?'

এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো গীতা ; বাড়ি ফেরার, গাড়ি ডাকার কথায় চুপ ক'রে ছিলো ; বেণুকে ঘড়ি নিয়ে ঠাট্টা করার সুযোগ নেয়নি, যোগ দেয়নি পেয়ারা পাড়ার সুখচর্চায়। বোধহয় অন্য কিছু দেখছিলো, অন্য কিছু ভাবছিলো, বোধহয় নিজেকেই এতক্ষণ ভুলে ছিলো এই বারো বছরের মেয়ে। এইবার তার অস্তিত্বের উল্লেখ শুনে—তার নাম, তারই নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে যেন চমকে চোখ তুলে তখনই আবার নামিয়ে নিলো।

'কী, খাবি নাকি একটু ?' তারপর, ঈষৎস্ফুট অসম্মতির মাথা নাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্রা আবার বললো, 'থাক, গীতা এখনো চা খায় না তেমন।'

'সেটা ভালোই। কিন্তু কবিতা কি পড়ে এখনো ?'

'বাঃ! তোমার সব কবিতা ওর মুখস্থ তুমি জানো না ?'

সেরে যাবে। আর দু-তিন বছরেই সেরে যাবে। ভেবো না,' ব'লে মৌলি একটা তির্যক দৃষ্টিপাত করলো গীতার দিকে।

টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো গীতার মুখ। দিদির মতো মুখ নয় তার, বরং নানা ভাবেই দিদির সে উল্টো। যা পুরোনো, যা ম্লান, যাকে মনে হয় ম্লান ব'লেই মূল্যবান, মনে হয় যেন ভঙ্গুর এবং যত্নে সাধা, কোনো ধূসর অবক্ষয়ের আভাসে যার রমণীয়তার ইন্দ্রিয়-ধার ক্ষ'য়ে যায়, যাকে হঠাৎ কখনো মনে হ'তে পারে ঝড়ের মতো তানের পরে গান থেমে আসার সর্বশেষ নিশ্বাসটুকু—এ-মেয়ের মুখে কিছুই তার নেই।

মৌ লি না থ

গোল ছাঁদের পুষ্ট মুখ, ফুটফুটে ফর্শা রঙের, তেমনি গোলাপি ধরনের ফর্শা যাকে মনে হয় প্রায় আপত্তিকর—বাংলার, বিশেষত পূর্ব বাংলার মাটিতে রীতিমতো অস্বাভাবিক এবং অশোভন। হয়তো কপালটি মেয়েদের পক্ষে একটু বেশি চওড়া, কিন্তু এই খুঁতটুকু ঢেকে দিয়েছে যেন তুলি দিয়ে আঁকা পরিষ্কার দুটি কালো ভুরু, আর তারই তলায় স্বচ্ছ গভীর চোখ দুটি, যার কোণের দিকে যেন নীল ছায়া জ'মে থাকে সব সময়, আর সামনের নীলচে-ব্রাউন গোলকের মধ্যে দু-ফোঁটা হিরের মতো তারা দুটি জলজ্বল করে। পাৎলা বিলেতি অর্গ্যাণ্ডির কুঁচি-দেয়া ফ্রক পরেছে বকের মতো শাদা, কিন্তু তার মাথার ফুল-ক'রে-বাঁধা রিবনটি ঠিক তার দিদির শাড়ির মতোই হালকা-নীল। মোটের উপর এ-মেয়ের বিধিলিপি যেন রূপসী ব'লে পরিচিত হওয়া, নিতান্তই সাধারণ অর্থে, সাংসারিক অর্থে রূপসী—এবং পরিশীলিত রসজ্ঞের মতে হয়তো তেমন পাংক্তেয় নয়, কেননা তাকে দেখে মনে হয় সেই সব মেয়েদেরই একজন, যারা ছেলেবেলায় খোলা হাওয়ায় খুব ছুটোছুটি করে, আর যা-কিছু খায় তা-ই নিখুঁত হজম ক'রে চিক্কণ মেদসঞ্চয় করে শরীরে—এবং যথাসময়ে স্বামী এবং সন্ততি নিয়ে ভরপুর সংসার ক'রে জীবন কাটায়; যাদের কখনো অসুখ করে না, ঘরে কখনো অকুলোন ঘটে না, যাদের ফর্শা কপালে সিঁদুরের টিপ একটুও কম উজ্জ্বল দেখায় না কখনো, যারা মোটা হয়, সুখী হয়, সুখী করে। এখন—এই যে সে দাঁড়িয়ে আছে তার বিসদৃশ চওড়া কপাল নিচু ক'রে, তার মাথার নীল রিবনের গুচ্ছটিকে সামনে এনে, এখন তার ইতিমধ্যেই গোল-হ'য়ে-ওঠা বাহু, আর ফ্রকের নিচে মসৃণ তরুণ জংঘার দিকে তাকিয়ে তাকে মনে হ'তে পারে এতই জীবনযোগ্য, সংসারযোগ্য,

যে তার কানের ডগাটকু পর্যন্ত ছড়িয়ে-পড়া লজ্জার লাল আগুনের অর্থ হয়তো ঠিক কারো চোখেই তেমন ক'রে ধরা পড়বে না।

মৌলি তাকালো গীতার দিকে, গম্ভীর চোখে তাকে দেখলো একটু। জিগেস করলো, 'তোমার কোনো বন্ধু নেই পাড়ায়?

গীতা জবাব দিলো না।

'তুমি ফুল ভালোবাসো? এই নাও'—টেবিল থেকে একটি চাঁপা তুলে হাত বাড়ালো মৌলি।

গীতা এগিয়ে এলো, মৌলির সামনে দাঁড়িয়ে একবার চোখ তুললো তার দিকে, একটি অপ্রত্যাশিত ললিত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে ফুল নিলো তার হাত থেকে, পা টিপে-টিপে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো।

'আশ্চর্য! একটু পরে ব'লে উঠলো চিত্রা।

'কোনটাকে আশ্চর্য বলছো?'

'গীতার কথা বলছি। বাড়িতে ওর দুরন্তপনায় টিঁকতে পারি না আমরা, আর তোমাকে দেখলে কী অসম্ভব শান্ত হ'য়ে যায়!'

'নাকি?' তেমন কৌতূহল কি উৎসাহ প্রকাশ পেলো না মৌলির গলায়।

'আমাদের ওখানেও যাও যখন—ওর সাড়াশব্দ পাও কখনো?'

'কী যেন—লক্ষ্য করিনি।' মাথার চুল উপর দিকে ঠেলে দিয়ে মৌলি বুঝিয়ে দিলো যে প্রসঙ্গটা বদলালে এবার ভালো হয়।

'না! গীতা তখন অন্য মানুষ!' চিত্রা কিন্তু এ-প্রসঙ্গ ছাড়লো না, বরং আঁকড়ে ধরলো, যেন গীতাকে দিয়ে আরো একটুক্ষণ আড়াল করতে চাইলো নিজেকে, মৌলিকে—যেন এই ছুতোয় আরো একটু পেছিয়ে দিতে চাইলো সেই হাতুড়ির বাড়ি, এই সকালবেলার

গীতিকবিতার শেষ দারুণ পংক্তিটি। 'তুমি যতক্ষণ থাকো—ও যে কোথায় থাকে কেউ দেখতেই পায় না। একদিন—তুমি হঠাৎ "পূরবী" হাতে ক'রে এলে, এসেই আওড়াতে লাগলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে—আমি একবার উঠে গিয়ে দেখি পাশের ঘরে গীতা ব'সে আছে চুপ ক'রে; সামনে স্কুলের বই খুলে তাকিয়ে আছে দেয়ালটার দিকে, তুমি যে কবিতা বলছো তা-ই শুনতে একমনে। আমাকে দেখে চমকে উঠলো।'

এই খবরটা শুনে মৌলি কোনো মন্তব্য করলো না।

'আর এখন দেখলে তো? কী-রকম ছবির মতো দাঁড়িয়ে ছিলো এসে! দু-একটা অন্তত কথা বলতে পারতে ওর সঙ্গে! ওর ইচ্ছে—আমি তো বুঝি—ওর ভীষণ ইচ্ছে তোমার একটু কাছে আসে; কিন্তু সাহস পায় না।'

'কী জানি,' মৌলি উদাসভাবে চুল টানলো। 'বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমাতে আমি একেবারেই পারি না।'

'বাচ্চা বলছো কাকে?'—চিত্রার চোখে কী-রকম একটা আলো আবার ঝলক দিলো হঠাৎ, যেন কোনো বোবা রাগের ঝিলিমিলি, প্রায় কোনো হিংস্রতার স্ফূরণ—'আর দু-দিন পরে গীতা যখন শাড়ি ধরবে, তোমারই মতো কত যুবকের বুকে ঢেউ তুলবে না তখন!'

'তোমার এ-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না,' অত্যন্ত গম্ভীর মুখে মৌলি জবাব দিলো, যেন কোনো অপমানকর, অসম্মানজনক কথা শুনেছে।

'ঠাট্টা নয়—সত্যি কথা। ছেলেমানুষ ব'লে যে চোখেই ছাখো না গীতাকে, তোমার নিজেরই বা বয়সটা কী?'

'আয়ুর অঙ্কে বয়স হয় না, চিত্রা; বয়স মানুষের মনে। আমারও

পনেরো-ষোলো বয়স ছিলো, কিন্তু আমি কখনো বেণুর মতো ছিলাম না। কোনোদিনই ও-রকম ছিলাম মনে করতে পারি না। গীতা তো ছোটোই ; অনেক বিষয়ে তোমার চেয়েও অনেক বেশি বয়স্ক আমি।'

'যথা—কাঁচা পেয়ারা ?' চিত্রা ঠোঁটের কোণে হাসলো।

'ঠিক ধরেছো! তুমি—এই তুমি—তুমি এখন গাড়িতে যেতে-যেতে পেয়ারা খাবে—অন্তত সেটা সম্ভব ব'লে মনে করো—এ-কথা ভাবতে আমার কী-রকম কষ্ট হয় জানো না ?'

'কষ্ট হয় ?'

'অবাক লাগে, বিশ্বাস হয় না, মেলাতে পারি না। তোমার সঙ্গে মেলাতে পারি না, চিত্রা !'

'আচ্ছা, মৌলি—সত্যি ক'রে বলো—তুমি যদি ঐ গাড়িতে থাকো, আর আমরা সবাই পেয়ারা খেতে-খেতে যাই, তুমি একটাও খাবে না ?'

'আমি ঐ গাড়ি থেকেই নেমে যাবো।'

'সত্যি ?'

'নিশ্চয়ই ! এ-সব সাধারণ সুখ অসহ্য লাগে আমার।'

'অসহ্য লাগে ?' চিত্রার চোখের কোণের বিষাদের ছায়া এবার নীল হ'য়ে নামলো সমস্ত মুখে ; বেদনায় ভরা, করুণায় ভরা দুটি চোখ বিস্ফারিত ক'রে মৌলির দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার ঠোঁট দুটি ফাঁক হ'লো, কিন্তু কথা বেরোলো না, শুধু ছোটো মাথাটি আস্তে-আস্তে নড়লো একটু—যেন বলতে চাইলো, 'আহা বেচারা !' বলতে চাইলো, 'ভগবান তোমাকে দয়া করুন !'—কিন্তু তাও থেমে গেলো ঠোঁটের কাছে উঠে আসার আগেই—কোনো কথাই থাকলো না, শুধু মনে-মনে ডাকলো, 'মৌলি, মৌলি !'—যেন হৃদয়ের গভীরতম কোনো দয়ার স্বরে,

মৌ লি না থ

অপরিসীম নম্র কোনো নিঃশব্দ উচ্চারণে শুধু তার নাম ধ'রে ডাকলো কয়েকবার। তারপর আস্তে-আস্তে, নিজেরই অজান্তে চোখ তার ভারি হ'য়ে বুজে এলো; চোখ বুজে থাকলো একটুক্ষণ; তারপর হঠাৎ যেন ঝাঁকানি দিয়ে জেগে উঠে বললো, 'চা খাওয়া হয়েছে তোমার? এগুলো নিয়ে যাবো?'

'থাক। বোসো। তুমি কি খুব অবাক হ'লে পেয়েরা বিষয়ে আমার কথা শুনে?'

'অবাক হবো কেন। জানি তো তোমাকে।'

'অথচ অনেক সময় এমন ব্যবহার করো, যা আমার—কী বলবো—যা আমার বাইরে, আমার জগতের বাইরে—বিরুদ্ধে বললেও দোষ হয় না।'

'কিন্তু তোমার জগতের বাইরেও মস্ত একটা বিশ্বজগৎ আছে, মৌলি। সেটা কি তোমার ইচ্ছেমতো চলবে তুমি আশা করো?'

'আমার আশা খুব ছোটো, চিত্রা। প্রকাণ্ড বিশ্বজগতের মধ্যে একজন মানুষ—শুধু একজন মানুষ—এটুকু দাবি করলেও দোষ?'

'দু-জন মানুষ কখনো এক মানুষ এক হয় না, মৌলি।'

'হয় না? তুমি আমি আজ যেখানে এসে মিলেছি সেখানে কোথায় ফাঁক আছে বলো তো? তাই বলি তোমাকে—সুর কেটে দিয়ো না, আরো কাছে এসো। ঘনিষ্ঠ হও।'

'কিন্তু—মৌলি—আমাকেই বা এত বিশ্বাস কিসের!' চিত্রা জোরে একবার নিশ্বাস নিলো কথাটা ব'লে, যেমন হয় কথার মধ্যে হাসি পেলে, কিংবা যদি দম আটকে আসে হঠাৎ।

'তাই বুঝি?' ছোট্ট হাসি ফুটলো মৌলির ঠোঁটে, দয়ালু হাসি,

মা যেমন ভুরু বাঁকিয়ে অভয় দেন, কোনো অপরাধ ক'রে শিশু যখন সামনে এসে দাঁড়ায়। হাঁটু উঁচু ক'রে টেবিলে ঠেকিয়ে চেয়ারটি দোলাতে লাগলো আস্তে-আস্তে, আয়েসি গলায় বললো, 'ভারি একটা মজার গুজব রটেছে ইউনিভার্সিটিতে; জানো তো?'

'কী, শুনি?' চিত্রাও যেন আরাম ক'রে পিঠ এলিয়ে দিলো ইজি-চেয়ারে।

'তোমার নাকি বিয়ে—আর কার সঙ্গে জানো?—মহেন্দ্রবাবু, মহেন্দ্র ঘোষ প্রোফেসরের সঙ্গে!' নিচু, নরম গলায় লম্বা টানে হেসে উঠলো মৌলি—যেমন ক'রে হেসেছিলো গীতার কবিতা পড়ার কথায়—হাসির ঝোঁকে চেয়ারটা একটু বেশি উল্টিয়ে যেতেই হাত দিয়ে টেবিলটা ধ'রে ফেলে সোজা হ'লো। 'ছেলেরা সব বলাবলি করে এ নিয়ে—আর জানো, আমার কাছেই বলে।'

'তুমি কী বলো?' একটুও নড়লো না চিত্রা, একটু টেনে-টেনে কথাটা বললো, যেন তার ঘুম পেয়েছে, যেন ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম করছে এখন, অনেক উত্তেজিত তর্কের পর আরামে ব'সে একটু মৃদুকোমল বিশ্রম্ভালাপে নেমেছে।

'আমি আর কী বলবো—হাসি পায়—গম্ভীর হ'য়ে শুনে যাই সব। ওরা তো আর জানে না—কিন্তু জানে না কেন তাও বুঝি না—তোমাকে দেখে, আমাকে দেখে ওদের বোঝা উচিত।'

'কী বোঝা উচিত?'

'কে কবে আগুন লুকোতে পেরেছে? ওদের চোখ নেই? দেখতে পায় না?'

চিত্রা জবাব দিলো না। জবাব না-দিলেও চলে এই প্রশ্নের—না কি

সে এতই ক্লান্ত যে একটু কথা বলতেও তার আলস্য ? কেমন দেখাচ্ছে তাকে—একটু কি ফ্যাকাশে হয়েছে মুখ ?—না কি ইতিমধ্যেই-তারুণ্য-হারানো সকালবেলায় জানলা থেকে রোদ স'রে গিয়ে তার মুখের স্বাভাবিক ম্লানতা আরো বেশি প্রকট হয়েছে ? স্তব্ধ হ'য়ে এলিয়ে আছে সে, ইজিচেয়ারের বঙ্কিমার সঙ্গে তার শরীরের ছিপছিপে গড়নটি খাপে-খাপে মিলে গেছে যেন, হাত দুটি নেতিয়ে আছে পাশে, চোখে যেন তন্দ্রাভরা শূন্যতা ;—বিরাম, পূর্ণ বিরামের ছবি তাকে দেখে মনে হবে এখন, লাফিয়ে পড়ার আগে যেমন ঝোপের পিছনে লম্বা রেশমি বাঘিনীর শরীরের আশ্চর্য বিরাম। ঠিক তেমনি ব'সেই, মৌলির দিকে স্পষ্ট ক'রে না-তাকিয়ে, চিত্রা আস্তে-আস্তে বললো, 'যদি আমি বলি যে গুজবটা সত্যি ?'

'সত্যি ! সত্যি !' মৌলি হাসলো, আর-কিছু বললো না।

'সত্যি, মৌলি ! তুমি যা শুনেছো তা সত্যি।'

এতক্ষণে মৌলি লক্ষ্য করলো চিত্রার ফ্যাকাশে-দেখানো মুখ, তার শরীরের নেতিয়ে-পড়া অবশ নিস্পন্দ ভঙ্গি। একটু ভয়, ভয়ের অতিশয় হালকা একটু ছায়া তার মুখের উপর দিয়ে ভেসে গেলো। তারপর আশ্বাসের সুরে, বিশ্বাসের সুরে, একটি অতি কোমল সুদূরস্পর্শী স্নেহের সুরে বললো, 'তুমি কি আজ পাগল হ'লে ?'

'মৌলি, আমার কথা শোনো—' হঠাৎ যেন একটা কাঁপুনির ঢেউ ব'য়ে গেলো চিত্রার পা থেকে মাথার খোঁপা পর্যন্ত—'তোমাকে একটা কথা বলতেই আজ এসেছিলাম।'

আবার একটু থমকালো মৌলি, চিত্রার দিকে সরু চোখে একবার তাকালো, কিন্তু তখনই আবার পরিষ্কার সরল হ'লো তার চোখ, খুব

শান্ত একটি হাসি ফুটলো মুখে। 'কী, বাড়ির লোক জোর করছে? তা ভয় কী। তুমি—আমি—এই অফুরন্ত পৃথিবী—ভয় কী আমাদের?

'তোমার জন্য অফুরন্ত পৃথিবী; আমার জন্য ছোটো একটি সংসার।'

'ও-দুই কি মিলবে না কখনো?' হঠাৎ মৌলির মন যেন অন্য কোথাও চ'লে গেলো—আবেশে আরো কালো দেখালো তার চোখ, যেমন হয়েছিলো দেখতে যখন একলা ঘরে সুইনবর্ন গুনগুন করছিলো সে; গুনগুন ক'রে, যেন আপন মনেই বলতে লাগলো, 'ও-কথাও ভেবে দেখেছি আমি। কত এমন সময় আসে যখন আমার মনে হয় আমি সব পেয়েছি, শুধু এই পৃথিবীতে জন্মেছি ব'লেই সব পেয়েছি; সকাল, বিকেল, দুপুর, রাত্রি, ঋতুর পর ঋতু—কোনো-একটি মুহূর্ত অন্য কোনো মুহূর্তের মতো নয়—; কত সময় আমায় মনে হয় যদি একশো বছর বাঁচি তবু ক্লান্ত হবো না কিছুতেই, শেষ হবে না আমার বেঁচে থাকার আবেগ।'

চিত্রা নিঃসাড় ব'সে থাকলো, যেন মৌলির কথা শুনছেই না, কিংবা খুব একমনে শুনছে ঠিক তার নিজের মুহূর্তটিকে ধরবে ব'লে।

'কিন্তু আবার অন্য অনেক সময় আসে, যখন আমি তোমাকে চাই। তোমাকে চাই, চিত্রা। যখন মনে হয় তুমি না-হ'লে কিছুই হ'লো না; এই আলো, আকাশ, আকাশের তারা, এরা কোনো কথাই বলবে না আমাকে, যদি না তারা তোমার গলা খুঁজে পায়। তখন বুঝি, কত মিথ্যা আমার দম্ভ, কত আমি অসম্পূর্ণ—তোমাকে ছাড়া। উপকরণের অন্ত নেই পৃথিবীতে, কিন্তু কে তাকে ছন্দে বাঁধবে তুমি না-হ'লে? তথ্যকে কবিতা ক'রে তুলতে, বস্তুকে সুর ক'রে বাজাতে কার কাছে আমি শিখতাম তোমাকে যদি না পেতাম? সেই তুমি—চিত্রা, সেই তুমি!'

চিত্রার ছোটো মাথাটি আস্তে-আস্তে নড়লো একটু, কিন্তু আর কোনো ভঙ্গি হ'লো না শরীরে, মুখের ভাবও বদলালো না। নিশ্বাসের স্বরে বললো, 'সে আমি নই, সে আমি নই।'

'এখনো তোমার ভুল ভাঙলো না?'

'আমি কখনো ভুল করিনি, মৌলি। কখনো ভাবিনি যে ও-সব কথা যাকে তুমি বলো সে তোমারই মনের কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু।'

'তুমি আছো ব'লেই সার্থক আমার কল্পনা। নয়তো কিছুই থাকে না—সব ফাঁকা, শূন্য—নয়তো পায়ের তলায় মাটি থাকে না, চিত্রা।'

'আমি নই—সে আমি নই। তোমার বন্ধুরা ভুল বলেনি, মৌলি।'

'মানে?' মৌলির চোখের দৃষ্টি বদলে গেলো হঠাৎ, তার তন্ময় দীপ্তি নিয়ে গিয়ে কেমন-একটা পথ-হারানোর অনিশ্চয়তা ফুটলো। যেন ছটফট ক'রে ব'লে উঠলো, 'কী বলছো, তুমি?'

আর সেই তার অস্থির, অসহায়, করুণ, সুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে একটা তীব্র, অক্ষম, কিন্তু একটু মধুর, প্রায় যেন উপভোগ্য আক্রোশ চিত্রার বুকের মধ্যে ঠেলে উঠলো। ছাখো, ছাখো একে! ছাখো এই লোকটার দিকে তাকিয়ে! নির্বোধ, এখনো নির্বোধ থাকবে তুমি—আমাকে বাধ্য করবে আরো বলতে, টুকরো ক'রে ফুল ছিঁড়তে—সাধারণ সুখ সইতে পারে না যে-মানুষ, তার প্রচণ্ড দুর্বলতাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যতক্ষণ না গিয়েছি ততক্ষণ ছাড়বে না আমাকে, আমাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে না-গিয়ে ছাড়বে না, নিষ্ঠুর? লাল হ'য়ে উঠলো চিত্রা, গুণ-পরানো তীরের ফলা যেমন একটু-একটু কাঁপে তেমনি তার নাকের ডগাটি কাঁপলো একবার, হঠাৎ এক টানে তীরের মতো উঠে ব'সে অদ্ভুত অন্য রকম গলায় বললো, 'শোনো, মৌলি। শুনে নাও

কথাটা। যা শুনেছো, সত্যি। একটুও ভুল নেই তাতে। শুনেছো? বুঝেছো?'

মৌলির উপরের ঠোঁট নিচেরটির উপর আঁটো হ'য়ে নামলো, এলোমেলো চুলে ভরা মাথাটা ভারি হ'য়ে নামলো তার বুকের কাছে। প্রথমে মনে হ'লো সে হেরে গেছে এবার, আর-কিছু বলবে না, কিন্তু একটু পরেই মুখ তুললো যখন, সে-মুখে দেখা গেলো একটি আশ্চর্য সরল মধুর নিষ্করুণ হাসি। ঐ হাসি দিয়ে চিত্রাকে যেন নতুন ক'রে সম্ভাষণ ক'রে সে বললো, 'শুনেছি। বুঝেছি। কিন্তু বিশ্বাস করি না।'

'শোনো। কেউ জোর করেনি আমাকে। আমারই মত নিয়ে হচ্ছে। এই দু-দিন আগেই ঠিক হ'লো সব। যা বলতে এসেছিলাম বলা হ'লো; এখন যাই।'

'না। যেয়ো না। বোসো।'

'আর-কিছু বোলো না, মৌলি। আমাকে যেতে দাও।'

'ব'লে যাও এ-সব কথা মিথ্যা!'

'মিথ্যে নয়, সত্য।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'ঐ মহেন্দ্র ঘোষ—তাঁকেই?'

'হ্যাঁ। তিনি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন বাবার কাছে। আমি রাজি হয়েছি।'

'তুমি—রাজি হয়েছো?'

'যা ভালো—যাতে ভালো হবে—আমাকে তা করতেই হ'লো।

ভালো? এই ভালো?' মৌলি নির্বোধের মতো আওড়ালো

কথাটা, যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। দু-হাতে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে থাকলো একটু। হাত যখন সরালো দেখা গেলো তার নাসারন্ধ্র স্ফীত, আর চোখের কোণে লাল-লাল ছিটে। 'ভালো কেন?'

'তা তুমি এখন বুঝবে না। পরে বুঝবে। দু-বছর—হয়তো এক বছর পরেই বুঝবে যে এই ভালো হ'লো।'

চিত্রার এই কথায় তার নিজের কথারই প্যারডি শুনলো মৌলি, খানিক আগে গীতাকে সে যা বলেছিলো তারই উৎকট ব্যঙ্গানুকৃতি। আর এতক্ষণ এত কথার পরে এতেই যেন মর্মস্থলে আঘাত লাগলো তার, আঘাত লাগলো মূল্যবান আত্মাভিমানে, ধারালো চোখে চিত্রার দিকে তাকালো, গর্বিত, উৎপীড়িত, বিদ্রোহময় দৃষ্টিতে। কিন্তু মৌলি কিছু বলতে পারার আগেই, তার প্রতিবাদের চীৎকার কোনো ভাষা পাবার আগেই চিত্রা আবার কথা বললো :

'তুমি যা ভেবেছো—ভেবেছিলে—জানো না সেটা অসম্ভব?

'সেই অসম্ভব তুমি কখনো ভাবোনি? সাহস থাকে তো সত্য জবাব দাও।'

চিত্রার চোখের লম্বা পলক তার গালের উপর ছায়া ফেললো। যেন অনিচ্ছার বাধা ঠেলে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'আমার কথা তুমি বুঝবে না, মৌলি। তুমি পুরুষ—তুমি ছেলেমানুষ।'

মৌলির চোখে ঝলক দিলো বিদ্যুৎ। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললো, 'কী?'—'ক-টা 'খ'-য়ের মতো শোনালো—'কী বললে?'

চিত্রাও উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে-সঙ্গে। মনে হ'লো সে হাত বাড়াবে, হাত বাড়িয়ে ধ'রে ফেলবে মৌলিকে, কিংবা হঠাৎ হাঁটু ভেঙে ব'সে

পড়বে ঐ মেঝের উপরেই। মৌলি একটু পিছনে স'রে গর্জন ক'রে উঠলো—'আমি ছেলেমানুষ!'

'তুমি অসাধারণ, তুমি প্রতিভাবান, তুমি অনেক বিষয়ে অনেক বড়ো—সব মানি, মৌলি; কিন্তু তুমি যে ছেলেমানুষ সে-কথাও তো সত্য!' বলতে-বলতে নিশ্বাস ভারি হ'লো চিত্রার, ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম ফুটলো কপালে, কখনো কল্পনা-করা-যায়-না এমন দু-একটা কুশ্রীতার রেখায় বিকৃত হ'লো সুন্দর ছোটো মুখটি; কিন্তু তবু, তার কষ্টের খরতর উজান ঠেলে তবু সে বলতে লাগলো, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, মৌলি, ভক্তি করি বলতেও বাধে না; যদি তুমি কোনোদিন পৃথিবীতে কোনো মন্ত্র প্রচার করো তোমারই কাছে দীক্ষা নেবো আমি—তোমাকে গুরু ব'লে মানতে এখনো আমার আত্তি নেই—কিন্তু সংসার—সংসার আছে, মৌলি—মেয়ে হ'য়ে জন্ম নিয়ে সংসার থেকে মুক্তি কোথায় মুখটি একটু উঁচু ক'রে চুপ করলো চিত্রা, তার লম্বা-দেখানো গলার উপর অনতিস্ফুট কণ্ঠাটি স্পন্দিত হ'লো দু-একবার, তারপর শাদা-হ'য়ে-যাওয়া ঠোঁট নেড়ে আবার বললো, 'সেই সংসারে তুমি ছেলেমানুষ, মৌলি—সেখানে তোমাকে আর-কিছুই ভাবতে পারি না।'

মনে হ'লো মৌলি তার উত্তর নিয়ে তৈরি, তার পরম পাশুপত উত্তর, যা চিত্রার পরিশ্রমী প্রাকার মুহূর্তে উপড়ে দেবে ধুলোয়, ঢেলার মতো গুঁড়িয়ে দেবে সব কথা, মুচড়ে লুটিয়ে ফেলবে চিত্রাকে চিরকালের মতো তার পায়ের তলায়। নিশ্বাসের বেগে ঠোঁট খুলে গেলো তার, কিন্তু—কিছু বললো না। হঠাৎ যেন শক্তি ফুরিয়ে গেলো, ক্লান্ত হ'য়ে এলিয়ে ব'সে পড়লো আবার, নিষ্প্রভ হ'য়ে, নিবে গিয়ে, যেন শরীরের আয়তনেও ছোটো হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে ব'সে পড়লো। আর সত্যিও

তাকে দেখালো যেন দুরন্ত ছেলে উপযুক্ত ধমক খেয়েছে এইমাত্র ; বলবার তার কিছুই আর নেই।

আর তারপর সেই ঘরের মধ্যে সব কিছুই থেমে গেলো যেন। বাইরে গাছের পাতা হাওয়ায় নড়লো, ডেকে চললো অধ্যবসায়ী একলা একটা পাখি, আকাশের অম্লান নীলিমা নির্বিকার তাকিয়ে থাকলো পৃথিবীর সুখদুঃখের দিকে। ঘরের বাইরে বেণুর গলা শোনা গেলো—'দিদি, গাড়ি এসেছে।'

'যাই!' চিত্রা স'রে এসে মৌলির চেয়ারের পিছনে দাঁড়ালো। প্রায় কোনো শব্দ না-ক'রে ডাকলো, মৌলি!'

মৌলি মুখ তুললো না।

'আমি যাই তবে?'

মৌলি চুপ।

চেয়ারের পিঠের উপর দিয়ে নিচু হ'লো চিত্রা, দু-হাতে হাতল দুটো ধরলো। মৌলির চুলের গন্ধ তার নিশ্বাসে লাগলো, মৌলির মাথাটা স্পর্শ করলো তার বুক। আবার ডাকলো, 'মৌলি!'

মৌলি কথা বললো না, নড়লো না।

'তুমি কিছু বলবে না আমাকে?'

মৌলি একভাবেই ব'সে থাকলো। চিত্রার ঘনিষ্ঠ বুক থেকে মাথাটি পর্যন্ত সরিয়ে নিলো না—হয়তো তাতেই বোঝাতে চাইলো তার কাছে চিত্রা এখন কত অর্থহীন।

'একবার ফিরেও তাকাবে না?'

কোনোরকম বদল হ'লো না মৌলির ভঙ্গিতে। হয়তো তাকে ভান করতে হ'লো যে ঐ শব্দটা সে শুনছে না, তার স্ফীত শিরার দপদপ শব্দ

মাথার মধ্যে—না কি চিত্রার—না কি কানের কাছে চিত্রার হৃৎপিণ্ড, তার তৃপ্তিহীন, সান্ত্বনাহীন হৃদয়স্পন্দন ?

'থাক। কথা বোলো না। আমার দিকে চেয়ে দেখো না। আমি যাই। যাবার আগে শেষ কথা ব'লে যাই তোমাকে। মৌলি—তোমাকে ভালোবাসি।'

আর তারপর—মৌলির পিছন থেকে আশ্রয় স'রে গেলো, তার মাথাটি শূন্যে ঝুলে থাকলো যেন—সব শূন্য—তবু সেই হৃৎস্পন্দন থামলো না, কিংবা একটু বদল হ'লো তাতে, একটু অন্য রকম শোনালো। এখন মৌলিকে শুনতে হ'লো—ঠিক শুনতে হ'লো তাও বলা যায় না, শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুভব করতে হ'লো চিত্রার অতি মৃদু দিগন্তব্যাপী পায়ের শব্দ।

বেলা বাড়লো। কমলেশবাবু সাইকেলে চ'ড়ে কোর্টের দিকে রওনা হলেন। মোড়ের কল থেকে জল নিয়ে এলো ভাঁড়ি। রোদে তেতে উঠলো শাদা ধুলোর পথ। ঘরে প'ড়ে থাকলো খাওয়া-শেষের দাগ-ধরা চায়ের পেয়ালা, কলার খোশা, রুটির গুঁড়ো। একটা রৌদ্রজাত নীল মাছি ভোজে ব'সে গেলো সেখানে। একবার উড়ে গিয়ে হঠাৎ একটু দূরে বসলো পাথরের থালায় চাঁপা ফুলের উপর। মৌলি চুপ ক'রে দেখতে লাগলো মাছিটাকে ; তাড়াবার জন্য হাত তুললো না, চুপ ক'রে ব'সে থাকলো।

২

একটি বর্ষার সন্ধ্যা

১

পাচ বছর পরে আষাঢ়ের এক অপরাহ্ণ নিবিড় হ'য়ে নেমেছে সেই পুরানা পল্টনে। সেই—? না কি অন্য এক, অন্য কোনো—যা ছিলো তার স্মৃতি দিয়ে ভরা, যা হ'য়ে গেছে তার চিহ্ন মুছে-ফেলা, শুধু সেই একই নামের সূত্রে বাঁধা অন্য এক পুরানা পল্টন? আরো অনেক বাড়ি উঠেছে পাড়ায়: দোতলা বাড়ি, জাঁকালো বাড়ি, বাগানওলা, পরদা-ঘেরা, মার্বেল পিতলের নামের ফলকে চকচকে আত্মসচেতন। পাড়ার এই চকচকে ভাবটাই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে এখন—যখন 'শহর' থেকে, শাঁখারিবাজার, তাঁতিবাজার ইসলামপুরের মিষ্টি স্যাঁৎসেঁতে পচা-পচা নেশা-ধরানো গন্ধে-ভরা পুরোনো দিনের ঢাকা থেকে কেউ আসে সেখানে—টাটকা চুনকাম-করা দেয়াল—কেননা, অধিকাংশ বাড়ি নতুন, আর তেমন পুরোনো কোনোটিই এখনো নয়—সত্যসবুজ খড়খড়ি, ক্রেটোন কাপড়ের পরদার ফাঁকে ধূসর শীতল মসৃণ মেঝের পরিচ্ছন্ন আভাস;—সব মিলিয়ে নতুন; কিন্তু কৈশোরের, তারুণ্যের, অসমাপ্ত, সমাপ্য, নিজে-নিজে হ'তে-থাকা এবং হ'য়ে-ওঠা কোনো পদার্থের বেপথুমান অস্থির নতুনত্ব আর নয়—সত্য-বানানো পণ্যের মতো নিশ্চিন্ত নতুন, সত্যকেনা জিনিশের মতো গম্ভীর চকচকে—পালিশ-করা, শেষ-করা, তৈরি। তৈরি হ'য়ে উঠেছে এতদিনে; শাদা ধুলোর রাস্তা এখন শান-বাঁধানো, পিচের প্রলেপে নির্ভরযোগ্য, মোড়ে-মোড়ে বিজলি-বাতির ভদ্রতা, আর ঘরে—কোনো-কোনো ঘরে—এই সেদিনমাত্র গুর্জর যার শোনা গেলো, আর ইতিমধ্যেই সগৌরবে যে সমাগত, সেই রেডিওযন্ত্রে কলকাতার কলতান। না—

এখন আর দৃশ্য কিছু নেই ; জংলি প্রকৃতি পোষ মেনেছে মানুষের হাতে, এই পাড়া এখন স্থিত, সুস্থির, আরামদায়ক, সম্ভ্রান্ত, তার উপর রমনার মহিমা-ছোঁওয়ায় গরীয়ান ; হাল আমলের, আধুনিক, ফ্যাশনযোগ্য ; বদলি-হ'য়ে-আসা ডেপুটিবাবুর আকাঙ্ক্ষিত পীঠস্থান।

এই ইস্ত্রি-করা টেরি-কাটা পাড়ায়, ডেপুটি-মুন্সেফ-প্রোফেসর এবং পেন্সন-পাওয়াদের প্রতিবেশিতার মধ্যে, মৌলিনাথের ছোটো একতলাটি তেমন ভালো আর দেখায় না—একটু বেখাপ লাগে, যেন দলছাড়া, গোত্র-হারানো। এর মালিকের—দেখেই বোঝা যায়—তেমন যত্ন নেই বাড়ির উপর—কিংবা সামর্থ্য নেই ; বৃষ্টি স'য়ে-স'য়ে কালশিরে পড়েছে দেয়ালে, কোথাও আবার কালোর গায়ে শ্যাওলা ধরেছে—আর সেই শ্যাওলার বুকে বেগনি রঙের যে-ছোট্ট ফুল হঠাৎ উঁকি দেয় এক-একদিন, পাশের বাড়ির ডালিয়া-ফোটা বাগানের সামনে কোন লজ্জায় সে মুখ তুলবে! এই পাশের বাড়িটা—শৌখিন, অর্বাচীন, দর্পিত দোতলা, সে তার বড়ো-বড়ো ঘর আর বারান্দা ছড়িয়ে মৌলির পুব দিকটাকে প্রায় পূর্ণগ্রাস করেছে ; সেদিকে তাকালে মৌলিনাথ আজকাল দেখতে পায়—দূর গাছপালার আবছা-সবুজ কালচেমতো পুঞ্জ আর দেখতে পায় না, ঐ বাড়িটার হালকা চটুল গোলাপি রংটাই দৃষ্টিসীমা জুড়ে থাকে। কিন্তু দক্ষিণ—অন্তত দক্ষিণটা তার অবাধ আছে এখনো ; প্রান্তর পেরিয়ে ফুটবলের মাঠ, তারপর রেল-লাইন—তারও ওপারে লম্বা সরু বারান্দাওলা শহুরে বাড়ির চিলকোঠা পর্যন্ত চোখ দিয়ে ছুঁয়ে আসবার বাধা নেই ; আর এদিকে, চোখের সামনে, প্রান্তর থেমে পাড়া যেখানে আরম্ভ, সেখানে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে হাজার পাতায় অফুরন্ত অস্থির সেই স্থবির বলীয়ান বটগাছ। এখন, এই ছায়াচ্ছন্ন থমথমে বিকেলে,

মৌলি ব'সে আছে দক্ষিণের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে—সেই ইজি-চেয়ারে, চিত্রা যেটাতে বসেছিলো। চেয়ারটি একটু মলিন হয়েছে এ-কয় বছরে, ঘরের অন্যান্য আসবাবও তা-ই; দেয়াল একটু বিবর্ণ; পুবের জানলায় পরদা দিতে হয়েছে, আর মেঝের যেখানটা খুব রোদ্দুর পায় গ্রীষ্মকালে—যেখানে নীল শাড়ি-পরা চিত্রা তার পা দুটি রেখেছিলো—সেখানে চুলের মতো অতি সূক্ষ্ম ফাটল নকশা এঁকে দিয়েছে সিমেণ্টে। এ ছাড়া আর ঘরটির বিশেষ বদল হয়নি; শুধু বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে, মৌলির পুরোনো বেঁটে আলমারির পাশে আর-একটা এখন উঁচু এবং বেঢপ হয়ে দাঁড়িয়ে, তাছাড়া ছোটো শেলফ গোটা তিনেক—তাদেরও আকৃতিগত সামঞ্জস্য নেই ব'লে, এবং মোটের উপর বড্ড বেশি বই আছে ব'লে, ঘরটি আগের চাইতে ছোটো দেখায় এখন—হয়তো, অন্যদের কাছে একটু গম্ভীরও লাগে।

চুপ ক'রে ব'সে আছে মৌলি। তার পায়ের কাছে মেঝের উপর প'ড়ে আছে দু-ঘণ্টা আগে পৌঁছনো কিন্তু মাত্রই একটু আগে চোখ-বুলিয়ে-রাখা এলোমেলো খবর-কাগজ। পাশে, বেতের ছোটো গোল টেবিলে দু-একটা বই, বাংলা মাসিকপত্র। তাকিয়ে-তাকিয়ে মৌলি দেখছিলো, কেমন বিশাল, কেমন সীমান্তহীন বিস্ফারিত হয়ে নেমে আসছে আষাঢ়ের সন্ধ্যা। মেঘের উপর মেঘ জমেছে আকাশে, রঙের উপর রং লেগেছে; পরতে-পরতে, ভাঁজে-ভাঁজে, একই রঙের ক্রমশ-গাঢ়-হওয়া স্বরগ্রামের কী আশ্চর্য সংগতিসাধন এই আকাশময় বিস্তীর্ণ অর্কেস্ট্রায়! শাদা মেঘের উপর ধোঁয়া মেঘ, ধোঁয়ার উপর নীল, নীলের উপর কালো। আশ্চর্য, অপরূপ, অলৌকিক—শূন্য দিয়ে গড়া এই রঙ্গমঞ্চ, আকাশ নামক কল্পনা দিয়ে বানানো এই নাটমন্দির—অলীক, ভিত্তিহীন, কিছুই না—অথচ

বাস্তব, বিশ্বাস্য, দৃশ্যমান। ঐ দূরে, রেল-লাইনের ওপারে শহুরে চিল-কোঠার উপর আকাশ যেখানে ঢালু হ'য়ে নেমেছে—কিংবা যেখানে তার উত্থানের আরম্ভ—সেখানে আকাশ নির্মেঘ নিরঞ্জন, কিংবা—যেহেতু কোনো নাম আমাদেরই দিতেই হবে—কিংবা শুভ্র, যাকে ঠিক শাদা বলে তাও নয়—ডিমের খোলার মতো নির্বিকার রঙের—কোমল, স্বচ্ছ, স্পর্শাতীত, পবিত্র—অস্পৃষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গের চোখে বারাঙ্গনার উদ্‌ঘাটিত উরুর মতো অপাপবিদ্ধ। তারপর ধাপে-ধাপে উঠেছে মিশ্র স্বর, শ্রুতি, সুরসম্ভার, অতি কোমল রেখাব থেকে তীব্র নিখাদ পর্যন্ত; বেঁকে-বেঁকে উঠেছে ছাই রং, ছায়া রং, ধূসর, ধূসর একটি হৃদয়হরণ মীড় দিয়ে মিশে গেছে নীলের মধ্যে: নীল, হালকা-নীল, স্বপ্ন-নীল, গাঢ়-নীল—কোথাও একটু সবুজে ছোঁয়া—অরণ্য-পথে চুঁইয়ে-পড়া ভোরের মতো সবুজ, আবার কোথাও, দুপুরবেলার বনচ্ছায়ার মতো মখমল-গভীর বেগনিতে ডোবানো; তারপর সেই বেগনি থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে কালো, নিথর কালো, পুঞ্জীভূত—মৌলির চোখ যেখানে আর পৌঁছয় না, আকাশের সেই সব তুঙ্গ সুদূর শিখরে-শিখরে পরিকীর্ণ—যাকে নষ্ট মেয়ে সুরঙ্গমা চেনে কিন্তু প্রিয়তমা মহিষী যাকে চেনে না, সেই প্রেমিক, ভয়াল, প্রেমাতুর, প্রার্থনীয় রাজার মতো ভাবনা-বাসনা-সব-ডোবানো অকূল অতল অপরিমাণ কালো। আর সেই কালোর বুকে—তিন লাইন ছেড়ে-দেয়া কোনো স্বপ্নে-পাওয়া অচিন্তনীয় মিলের মতো, কিংবা কবিতার ফিরে-আসা কিন্তু সমস্তটির অর্থ-বদলে-দেয়া ধুয়োর মতো, কিংবা—সুর যখন ব্যাকুল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে নিজেকে প্রায় অসীমে হারায় তখন সমের মুখে হঠাৎ-পড়া ফিরিয়ে-আনা মৃদঙ্গ-বোলের মতো—সেই ঘনকালোর বুকে আবার ভেসে আছে হালকা রং, ধোঁয়াটে শাদা

একটি বর্ষার সন্ধ্যা

অনিশ্চিত স্বচ্ছ মেঘ, যেন গগন ঠাকুরের মায়াবী কোনো জানলায় দেখা আলো—ঐ কালোকে আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। দেখা যাচ্ছিলো মেঘেদের নড়াচড়া—মন্থর ধ্রুপদী তালে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে পরস্পরে মিশে যাওয়া, কোনো-এক অন্তর, অধৈর্যহীন, পরিবর্তমান স্থাপত্য-বিলাস—মিনার, খিলান, সোপান, গম্বুজ, বারান্দার পর অফুরন্ত বারান্দার ভাঙা-গড়া;—তারপর, তাকিয়ে থাকতেই-থাকতেই, সব ভেঙে গেলো, মুছে গেলো, একাকার হ'লো কালোয়; স্তব্ধ হ'লো গতি, হাওয়া বন্ধ;—কম আলোয় আরো-বিস্তীর্ণ-দেখানো প্রান্তরের উপর, ছবির মতো নিস্পন্দ-হওয়া বটগাছটার উপর, সমস্ত রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষমাণ পৃথিবীর উপর, মেঘ তার জটায়ু-পাখা আদিগন্ত ছড়িয়ে দিয়ে প'ড়ে থাকলো। এখন আর কিছু নেই, আর-কিছু হবার নেই: শুধু বৃষ্টি।

—বৃষ্টি নামুক। মেঘ ফেটে যাক, দিগন্তকে ছিঁড়ে নিক হাওয়া, আকাশটাকে ফাটিয়ে দিয়ে বজ্র বেজে উঠুক। আ—মৌলি মনে-মনে ভাবলো—কী আনন্দ এই রকম সন্ধ্যায়, কী আনন্দ ঝড়বৃষ্টির সহচর বিরুদ্ধতাকে বুকে ক'রে বেরিয়ে পড়তে, ঘুরে বেড়াতে, এগিয়ে যেতে! কত দিন, কত রাত্রে এই বৃষ্টি তাকে ধ'রে ফেলেছে মাঠের মধ্যে; একটু থামেনি সে, আশ্রয় খোঁজেনি, দ্রুত করেনি গতি; কোনো একটি ক্ষুদ্রতম অনিচ্ছার, এমনকি কোনো বিস্ময়ের ভঙ্গিতেও সেই নির্জন মিলনের গৌরবহানি করেনি; শুধু, যখন তার চুল বেয়ে জলের ধারা ঠোঁটে নেমেছে আর গায়ের জামাটা লেপটে গেছে পিঠের চামড়ায়, তখন শুধু ভিতরে-ভিতরে কেঁপেছে, বৃষ্টির প্রণয়প্লাবনের আনন্দে কেঁপেছে, অন্ধকারে হাওয়ার শীৎকারে শিউরে উঠেছে সমস্ত শরীরে। সেই

শিহরণ—যদিও বৃষ্টির আগে সব এখন স্তব্ধ, আর মৌলি ব'সে আছে ঘরের মধ্যে আরামচেয়ারে—সেই তীক্ষ্ণ হাওয়ার ঠাণ্ডা অথচ বুকের মধ্যে উষ্ণ-ক'রে-তোলা শিহরণ ক্ষণিকের জন্য অনুভব করলো মৌলি, যেন কোনো পাগল অভিসার, বিদ্যুতের মতো চমক দিলো তার শরীরে—তারপরেই মিলিয়ে গেলো, ফুরিয়ে গেলো। আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে আনলো সে, একবার তাকালো ঘরের চারদিকে, যেখানে সবই আরামদায়ক, সুব্যবস্থিত, তারই সুবিধের খাপে-খাপে সব বসানো—যেখানে কিছুই তাকে বাধা দেয় না, কোথাও কিছু প্রতিকূল নেই।

ডাকের চিঠি হাতে ক'রে তার মা ঘরে এলেন। এ-কয় বছরে একটু রোগা হয়েছেন ভদ্রমহিলা, বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে, চোখের তলাকার চামড়ায় সূক্ষ্ম রেখা পড়েছে যা আগে ছিলো না। মৌলি তাঁর দিকে না-তাকিয়েই চিঠিগুলি হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলো একবার—তার পাব্লিশার দাস লাইব্রেরির খাম, তার সাহিত্যিক বন্ধু বিদ্যুৎ সেনের ছাপার মতো হাতের লেখা, আরো দু-একটা যার প্রেরকের নাম আন্দাজ করা যায় না—না-খুলেই বেতের টেবিলে রেখে দিলো।

মা জিগেস করলেন, 'চিঠি পড়লি না?'

'পড়বো।'

মা একটু হবাক হ'য়ে ছেলের দিকে তাকালেন। আর সত্যিও, এই উদাসীনতা, টাটকা-পাওয়া বার্তা বিষয়ে এই নিঃস্পৃহ ভঙ্গি—এটা মৌলির পক্ষে অ-সাধারণ, ঠিক স্বাভাবিক নয়, যে তাকে একটুও চেনে তার চোখেই লক্ষণীয়। অভ্যাস তার একেবারেই উল্টো। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টাই তার সবচেয়ে ভালো

লাগে আজকাল, এই বিকেলবেলাটা, যখন সে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরেছে, যে-কাজের কোনো অর্থ নেই তার কাছে সেই কাজ সেদিনের মতো চুকিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, আর তার খানিক পরেই হাতে পেয়েছে সেদিনের ডাক—কলকাতার চিঠি, অন্য কত নাম-শোনা কি নাম-না-শোনা শহরের, যে-পৃথিবী অনেক বড়ো সেই পৃথিবীর স্পর্শ পেয়েছে, যখন সে মুক্তি পেয়েছে অন্য এক বৃহত্তর জগতে। সেটাই তার পক্ষে প্রথাগত, স্বভাবসিদ্ধ—অধীর হাতে খাম খোলা, প্রথম বার চোখটাকে শুধু দৌড়িয়ে এনে পরের বারে মন দিয়ে পড়া, তারপর সেদিনই সন্ধ্যায়, কিংবা শোবার আগে রাত্রে ব'সে জবাব লেখা—যাতে পরের দিনের ডাক ধরতে পারে, কেননা এই পদ্মা-পেরোনো শহরে সভ্য জগতের নিয়ম উল্টিয়ে চিঠিপত্র পৌঁছয় বিকেলে এবং যাত্রা করে পূর্বাহ্ণে। প্রায় সব চিঠিরই জবাব দেয় সে, অপরিচিত পাঠকেরও—অনেকেই তারা পাঠিকা—ইতিমধ্যেই খ্যাতির উপজাতক এ-সব চিঠিপত্র সে পাচ্ছে কিছু-কিছু—যে-চিঠিতে অমুক লেখা ভালো লেগেছে এ ছাড়া আর কথা নেই, তারও কোনো উত্তর না-দিলে তার শান্তি হয় না। যে-কোনো, যে-কোনো কিছু, যা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা জড়িত তার সত্যিকার কাজের, তার সত্যিকার জীবনের সঙ্গে, সেদিকে মন তাকে দিতেই হবে—কিছুই সেখানে তুচ্ছ নয়, ভানেরও মূল্য আছে সেখানে—সেখানে তার চরম মন তাকে দিতেই হবে, নয়তো তার অস্তিত্বটা আছে কেন।

সাধারণত এই রকমই মনে হয় তার—অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্তও, এই রকমই মনে হ'তো। কিন্তু সম্প্রতি মাঝে মাঝে এমন

হচ্ছে যে এই উৎসাহ, এই তাকে অন্ধ বেগে টেনে-নিয়ে-চলা প্রেরণা, তাতে হঠাৎ যেন গুমোট ক'রে আসে, আজকের এই মেঘে ঢাকা বেলার মতোই থমথমে, আলো নেই, হাওয়া নেই, কিন্তু বাঁধন-ছেঁড়া বর্ষণেরও যেন আশা নেই। এই তার অভ্যাসের আরাম, মা-র হাতের যত্নে রাখা, দৈনন্দিন জীবন, রীতিমতোই উল্লেখ্য এবং বহির্জগতে আলোচিত তার কৃতিত্ব—এ-সবের অন্তরালে, যেন পূর্ণস্বাস্থ্যে প্রচ্ছন্ন কোনো বীজাণু, সুস্থতার কান্তি নকল ক'রে লুকিয়ে-থাকা কোনো সূক্ষ্ম রোগ, এই তার সুখী এবং আত্মস্থ জীবনের অন্তরালে মৌলিকে কামড়ে আছে, তাকে কুঁড়ে খাচ্ছে—কী তার নাম দেবে সে জানে না—অতৃপ্তি? অশান্তি? ব্যর্থতাবোধ? সেটা যা-ই হোক সেটা আছে, কাজ ক'রে যাচ্ছে ভিতরে-ভিতরে, সেটা কখনো দেখা দেয় মিষ্টি-মিষ্টি কবিত্বময় মন-খারাপের চেহারা নিয়ে; তখন সে এমন কোনো বিষাদে-ভরা ব্যাকুল কবিতা লিখে ফেলে যার ফলে কলকাতার কোনো সম্পাদকের কিংবা এলাহাবাদের কোনো সিকতাকণার চিঠি চ'লে আসে তার কাছে,—আবার কখনো এ-সব অপরিচিতের অভিবাদনের ফলেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে মনে, আহত আত্মাভিমানের জ্বালা, যা চায় তা অত্যন্ত বেশি সহজে পেয়েই সে ঠ'কে গেলো, এই সন্দেহ ছোবল মারে তার মনের মধ্যে—তখন সে অবশ হ'য়ে যায়, অক্ষম, যেমন আজকের এই ঘনায়মান মেঘলা বিকেলে—একখানা চিঠি খুলতেও তার হাত ওঠে না তখন, শুধু শোনে, মনে-মনে, কানে-কানে শোনে, কোন-এক শব্দহীন অট্টহাসির উপহাস চুরমার ক'রে দিচ্ছে তার সাতাশ বছরের জীবনটাকে।

একটি বর্ষার সন্ধ্যা

সাতাশ বছর! এক-এক সময় শুধু এই চিন্তাই পাথর হ'য়ে চেপে ব'সে তার বুকের উপর, যে বয়স তার সাতাশ হ'লো। মাত্র সাতাশ, ইতিমধ্যেই সাতাশ, কী দারুণ বার্ধক্যের মতো, এই সাতাশ! জীবনের পূর্ণকাল কি ইতিমধ্যেই কাটায়নি সে? সমাপ্তির প্রান্তে এসে কি পৌঁছয়নি? অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে কি আসেনি—মানুষের মহিমা, মানুষের ইন্দ্রিয়-বন্দী অসহায় তুচ্ছতা, সব কি উপলব্ধি করেনি নিজের মধ্যে, জানেনি আনন্দ, হৃদয়প্লাবী আহ্লাদ—জানেনি তৃষ্ণা, বুক-ফাটা তৃষ্ণায় জলের দিকে ছুটে-ছুটে বালুর মধ্যে মুখ থুবড়ে জ্'লে মরা, তাও কি সে জানেনি? আরো যত বছর সামনে প'ড়ে আছে, আরো যত দীর্ঘ দিন তাকে বাঁচতে হবে এখনো—কী তারা দিতে পারে, কী নতুন আনতে পারে তারা, যা-কিছু হবে সবই কি আগে হ'য়ে যায়নি, যা-কিছু নতুন সবই কি পুরোনোর পুনরাবৃত্তি নয়? যখন ষোলো ছিলো, সতেরো ছিলো, উথালপাথাল উনিশ-কুড়ি ছিলো, তখন এই পঁচিশ-পেরোনো বছরগুলির দিকে কত আশার দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছে, কত উজ্জ্বল রঙে এঁকেছে তাদের—পরিণত, প্রস্তুত, যে-কোনো দিকের যে-কোনো হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন নয় আর, কোনো-এক অচঞ্চল-আলো-জ্বলা রুদ্ধ ঘরে নিবিষ্ট—আরম্ভের জন্য, এতদিনে আরম্ভের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কী হ'লো? কয়েকখানা বই লিখেছে সে, সে-সব বই ভালো বলছে লোকে; সে যা-কিছু লেখে তা-ই ছাপা হচ্ছে; নিন্দার দ্বারা, নিয়মিত, ক্রুদ্ধ, সুপরিচালিত নিন্দার দ্বারা তাকে সম্মান করছে কেউ-কেউ;—হঠাৎ তার কোনো-একটা লেখা, যা সে লিখেছিলো তার বিগত যৌবনে কখনো শুধু মন-খারাপের ভার নামাতে, কিংবা হঠাৎ খেলাচ্ছলে শুধুমাত্র ইচ্ছে করেছে ব'লেই—তা-ই নিয়ে কী দুশ্চিন্তা সেই সব প্রৌঢ়বয়স্ক

সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞজনের, মাসিকপত্রের গল্প পড়ার চাইতে আরো কিছু ভদ্রগোছের কাজেই যাঁদের ব্যস্ত থাকা উচিত। এই সব হয়েছে তার এরই মধ্যে : এতদিনেও কিছুই তার হয়নি।

'দেখিস, কোনোটা হারিয়ে না যায়।' মৌলির মা চিঠিগুলোর উপর বই চাপা দিলেন।

যেন ভালো দেখাবে ব'লেই, কিংবা মা-র কাছে মুখরক্ষার জন্য, মৌলি হাত বাড়িয়ে বিদ্যুৎ সেনের চিঠিটা তুলে নিলো, খাম খুলে প্রথম যেখানে চোখ পড়লো সেখানেই শুরু করলো পড়তে।...'মুশকিলে পড়েছি। উপন্যাসটা আরম্ভ করেছিলুম শীতকালে জসিডি থেকে ফিরে। পৌষ মাসের সাঁওতাল পরগণায় গল্পটা সাজিয়েছিলুম। মাঝে ক-মাস ফেলে রাখার পর এখন আবার লিখতে গিয়ে দেখি—কিছুতেই তো সুর মিলছে না। ঘোর বর্ষা এখন—রোজই কিছু বৃষ্টি হচ্ছে—আমাদের গলি সেদিন জল দাঁড়িয়ে খাল হ'য়ে গেলো। এর মধ্যে মাঠজোড়া কুয়াশা, ঘাসের পথে শিশির, আর রোদের দুপুরে কমলালেবু আর ফুলবাগানে প্রজাপতির ঝাঁক—এ-সব যেন খুঁজেই পাচ্ছি না মনের মধ্যে। তাই ভাবছি...' মৌলি আর পড়লো না, খামে ভ'রে পকেটে রাখলো ; পরে ভালো ক'রে পড়বে। আ—লেখা, লেখা! কী ক'রে লেখে মানুষে, জন্ম দেয়, সৃষ্টি করে! স্রষ্টা, ধাতা, বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী, ঐশ্বরিক আদিশক্তির অপহারক! কী ক'রে পারে? শিল্পীরা তীব্র ক'রে বাঁচেন, চরম ক'রে বাঁচেন—এ-কথাই মৌলি ভেবেছে এতদিন—বাঁচার পেয়ালা পূর্ণ হ'য়ে যা উপচে পড়ে সে-ই তাঁদের সৃষ্টি, শুধু বেঁচে থেকে বাঁচার ধার মেটে না তাঁদের—হাজার মানুষের সমান জীবন্ত কোনো শেক্সপিয়র, বিশাল কোনো বীণার মতো দুরন্ত কোনো

রবীন্দ্রনাথের। অর্থাৎ—মৌলি ভেবেছে এতদিন—অন্যান্য মানুষের চাইতে শিল্পীর প্রাণশক্তি, কামশক্তি অনেক বেশি প্রবল; বাঁচার কোনো পরদা-চড়ানো বৃহত্তর রূপেরই নাম শিল্পরচনা। কিন্তু তা-ই কি? শীতঋতুর কাব্যটি যে শুরু হ'য়েই ঠেকে গেলো, সে কি এই জন্যই নয় যে বিদ্যুৎ সেন যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পী এখনো হ'তে পারেনি? ঋতুর চপলতার ঊর্ধ্বে, আকাশ-বাতাসের মনোহরণ ছেলেখেলার ঊর্ধ্বে, স্থান, কাল, শরীর, শরীরের মধ্যে সীমিত এই জীবনেরও ঊর্ধ্বে কি উঠতে হবে না শিল্পীকে? বেঁচে থাকা, আর শিল্পী হওয়া, এ দুই কি একই সঙ্গে সম্ভব?

আর তুমি, মৌলিনাথ? মৌলি আবার বাইরে তাকালো, মৃদু একটু নিশ্বাস পড়লো তার। একটু আগে সব স্তব্ধ ছিলো, আর এখনই—জটিল কোন এঞ্জিনের রওনা হবার স্পন্দনের মতো—বটের পাতা একটু-একটু কাঁপছে।—না, না, তার কিছু হবে না: সে ভালোবাসে, সে লোভী, সে ভোগী। আকাশে মেঘ করলে তার মন-কেমন করে, আকাশে মেঘ জমলে সে কাজ ফেলে তাকিয়ে থাকে।

চোখ ফিরিয়ে এনে সে তার মা-কে একটা কথা বললো।

'শুনেছো, মা, বটগাছটা নাকি কাটিয়ে ফেলা হচ্ছে?'

মা ইতিমধ্যে তার টেবিল গোছাতে ব্যস্ত হয়েছিলেন, কাজ না-থামিয়ে বললেন, 'শুনছি তো!'

'পাড়ার কর্তারা লেখালেখি করছেন ম্যুনিসিপালিটিতে। বড্ড পাখি বসে, নোংরা করে।'

'সেদিন রাসবিহারীবাবুর বাড়ির ছাতে একটা শকুন—'

'শুনেছি। ভারি আস্পর্ধা শকুনটার—কমিশনারের পার্সন্যাল

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রাসবিহারী বাঁড়ুয্যে, তাঁর এই সেদিনমাত্র-শেষ-হওয়া মস্ত বড়ো বাড়ি—সেই বাড়ির ছাতে গিয়ে বসা! শাস্তি হওয়া উচিত।'

'শকুন বসলে অকল্যাণ হয় গৃহস্থের।'

'তা হ'লেও কিছু-একটা হয় তো!' বাঁকা হাসলো মৌলি, যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো।

মা-র চোখ—একটু ভৎর্সনা, একটু আশঙ্কা-মেশানো দৃষ্টি—চকিতে একবার ছুঁয়ে গেলো তাকে। মৌলি ফিরে তাকালো যেন লজ্জা-পাওয়া ছেলেমানুষি সরল চোখে, কিন্তু বাঁকা হাসির রেখাটুকু তার ঠোঁট থেকে মুছে গেলো না। একটু পরে বললো, 'তোমার মনে আছে, মা, সেই রাত ক'রে বাচ্চা শকুনের কান্না?'

'মনে নেই! নয়নেন্দুর মা-র নাকি ঘুম হ'তো না প্রথম-প্রথম!'

'কিন্তু ওরা তো আর নেই আজকাল। সেই ডাক কতদিন আর শুনি না। আমি ভাবি, ঐ শকুনটা এলো কোত্থেকে। কিংবা ফিরে এলো কেন। এর কি কোনো অর্থ নেই?'

'যত অদ্ভুত ভাবনা তোর! আর এত বই টেবিলে কেন জড়ো করিস বল তো?'

'ঐ বটগাছেই বাসা বেঁধেছে আবার? ঠিক জানো?'

'তা-ই তো শুনছি। এই প্রুফগুলো পুরোনো নাকি ত্থাখ। ফেলে দেবো?'

গুমরে নিচু গলায় আকাশ ভ'রে ডেকে উঠলো মেঘ, যেন আহত কোনো বিশাল বাঘের দূর-থেকে-শোনা গর্জন। মৌলির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, যেন হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে কোনো আনন্দ, কোনো সুন্দর সমাধান। আস্তে-আস্তে বললো, 'খুব ভালো হয় মা, খুব ভালো হয়,

যদি আজই, এখনই, হঠাৎ বাজ প'ড়ে বটগাছটা ম'রে যায়! এক মুহূর্তে ঝলসে পুড়ে ম'রে যাক গাছটা, তারপর আমি, আমিও—' হঠাৎ থেমে গেলো মৌলি, যেন ভিতর থেকে বাধা পেলো কথায়, তার মুখের আলো মিলিয়ে গিয়ে কেমন করুণ দেখালো, কেমন কান্না-পাওয়া আখুটে গলায় কথা শেষ করলো সে—'এখানে আর এক মুহূর্ত আমার থাকতে ইচ্ছে করে না।'

'তোর লেখার খাতা বাঁ দিকে থাকলো, আর চিঠির প্যাড সব ডান দিকে। খামগুলো দেরাজে রাখলাম।' টেবিল গোছানো শেষ ক'রে মা একটু কাছে এসে দাঁড়ালেন, প্রায় একই সুরে বললেন, 'তা আমি তো কবে থেকেই বলছি কলকাতায় চল। তুই চেষ্টা করলে ওখানে কি আর সুবিধে না হবে।'

'সুবিধে?' মৌলির ঠোঁটের কোণ আবার একটু বেঁকে গেলো। 'হ্যাঁ, সুবিধে হবে। চাকরি হবে।'

'কিন্তু প্রোফেসরি তো ভালোই। কত সম্মান, কত ছুটি।'

'ভালো! ভালো!' কথার তালে-তালে মৌলি টোকা দিলো চেয়ারের হাতলে, আর কিছু বললো না। তার বাঁ-দিকে সিঁথি-করা ঘন-চুলে-ভরা মাথাটি নিচু হ'লো, যেন নুয়ে পড়লো কোনো লুকিয়ে-রাখা ভুলতে-না-পারা লজ্জায়। না, কখনো ভুলতে পারে না সে, ঠ'কে গেছে—না কি ঠকিয়েছে?—কথা দিয়ে কথা রাখেনি, প্রতারক সে, জোচ্চোর! যা কখনো ভাবেনি তা-ই হ'লো: সেই মাস্টারি করছে। প্রবঞ্চনা তার নিজের সঙ্গে, প্রবঞ্চনা তার অন্যদের সঙ্গে; ছাত্ররা যা চায় তা পায় না তার কাছে; আর ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ, তারই সুবান্ধব অধ্যাপকেরা, এই কয়েক বছর আগেও তার গুণপনায় যাঁরা মুগ্ধ ছিলেন,

তাঁরাও—যদিও বাইরে তাঁরা উৎসাহী এবং সহৃদয়, তবু মৌলি তো বোঝে, এও বোঝে এতে তাঁদের অন্যায় কিছু নেই—তাঁরাও আজকাল আড়চোখে দেখছেন তাকে, মনে-মনে কিংবা নিজেদের মধ্যে বলছেন যে মৌলিনাথের কাছে এর বেশি কি প্রত্যাশা আমাদের ছিলো না? সে ছিলো অদ্বিতীয় ছাত্র, সর্বত্র অবাধ যার অধিকার, হয়েছে কনিষ্ঠতম শিক্ষক, সহনীয়, লক্ষ্যণীয়, স্নেহভাজন—মাত্র একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লেকচারার! এই পতন কেমন ক'রে সে সহ্য করছে!

'কেন, তোর ভালো লাগে না?'

মা-র এই কথায় মৌলি মুখ তুললো। 'এই মাস্টারি?' ব'লে নিচু গলায় হাসলো একটু, আরাম ক'রে হেলান দিলো চেয়ারে। 'ও-সব ছেড়ে দাও, মা, আমার কিছু হ'লো না এটা জেনে নাও।'

'কিছু হ'লো না বুঝি?' একটি মোলায়েম হাসি ছড়িয়ে পড়লো মা-র মুখে, মোড়া টেনে মুখোমুখি তিনি বসলেন, যেন বিষয়টা বুঝিয়ে না-দিয়ে ছাড়বেন না। 'তাই বুঝি পাশ করার সঙ্গে-সঙ্গেই ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছে? আর তাই বুঝি এটুকু বয়সেই সারা দেশে তোর নাম?'

এটুকু বয়স! সারা দেশে নাম! কত বেশি আমার বয়স, আর কত তুচ্ছ এই নাম তা তুমি কখনো জানবে না, মা! মৌলির মনে পড়লো সেই সব স্বপ্নে-চালানো দিনের কথা, যখন সত্যি তার বয়স ছিলো অল্প, সত্যি সে ছেলেমানুষ ছিলো। সুখ ছিলো তখন, সেই নিজেকে দিয়েই ঘেরাও-করা গণ্ডির মধ্যে সুখ ছিলো—কী দুর্ভাগ্য মানুষের যে কূপমণ্ডূকের আত্মপ্রসাদ ছাড়া সুখ নেই তার জীবনে! সুখ ছিলো, যখন দশ বছর বয়সে অ্যালাস্টর তর্জমা করেছিলো, যখন ম্যাট্রিকুলেশনে এমন খাতা লিখেছিলো যে পাদ্রি পরীক্ষক ভেবে পাননি ছেলেটি

একটি বর্ষার সন্ধ্যা

জিনিয়স না বদ্ধ পাগল, যখন তার সতেরো বছর বয়সের কোনো-এক আলস্যময় দুপুর-কাটানো কবিতায় বাংলা কবিতার মোড় ফিরেছিলো, যখন সে ছিলো সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, তার তুল্য আর-কেউ ছিলো না, যখন লোকেরা প্রায় ভেবেই পেতো না শেষ পর্যন্ত কোনখানে সে পৌঁছবে। সেই বদ্ধতায়, সেই অন্ধতায়—তাতেই শুধু সুখ ছিলো। আর এখন ?···নাম ? খ্যাতি ? কী তুচ্ছ, কী গ্লানিকর সেই খ্যাতি, যা অন্য পাঁচজনের সঙ্গে সমান ভাগ ক'রে নিতে হয় ; কী লজ্জার সেই প্রশংসা শোনা যাতে লোকে ভালোই বলে কিন্তু এ-কথা কেউ বলে না যে এমন আর হয় না ! এর উপরে ওঠা, তুলনার উপরে ওঠা, অনন্য হওয়া ! শুধু আপন মনে প্রত্যয় নয়, জগতের সামনে প্রমাণ করতে পারা যে কেউ তার সমকক্ষ নয়, সন্নিকটও নয়, সকল প্রতিযোগিতার সে পরপারে ! গ্যেটে ! রবীন্দ্রনাথ ! কপট কৃষ্ণের অন্যায় সাহায্যে স্বভাবজয়ী অর্জুন !·· না, না, সে নয়, সে তো নয় ; মহাপ্রস্থানের পথে বিশ্বজয়ী মুখ থুবড়ে সে পড়বে না, সে মরবে তার আপন মনের প্রত্যয়ের পাঁকে, তার ইচ্ছায়, তার শক্তিহীন, দুর্বার ইচ্ছায় কর্ণের মতো রথের চাকা ডুবে-ডুবে।···এই তো—এখনই—অতীতের কথা ভাবছে সে, যাত্রা শুরু হ'তে-না-হ'তেই পিছন ফিরে তাকাচ্ছে—বুড়ো হয়েছে, অকালেই বুড়ো হয়েছে।···তাহ'লে ইচ্ছাটাকেই ছেঁটে দিলে কেমন হয় ? ভদ্রলোক হ'য়ে জীবন কাটাবার যে-প্রলোভন নিত্য উপস্থিত, তারই কাছে হার মানলে কেমন হয় ?

'হাঁ, খুব হয়েছে আমার। আর ক-দিন পরেই পুরানা পল্টনের একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক হ'য়ে বসতে পারবো।'

ছেলের দিকে চুপ ক'রে একটু তাকিয়ে থাকলেন মা। তারপর

বললেন, 'তোর যা ভালো লাগে না তা তুই করিস কেন, মৌলি। চাকরি ছেড়ে দে, চল কলকাতায়।'

'চাকরি ছাড়তে পারি, কিন্তু তোমাকে ছাড়বো কেমন ক'রে? তুমি না-থাকলে এতদিনে আমি এ-দেশেই থাকতাম না।'

ছোট্ট নিশ্বাস পড়লো ম-র। এই বিধবা ভদ্রমহিলা, একটির বেশি সন্তান যিনি ধারণ করেননি, এই ছেলে যাঁর জীবনের লক্ষ্য, জীবনের অর্থ, সর্বস্ব, তার সব ইচ্ছা মেটাতে গিয়ে নিজের সব সম্বল যিনি খুইয়েছেন, কত রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে-মনে শুধু এই বলেছেন যে মৌলি যেন বেঁচে থাকে, আর কখনো-কখনো ভয়ে যাঁর বুক শুকিয়ে গেছে পাছে মৌলির এই অসামান্যতাই তাঁর অদৃষ্টে সহ্য না হয়—ছেলেব এই কথায় তাঁর নিশ্বাস পড়লো। কিন্তু তার দোষ কী? কোন কথায় ব্যথা লাগে সে তো জানে না, জানলে কি বলতো? না, মৌলির কিছু দোষ নয়; দোষ তাঁরই, মা-র—এ তো সত্যি কথাই যে মৌলি তাঁকে ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে এতদূর পর্যন্ত যেখানে তাঁর অস্তিত্বটাই এখন—এখন অবান্তর, শুধু অবান্তর নয়, অন্তরায়—হ্যাঁ, অন্তরায় বইকি, তার আরো বেড়ে ওঠার প্রতিবন্ধক। এই অদ্ভুত, এই-যে আশ্চর্য মানুষটিকে তিনি পৃথিবীতে এনেছিলেন, আজ এর কতটুকু বোঝেন তিনি, কতটুকু জানেন এর কথা? তার এ-সব ভাবভঙ্গি, এই এক-এক সময় মন-গুমরে ব'সে থাকা, যখন সে কথা বলে না; কিংবা শুধু দুঃখ-পাওয়া—কখনো বা দুঃখ-দেয়া—বাঁকা সুরে কথা বলে—এ-সব অবশ্য খুবই ভালো চেনা আছে তাঁর, এর চেহারাটা তিনি ভালোই চেনেন, বাইরে থেকে অনেক দেখেছেন, কিন্তু সত্যি এর অর্থ তো কিছুই বোঝেন না, কিছুই জানেন না কী ভাবছে সে আপন মনে, কোনো কাজেই লাগতে পারেন না

তার, তার হতাশ হ'য়ে ব'সে থাকার দিকে কোনো রকমেই হাত বাড়াতে পারেন না। এখন তার প্রয়োজন—অনেক দিন ধ'রেই তিনি ভাবছেন কথাটা, ছেলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগও খুঁজছেন—মা-র প্রয়োজন তার নেই আর—এখন অন্য কাউকে চাই যে সত্যি তার জীবনের অংশ নিতে পারবে, সঙ্গিনী, সহানুভাবিনী, স্ত্রী। যোগ্য মেয়ে? কত দয়া ভগবানের যে ঠিক যোগ্য মেয়েটি তৈরি হয়েছে তারই জন্য, দিনে-দিনে তৈরি ক'রে তুলেছে নিজেকে, উৎসর্গ করেছে এখনই তাকে নিজের জীবন! কেন ওরা দেরি করছে আর? মিলুক ওরা, দু-জনে মিলে বিলেত চ'লে যাক, দু-জনে দু-জনের জোরে বড়ো হ'য়ে উঠুক—আমি, শুধুমাত্র মা, শুধুমাত্র শৈশবের অধিকারিণী, এর বেশি অন্য কোনো স্বর্গসুখ আমি চাই না।

'তা ভাবনা কী,' মনের কথার অর্ধেক শুধু প্রকাশ করলেন তিনি। 'আমি তোকে বিলেত পাঠাতে পারলাম না, কিন্তু তুই নিজেই যেতে পারবি একদিন। এখানকার ইউনিভার্সিটি থেকেই পাঠাবে তোকে।'

মৌলি জবাব দিলো না কথার। আ, এও কি কপালে আছে তার? কোনোদিন তাদেরও একজন কি হ'তে হবে তাকে, যারা ঋণের কৃপণ অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে, লণ্ডন শহরে চোখ-কান বুজে দু-বছর কাটিয়ে, কোনোরকমে একটা ডিগ্রি কুড়িয়ে দেশে ফেরে—তারপর একশো মুদ্রা বেশি মূল্যের চাকরির চেষ্টায় মরীয়া হ'য়ে রক্ত তোলে মুখে? বিলেতের বুড়ি ছুঁয়ে এসে সাংসারিক উন্নতি! অন্তত এটুকু কোরো, ভগবান, সেখানে আমাকে নামিয়ো না। সে যদি যায়—সে যে অনেক দিনের, অনেক দূরের যাত্রা! তাকে যে সব দেখতে হবে—ইটালির রেনেসাঁস-নীলিমা, এল গ্রেকোর আলো-আঁধারি-স্বপ্ন-জড়ানো স্প্যানিশ রাত্রি,

ঐতিহাসিক স্বপ্নভারাতুর জর্মন নগর, ইস্পাত-নীল ধারালো পরিচ্ছন্ন উত্তরাপথ—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, পুরাণভূমি আইসল্যাণ্ড—আর রাশিয়া, ধ্যানে এবং তুষারে ধবল টলস্টয়ের রাশিয়া—সব যে চাই তার, সব যে চায় তাকে, কোনোটাই ছেড়ে গেলে তার চলবে না।—কেন সে লক্ষপতি হ'লো না? কিন্তু তাহ'লেই বা কী হ'তো? এই ইওরোপ, এই তার বইয়ে-পড়া মনের মধ্যে পাওয়া ইওরোপ, একে ভ্রমণ ক'রে এর বেশি কি পাবে কখনো;—তাতে কি শুধু ভিড় দেখবে না, নেহাৎই শুধু মানুষের মুখ—হোটেল, বাজার, গির্জে, গ্যালারি, নয়তো শুধু দৃশ্য, জল-মাটি-আকাশ-মেশানো আপাতনতুন কিন্তু আসলে সেই একই চেনা রমণীয়তা—শুধু অবয়ব, শুধু অনুষ্ঠান;—একে এর বেশি পেতে হ'লে, প্রাণ দিয়ে পেতে হ'লে, সেখানেই কি জন্মাতে হয় না—আর নয়তো, নয়তো সেই মনের মধ্যেই যতটা তার পাওয়া যায়, চিন্তার মানচিত্রে যতটা তার ধরা যায়, নিজের বাড়িতে নিশ্চল ব'সে-ব'সে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, যখন—আর দেরি নেই, ঐ বুঝি উড়াল দিলো আষাঢ়, ঝাঁপ দিলো বৃষ্টি, সারা আকাশ বাংলা ভাষায় কথা ক'য়ে উঠলো।

২

বাইরের দিকে চোখ রেখেই মৌলি বললো, 'না, মা, এই বাংলা দেশই সবচেয়ে ভালো আমার। এমন বর্ষা তো আর কোথায় নেই।'

কিন্তু তার কথা শোনা গেলো না, শোনা গেলো তারই কথার যথাযোগ্য উত্তর, যার সামনে, যার বিশাল বাঁশির মতো নিঃস্বনে, তুচ্ছ হ'য়ে মিলিয়ে গেলো মৌলিনাথের বিক্ষোভে ভরা স্বগতোক্তি। মেঘের

নিগড়ে বন্দী হ'য়ে যে ছিলো এতক্ষণ, সে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ছুটে এলো, বেরিয়ে এলো স্তব্ধতার বুক ফেটে হাওয়া—ঠাণ্ডা, উদ্দাম—চকিত কাকের কর্কশ ডাক শাঁকের মতো বেজে উঠলো, বটগাছের জটিল দেহটি দুলে উঠলো যেন নম্বুদ্রির মতো নাচের ভঙ্গিতে—কিন্তু তার পরেই গাছটি আর দেখা গেলো না, ধুলোর ঝড়ে আঁধার হ'লো প্রান্তর, ধুলো-কুটো-কাঁকর-ওড়ানো দামাল হাওয়া খেপিয়ে দিলো এইমাত্র গোছানো টেবিলের কাগজপত্র।

মৌলির মা তাড়াতাড়ি উঠলেন জানলার শার্সি লাগাতে। অনেক-গুলো জানলা; একে-একে বন্ধ করতে-করতেও কিছু কাগজ উড়ে পড়লো মেঝেতে, ধুলো লাগলো জিনিশপত্রে, মৌলির চুলে। মৌলি নড়লো না, মা-কে সাহায্য করতেও উঠলো না; আর মা যখন শেষ জানলাটির শার্সি লাগিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক তখনই মুহূর্তের জন্য আলো হ'য়ে উঠলো প্রান্তর; ভূতুড়ে, অদ্ভুত, গা-ছমছম-করা সান্ধ্য বিদ্যুতের নীল-সবুজ-সোনালি-শাদা পাগল আলোয় অস্থির বটগাছটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো আবার, তারপর ভীষণ শব্দে বাজ পড়লো যেন আকাশটাকে চুরমার ক'রে ফাটিয়ে দিয়ে। আর মেঘের দূর গহ্বরে-গহ্বরে তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই রিমঝিম মধুর শব্দে বৃষ্টি যেই ঝাঁপিয়ে নামলো, অমনি দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ঘরে এলো একটি মেয়ে, ঘন-নীল পরদাটাকে পিছনে রেখে দরজার ধারে দাঁড়ালো।

—'উঃ, খুব বেঁচে গেছি!'

কথাটা হালকা হ'য়ে খ'সে পড়লো মেয়েটির মুখ থেকে, যেমন ডাল থেকে ফুল ঝ'রে পড়ে, শার্সি-বন্ধ-করা ঘরের হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লো তার সৌরভ, অনুরণন; এই ঘরে, যেখানে এতক্ষণ ধ'রে সব

ছিলো গম্ভীর, চিন্তায় এবং আষাঢ়ে ভারাতুর, সাতাশ বছরের বাধক্য-বোধে আচ্ছন্ন, আত্মচেতনার কুয়োর মধ্যে খুঁড়ে-খুঁড়ে তন্ন-তন্ন তল্লাশের শ্রমে প্রপীড়িত—সেখানে হঠাৎ যেন আলোর জগতের ডাক এলো এই কথায়—এই প্রায় অশরীরী কথায়—কেননা মেঘের ছায়ায় কালো-হ'য়ে-আসা ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে ভালো দেখা যাচ্ছিলো না—এলো বাস্তবের, স্বাস্থ্যের ডাক, জীবনের, যৌবনের লজ্জাহীন চপল আহ্বান।

এই ডাকে প্রথম সাড়া দিলেন মা। 'গীতা!' স্পষ্ট শোনা গেলো আনন্দের কাঁপন তাঁর গলায়, যেন এই নামটুকু ধ'রে ডাকতেও তাঁর সুখ। দেয়ালে হাত রেখে আলো জ্বাললেন তিনি। বাইরে বৃষ্টি-ভরা সন্ধ্যার পটভূমিতে ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিক আলো অত্যন্ত বেশি উজ্জ্বল দেখালো, কেমন কড়া, কাঁচা, নিজেকে-যেন-জাহির-করা হলদে ;—মৌলি হাত তুলে চোখ আড়াল করলো, এতক্ষণ নম্র ছায়ায় মিশে থাকার পর হঠাৎ এই আলোর ঔদ্ধত্য তার ভালো লাগলো না। তবু সে একবার না-তাকিয়েও পারলো না, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা অতিথির দিকে একটুখানি তাকিয়েও তাকে থাকতে হ'লো—ব'সে-ব'সে দেখতে হ'লো মেয়েটিকে—আলোয় উদ্ভাসিত, যেন বিকশিত—ঘন-নীল পরদাটি পিছনে থাকায় যার ধবধবে রং প্রায় অন্যায়রকম ফর্শা দেখাচ্ছে, যার চুলে, কপালে, যেন তুলি-দিয়ে আঁকা পরিষ্কার দুটি ভুরুর উপর একটু বিসদৃশ-রকম চওড়া কপালে মুক্তোর মতো চিকচিক করছে জলের ফোঁটা, আর যার বুকের কাছে শাড়ির আঁচলে কয়েকটি বৃষ্টিফোঁটা এঁকে দিয়েছে দিয়েছে তাদের ক্ষণকালীন কালো-কালো প্রণয়স্বাক্ষর। মেয়েটি অনুভব করলো সেই দৃষ্টি—অনুভব করলো তার রক্তের ঈষদুষ্ণ চঞ্চলতায়, যা ছড়িয়ে পড়ে তার শরীরের মধ্যে গোপনে-গোপনে, যখন ইউনিভার্সিটির

ক্লাশে, ব্রাউনিঙের সঙ্গে এজরা পাউণ্ড এবং আধুনিক কবিতার সম্বন্ধ বোঝাতে গিয়ে, কিংবা কবিতায়—সাহিত্যে—উপমাপ্রয়োগের অপরিহার্য উপকারিতার বিষয়ে বলতে-বলতে, মৌলিনাথের চোখ হঠাৎ পড়ে তার মুখের উপর, আর তারপর—অন্যেরা যতক্ষণে অধ্যাপকের বক্তব্যের পিছনে ছুটেছে, কিংবা কেউ হয়তো নিঃস্পৃহভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে—সে শুধু শোনে, মনে-মনে, ভয়ে-ভয়ে শোনে, তার হৃৎপিণ্ডের ঈষৎ-দ্রুত-হওয়া স্পন্দন। এই সব—হ্যাঁ, এতটাই তার ভিতরে-ভিতরে ঘ'টে যায়—যদিও গীতা জানে—জেনে মনে-মনে কোথায় যেন শান্তিও পায়—যে মৌলিনাথের ঐ দৃষ্টির লক্ষ্য সে নয়, কোনো-এক দিকে তাকাতে হবে ব'লেই সে তাকিয়েছে তার দিকে ;—আর এখনো—যদিও মৌলিনাথেরই দরজায় সে দাঁড়িয়েছে—তবু সে জানে যে ঐ চোখ তাকে ঠিক দেখছে না, যে-কোনো একটা বস্তুকেই, হয়তো—কী লজ্জা! —চোখের পক্ষে প্রীতিকর কোনো বস্তুকেই শুধু দেখছে। তাই গীতা সেই দৃষ্টির কোনো জবাব দিলো না, ঘুরে দাঁড়ালো মৌলির মা-র মুখোমুখি, যিনি মাতৃত্বময় হাসিমুখে তাকেই দেখছিলেন, বিশেষ একটু মন দিয়েই দেখছিলেন যেন।

এগিয়ে এসে তার মাথায় তিনি হাত রাখলেন। 'ভিজিসনি তো?'

'না, মাসিমা, আমিও ঢুকছি আর বৃষ্টিও নামলো।' বাঁ হাতে কপালের জল মুছে ফেলে গীতা একটু হাসলো, তার পুষ্ট, পূর্ণ ঠোঁটের ফাঁকে সুন্দর শাদা দাঁতের সারি ঝিলিক দিলো ইলেকট্রিকের আলোয়। 'মেয়েদের হস্টেলে পার্টি ছিলো, সেখান থেকে বেরিয়ে ভাবলাম—'

'বেশ করেছিস। বোস।' বিধবা মহিলা আর কিছু বললেন না, কিন্তু চোখ দিয়ে যেন আরো কিছু বললেন, যেন প্রায় ব'লেই

দিলেন যে একটু আগে তারই কথা ভাবছিলেন তিনি, যে তাঁর আজকালকার সব ভাবনার মধ্যে গীতার কথাই ফিরে-ফিরে আসে বার-বার।

গীতা কি বুঝলো সে-কথা? তার মাসিমার মনের কথা সে কি বুঝেছে? এও কি বোঝেনি যে তার কথাও মাসিমার কাছে লুকোনো নেই, যে সে ধরা প'ড়ে গেছে সমস্ত রকম ছদ্মবেশের অতীত হ'য়ে? কিন্তু ধরা না-প'ড়ে পালাবে কোথায়? না-বুঝে কি উপায় আছে? কে না বুঝবে, কে না দেখতে পাবে তার ভিতরটাকে—নিজের বুকের শব্দ শুনতে শুনতে গীতার এক-এক সময় মনে হয়—ক্লাশের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী, ইউনিভার্সিটির অন্যান্য অধ্যাপকেরা, সারা রমনা, সারা শহর, যে-পথ দিয়ে সে হেঁটে যায় সেই পথের অন্য সব অচেনা মানুষ—কখনো তার এমনও মনে হয় যেন সকলেই তাকে বুঝে ফেলছে, দেখে ফেলছে—যেন সে স্বচ্ছ হ'য়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে রৌদ্রময় চৌরাস্তায়—আর এখানে তো মা! চোখ নামিয়ে নিক, দ্রুত পথ চলুক, আঁচল আরো ঘন ক'রে গায়ে জড়াক—না, সে-রকম চঞ্চল-হওয়া সময়ে কারো কাছেই নিস্তার নেই তার—শুধু ঐ একজন ছাড়া, ঐ অন্ধ, অবোধ, করুণাময়, হৃদয়হীন মৌলিনাথ ছাড়া! কথাটা ভাবতে মুচড়ে ওঠে তার বুকের মধ্যে, আবার কোথাও যেন আশ্বাসও পায়।

প্রৌঢ়া মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে গীতা অস্ফুট নিশ্বাস ফেললো। আমরা দু-জন ষড়যন্ত্রী, চোখে-চোখে চক্রান্তকারী আমরা। আমি তা হ'তে চাই না, কিন্তু না-হ'য়ে আমার উপায় নেই। আমি এখানে আসতে চাই না, এলে টি*কতে পারি না—কিন্তু না-এসেও টি*কতে পারি না। মাসিমা কি এতটাও জানেন? গীতা একটু চোখ সরিয়ে নিলো, যেন

কোনো ছল ক'রে তার এই প্রশ্নেরই উত্তরের আশায় জিগেস করলো, 'কেমন আছেন, মাসিমা?'

'আমি? আমি আবার কেমন থাকবো? ভালো আছি।'

'আপনার হাঁপানি?'

'ও কিছু না।'

'ভালো একজন ডাক্তার দেখান না কেন, মাসিমা?'

'বলতে চাস যে-ডাক্তার দেখিয়েছি সে ভালো নয়?'

'হোমিওপ্যাথিতে আপনার মতো বিশ্বাস তো থাকে না সকলের। দাদা এবার ছুটিতে এসে বলছিলো—'

'ও, বেণু! মস্ত ডাক্তার হয়েছে সে!'

'এই রকমই হয় মাসিমা। যারা ছোটো ছিলো তারা বড়ো হয়—তা আপনারা মানুন আর না-ই মানুন।'

'বাসবে! না-মেনে উপায় আছে! বিজ্ঞের মতো কত কথা আমাকে শুনিয়ে গেলো একদিন।'

'দাদা বলছিলো নতুন কী-একটা ইনজেকশন বেরিয়েছে—'

'সে-সব আমার জানতে বাকি নেই! তা আমি বলি, আমাদের নতুন ডাক্তারটিও পাশ ক'রে বেরোক, তখনই হবে সব।' ব'লে, একটু হেসে, ভদ্রমহিলা দরজার দিকে স'রে এলেন, কিন্তু গীতা তখনই আবার কথা পাড়লো, মাসিমার ঐ অনতি-আলোচ্য অসুস্থতার প্রসঙ্গটাকেই অবলম্বন ক'রে আরো একটু ধ'রে রাখলো তাঁকে—'আপনার হাঁপানির কথা আগে তো শুনিনি কখনো?'

'আমিও প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম রে। কিন্তু এই ছাখ না, আমার ছেলেবেলার সঙ্গীটি ঠিক সময়ে দেখা দিয়েছে আবার।'

'ঠিক সময়ে কেন ?'

'ঝাঁটপাট দিয়ে রাস্তাটি তো পরিষ্কার ক'রে রাখতে হবে।'

'ওঃ, খুব বুড়োদের মতো কথা বলছেন আজকাল!' ঠাট্টার সুরে, কিন্তু বেদনা-ছোঁয়া নরম গলায় গীতা একটু হাসলো। 'তাহ'লে কি মিটফোর্ডের নরেন গাঙ্গুলিকেই নিয়ে আসবো একদিন ?'

'বলিস কী গীতা, বেণুর প্রথম রোগী হাতছাড়া হ'তে দিবি তুই ? অমন কথা মুখেও আনিসনে। ও তাহ'লে মনে করবে কী বল তো! এমনিই এবার ইনজেকশন দিতে না-পেরে মনের দুঃখে ছুটি থাকতেই চ'লে গেলো। তারপর—কেমন আছে ? চিঠিপত্র পাস ?'

'মা-কে লেখে মাঝে-মাঝে। খুব কম।'

'তা এটা কি আর মা-মাসিকে মনে পড়ার বয়স! তুই-ই বা ক-দিন আসিস বল তো ?' ব'লেই, গীতার মুখের একটুখানি রং-বদল লক্ষ্য ক'রেই, তার জবাবের জন্য অপেক্ষা না-ক'রে—কিংবা তাকে জবাব দেবার কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে—ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'এ-বিষয়ে চিত্রা কিন্তু খুব ভালো!'

'দিদি ?' হঠাৎ গীতা একটু লাল হ'লো, একটু নিচু গলায়, কেমন-যেন বিষণ্ণভাবে বললো, 'তার সঙ্গে কার তুলনা ? এমন সপ্তাহ যায় না যে দিদির চিঠি না আসে।'

'প্রথম-প্রথম আমাকেও লিখতো খুব। কিন্তু আমি কি পারি চিঠি লেখায় ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে ?'

বিষাদের ছায়া ঘন হ'লো গীতার মুখে, তার চোখের কোণ দুটি, যেখানে নীল ছায়া জ'মে থাকে সব সময়, সেখানে যেন কালো ক'রে এলো মুহূর্তের জন্য। সে-সব চিঠি—গীতা দেখেছে, মাসিমা

একদিন দেখিয়েছিলেন তাকে—সকলের সব চিঠি তোলা থাকে তাঁর হাতবাক্সে—সে-সব স্মৃতিভরা, হৃদয়-ঢালা, কখনো প্রায় কান্না-পাওয়া উচ্ছ্বাস—সে-সব কি এই প্রৌঢ়া মহিলারই উদ্দেশে লেখা, আসলে কি অন্য একজনকেই লেখা নয়? সে কি দেখেছে সে-সব? পড়েছে কখনো? আর সে—সেই অন্য একজন—সে নিজেও কোনো চিঠিপত্র কি পায়নি কোনোদিন, চিঠি লেখায় হারিয়ে দেয়নি সেই দিদিকে, যে কাশ্মির থেকে বারো পৃষ্ঠা বর্ণনা লিখে পাঠিয়েছিলো?

'জানেন, মাসিমা,' হঠাৎ একটু উৎসাহিত গলায় গীতা বললো, 'দিদি এবার কাশ্মির বেড়াতে গিয়েছিলো, গুলমার্গ থেকে আঠারো পৃষ্ঠা চিঠি লিখেছিলো আমাকে!'

'বারো'টা 'আঠারো' হ'য়ে গেলো তার মুখে—নিজের অজান্তে নয়—তথ্যের এই অপলাপটুকু তার বিবেকে সহ্য হ'লো সহজেই, কথার শেষে বিস্ময়-চিহ্নটিও স্পষ্ট আওয়াজ দিলো গলায়। কিন্তু মাসিমার হাসিমুখে স্নেহপ্রসূত প্রশংসার প্রশ্রয় ছাড়া কিছুই ফুটলো না।

'তাই তো বলি আমি, যে পারে সে সবই পারে। সংসার চালানো, ছেলেপুলে মানুষ করা, তার উপর আবার মেয়েদের কলেজে প্রোফেসরিও করছিলো না?'

'শুধু কি তা-ই? সেবারে দিল্লিতে দিদির বাড়িতে এক মাস থেকে এলুম তো—দিদি একেবারে দশভুজা! মহেন্দ্রবাবুর পরীক্ষার খাতা দেখে দেয় দিদি, ক্লাশে ছাত্রদের তিনি যে-নোট দেন তাও তৈরি ক'রে দেয় মাঝে-মাঝে—এদিকে রোজ রাত্রে মহেন্দ্রবাবু একটা স্যুপ খান, সেটা দিদি নিজের হাতে না-রাঁধলে নাকি চলে না!' যেন বলতে

বেশ লাগছে, বলতে পেরে তৃপ্ত হচ্ছে নিজের মনে, যেন মনের মধ্যে কোথায় কোন অন্যায় সুখের স্বাদ নিচ্ছে, এমনি ক'রে কথাগুলি বললো গীতা, তারপর পুষ্ট ঠোঁটে সুন্দর কিন্তু কুটিল একটু হেসে বললো, 'একেবারে লক্ষ্মী মেয়ে, কী বলেন?'

প্রৌঢ়া মহিলা সকৌতুকে এই বর্ণনা শুনছিলেন, গীতা থামামাত্র জবাব দিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, অত জাঁক করতে হবে না দিদিকে নিয়ে। আমাদের এখানেও লক্ষ্মী মেয়ে আছেন একজন—সরস্বতীও বলতে পারিস। আপাতত একটু বসুন তিনি—আমি দেখে আসি রাখু ওদিকে কী করছে,' ব'লেই নীল পরদায় ঠেলা দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন—গীতাকে আর কথা বলার, বাধা দেবার সময় দিলেন না।

মুহূর্তের জন্য গীতা দাঁড়িয়ে থাকলো সেখানেই, কাঁপতে-থাকা পরদাটার উপর চোখ রেখে। মুহূর্তের জন্য তাকে দেখালো যেন সেও চ'লে যাবে ঘর থেকে, মাসিমার পিছু-পিছু গিয়ে হয়তো বসবে জলপাইয়ের আচার চাখতে, কিংবা হয়তো রান্নাঘরে তাঁর পাশে ব'সে হাত পাকাবে নিমকি ভাজায়। কিন্তু না—আর হয় না। যে-মুহূর্তে মাসিমা চ'লে গেলেন, যে-মুহূর্তে তার আঁকড়ে-থাকা ক্ষীণ ছুতোটুকু ছিঁড়ে গেলো, সে-মুহূর্তে আর-কিছুই গীতার চেতনায় থাকলো না, ওপাশের ঐ জানলার ধারে ইজিচেয়ারে ব'সে-থাকা মানুষটির অস্তিত্বই আবার তার সমস্ত মন জুড়ে বসলো। আর, মাসিমার সঙ্গে তার এই কথাবার্তা, তার এই নিজেকে লুকোতে সচেষ্ট কিন্তু অকৃতকার্য কথাবার্তা শেষ হওয়ামাত্র ঘরের আবহাওয়াও বদলে গেলো একেবারে; কাচের শার্সিতে প্রতিহত হ'য়ে বাইরের অঝোর বৃষ্টি কানে লাগলো—মনে লাগলো—অতি মৃদু স্পর্শকোমল বিরহব্যাকুল কোনো অফুরন্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো। মিথ্যা,

মিথ্যা সব—বৃষ্টির শব্দ যেন এই কথা ব'লে যাচ্ছে—যা নিয়ে তোমরা কথা বলো, যা নিয়ে তোমরা কাজ করো, যা-কিছু নিয়ে দিনের পর দিন তোমরা কাটিয়ে দাও—সব, সব মিথ্যা।

গীতা ফিরে দাঁড়ালো, আস্তে-আস্তে মেঝে পার হ'য়ে মৌলির সামনে এসে বসলো সেই মোড়াটিতে, যেটাতে একটু আগে তার মা বসেছিলেন। খুব চেনা, একই পরিবারভুক্ত অন্তরঙ্গ নয় অথচ খুব অভ্যস্ত এবং আপন কারো কাছে—যেখানে কথা বলার বিষয়ের কোনো অভাব হয় না অথচ কথা বলার বাধ্যতাও থাকে না কোনো, সেখানে মানুষ যেমন ক'রে আসে এবং বসে, গীতার বসবার ধরনে, দু-হাতে হাঁটু জড়িয়ে মৌলির দিকে ঠিক মুখোমুখি না-তাকাবার ভঙ্গিতে, সেই স্বাচ্ছন্দ্যই বোঝা গেলো—অন্তত, সে বুঝিয়ে দিলো তা-ই, তার অতি গভীর অচিকিৎস্য অস্বস্তি একটুও ফুটতে দিলো না বাইরে। কোনটা খাঁটি আর কোনটা মেকি, কোনটা স্বতঃস্ফূর্ত আর কোনটা ভান, তা কি কখনোই কেউ নিশ্চিত ক'রে বলতে পারে—মেয়েদের বেলায়? মেয়েরা—সেই আশ্চর্য জীব, আত্মস্থ, চতুর, সংযত, সাবলীল, যে-কোনো অবস্থায় অবিদ্রোহী, যে-কোনো পরিবেশে নমনীয়, যারা বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে না-গিয়েই তাকে হারিয়ে দেয় শেষ পর্যন্ত, যারা তাদের ইচ্ছাটাকেই দৈবাৎ যেন ঘটিয়ে দেয় এবং দৈবাৎ যেটা ঘ'টে যায় সেটাকেই মিলিয়ে নেয় ইচ্ছার সঙ্গে, অর্থাৎ যারা অসম্ভবের পাথরে মাথা ফাটিয়ে মরে না কখনো, অতএব স্বাভাবিকের আশ্রয় থেকেও কিছুতেই চ্যুত হয় না—সেই কপট, সহজ, সহজেই চক্রান্তকারী, জীবনযোগ্য, জীবনশিল্পী মেয়েদের বেলায় কেউ কি কখনো বলতে পারে কোনটা স্বতঃস্ফূর্ত আর কোনটা ভান? না কি এটা শুধু

জীবনশিল্পেরই কথা নয়, শিল্পকলার, সৃষ্টিকলারও কথা—না কি স্বতঃস্ফূর্ত ব'লে সত্যি কিছু নেই, কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত সুন্দর হয় না কখনো—কেননা শুদ্ধতায় সৌন্দর্য নেই? যা সুন্দর, রূপে, শব্দে, ভাষায় কিংবা চিন্তায় সুন্দর—ছবি, গান, কবিতা—তা-ই কি কোনো-এক অর্থে বানানো নয়, পরিকল্পিত, সংঘটিত—কোনো-এক স্রষ্টার গঠনশক্তিরই কি প্রকাশ নয় সে, বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল আণবিক রাশিকে সংঘবদ্ধ ক'রে তোলার শক্তির—এবং সংঘ মানেই কি অস্বাভাবিকতা নয়, কৃত্রিমতা নয়? হয়তো তা-ই—যা প্রত্যেক কবি মনে-মনে জানেন যদিও হাবেভাবে অনেক সময় অন্যরকম দেখান—যাকে মনে হয় অপ্রতিরোধ্য প্রেরণার ফল, সৃষ্টির তেজোস্ফূর্তির স্বতঃপ্রভ বিকিরণ—তাও চেষ্টিত, আদিষ্ট, অভিনীত, নিজেকে কোনো-এক অভিনয়ের মধ্যে অবিকল মিশিয়ে দিতে যিনি পারেন, তাঁকেই না শিল্পী বলি আমরা! কে এমন শিল্পী আছেন যিনি নারীর ছলনা শেখেননি, যিনি স্বভাবতই অংশত নারী নন—কোথায় সেই ভগবান যাঁকে অর্ধনারীশ্বর হ'তে হ'লো না?

গীতা চুপ ক'রে ব'সে থাকলো একটুক্ষণ; বাইরের উতল সন্ধ্যার শব্দ শুনলো। তারপর বললো, 'খুব বৃষ্টি হচ্ছে।'

মন্তব্যটা বাহুল্য সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য জনের মৌনভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট হ'লো এটি। মৌলি বললো, 'এ-রকম বৃষ্টি হ'লেই কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে আমার।'

'আমি এসে বাধা দিলাম বোধহয়?'

'না, গীতা, তুমি ছাড়াও বাধা আছে। ইচ্ছে! এই ইচ্ছে জিনিশটা কী? শুধু আমাদের দুঃখের মূল।'

'ওটা ধর্মযাজকের কথা হ'লো ; তোমার মুখে মানায় না।'

'কিন্তু ভেবে ত্যাখো—যেখানে ইচ্ছে থাকে, কিন্তু ইচ্ছার অনুপাতে শক্তি থাকে না ?'

'ইচ্ছে করতে পারাটাকেই একটা শক্তি বলবে না তুমি ?'

'সেটা কী-রকম শক্তি ? সে বলে, আমাকে প্রকাশ করো। সেখানে তার যোগ্য হ'তে পারে ক-জন ?'

'অনেকেই পারে না। কেউ-কেউ পারে।'

'যারা পারে বলছো তাদের মুখেও কী-কথা শুনি ? "যত সাধ ছিলো সাধ্য ছিলো না" ? এই আক্ষেপ থামলো না কখনো। পৃথিবীর এই ইচ্ছুক মানুষগুলি নিজের তাপে জ্ব'লে গেলো চিরকাল।'

'জ্বলতেই হবে, নয়তো আলো হবে কেমন ক'রে। শক্তি নেই—এই আক্ষেপ ছাড়া শক্তি হবে কেমন ক'রে ?'

'মানি তোমার কথা। ইচ্ছার অনুপাতে শক্তি থাকে না ব'লেই শক্তির সীমা বেড়ে চলে মানুষের। কিন্তু তারপর ? ইচ্ছা যখন আরো দূরের দিগন্তে স'রে যায় ?'

'সেই দিগন্তের পিছনে ছুটেই তো বাঁচে মানুষ। আর যা-ই করো, ইচ্ছাটাকে দোষ দিয়ো না তুমি। আমি বলি—'

'কী বলো তুমি, শুনি ?'

গীতা ন'ড়ে বসলো মোড়ায়। একটু বাঁকা হেসে, যেন না-বলাটা আরো বেশি লজ্জার হবে ব'লেই লজ্জা-কাটানো ঠাট্টার সুরে বললো, 'মনে করো যা চাই তা আমি পাবো না। মনে করো তা জেনেই নিয়েছি। তাই ব'লে কি চাওয়াটাকেই বাদ দিতে বলবে তুমি ? না ! আমি বলি, তবু ঐ ইচ্ছেটুকু থাক। তাতেই বুঝবো যে বেঁচে আছি।'

মৌ লি না থ

মৌলি ভরা চোখে গীতার দিকে তাকালো। গীতা চোখ নামিয়ে নিলো না, ফিরিয়ে দিলো সেই দৃষ্টি, উজ্জ্বল কালো ভুরু দুটি একটু কুঁচকে, যেন স্পর্ধিত চোখে, ভিতরে-ভিতরে যে দুর্বল তার চেষ্টাকৃত স্পর্ধিত চোখে মৌলির দিকে ফিরে তাকালো। মৌলি বললো, 'সত্যি! সত্যি কথা বলেছো! তোমার কথা শুনে আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি, গীতা!'

'অবাক কেন?'

'এই আমাদের সেদিনের গীতা—সে আজ এত কথাও বলতে শিখেছে!'

'তুমি আমাকে ছোটো দেখেছো, সে তো আমার অপরাধ নয়।'

'বোধ হচ্ছে সেটা আমারই অপরাধ?' মৌলি হাসলো।

—ঠিক কথা, তোমারই অপরাধ। তুমি আমাকে ছোটো দেখেছো, এমন একটা সময় থেকে আমাকে দেখছো যখন আমি প্রায় শিশুদের দলে, আর তুমি—অকালপক্ক!—বয়স ছাড়িয়েও যুবক হ'য়ে উঠেছো, তোমার এই অপরাধ কি আমিই ক্ষমা করতে পারবো কোনোদিন, না কি তুমিই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে? সেই বয়সে, সেই সবচেয়ে কাঁচা এবং আগ্রহে ভরা বয়স থেকে তোমাকে যদি না-দেখতাম —তুমি, এমন আশ্চর্য সজীব, আর এমন উদাসীন!—তাহ'লে তোমার প্রতি এই অন্যায় ভক্তির নিগড়ে কি আমি এমন ক'রে বন্দী হতাম আজ? তোমার ঐ চুল দুলিয়ে হেসে ওঠা দেখবো ব'লে কতবার কত ছুতোয় ঘুরে বেড়িয়েছে একটি ছোটো মেয়ে—তুমি কি তা জানো? তোমার আবোলতাবোল ঝোড়ো গলার কথা শুনতে, কবিতা শুনতে, কত সময় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকেছে ছোটো একটি মেয়ে—তুমি কি তা জানো?—কিন্তু এমনই বা ছোটো কী? তবু—ঐ ছোটো থাকার

বদনাম তার ছিলো ব'লেই তুমি তাকে এমন করলে—করতে পারলে —যে সে আজ তোমারই মতো চলে, বলে, ভাবতে চায়, তোমার মুদ্রাদোষ পর্যন্ত নকল করে, আর তোমার কাছে শেখা কথা আবার তোমারই কাছে আওড়ায় যখন, তখন তোমার প্রশংসা শোনার লজ্জাও তাকে সইতে হয়!

এই কথাগুলি গীতা বললো মনে-মনে—যেমন আগে আরো অনেকবার বলেছে—তারপর মৌলির কথার জবাব দিলো, 'কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে তোমার? এ-সব তো আমার কথা নয়, তোমারই কথা।'

'কথার কোনো কপিরাইট আমি মানি না। যে যেটা নিজের ক'রে নিতে পারে সেটাই তার নিজের। সেই নিতে পারার শক্তি তোমার আছে, গীতা।'

'মনে হচ্ছে সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছো ছাত্রীকে?'

'যথোচিত ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। মাস্টারি করলে এই রকমই সব অধঃপতন হয়।'

'আমি বলতে চেয়েছিলাম যে সার্টিফিকেটের যোগ্য আমি নই। সেদিন ক্লাশে তুমি মেটাফিজিকাল কবিদের বিষয়ে যা বললে, তা বোঝার মতো বুদ্ধিও আমার জুটলো না।'

হঠাৎ একটু লাল হ'লো মৌলি। যে-কর্ম সে নিয়েছে সে-কর্ম তাকে সাজে না, এ-কথা সে কি কখনো ভুলতে পারে যে আবার তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে? না, পারে না সে—কিংবা হয়তো এখানে তার মনই নেই—তার একদা-গুণমুগ্ধ অধ্যাপকেরা নিরাশ হচ্ছেন মনে-মনে, আর ছাত্ররা—সেই সতেজ, উৎসাহী, জিজ্ঞাসু যুবকদের বিষয়ে

মর্মঘাতী কথাটা এই যে তাদের চোখে এখনো তার খ্যাতির ঘোর লেগে আছে—ছাত্রহিশেবে তার প্রবচনরূপ খ্যাতির, তার উপর বাংলা সাহিত্যে তার ক্রিয়াকর্মের বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়ার। আ, খ্যাতি—গ্লানিকর, দুঃসহ পদার্থ—সবচেয়ে গ্লানিকর তখন, যখন তা ছড়িয়ে পড়ে কোনো অক্ষমতার অক্ষম্য আচ্ছাদনের মতো, যখন তা ঢেকে রাখে, লুকিয়ে রাখে, ঘটতে দেয়, নিজের সঙ্গে এবং পরের সঙ্গে কোনো প্রবঞ্চনা! তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ এই মাস্টারি, কিন্তু যে-কোনো কাজ, তুচ্ছতম যে-কোনো কাজ হাতে নিয়ে তাতে অকৃতকার্য হওয়া—এটা কেমন ক'রে মেনে নিতে পারে সে, একদা যার কথা ছিলো বিশ্বজয়ী গাণ্ডীব হাতে বেরিয়ে পড়ার? কবে এই মাস্টারি সে ছাড়তে পারবে? কবে আর তাকে সইতে হবে না বাছা-বাছা ছাত্রদের শ্রদ্ধা—মর্মস্পর্শী, অপমানকর উপহার—সেই উজ্জ্বল সম্ভ্রমের ব্যঙ্গ বিমলেন্দু সেনের মতো ছাত্রের চোখে, নিজের চরকায় তেল দেবার ক্ষমতা সত্যি বলতে তার চেয়ে যার অনেক বেশি।

মৌলি হাতের মুঠো শক্ত ক'রে ছেড়ে দিলো একবার—যেন তার উদ্‌গত অভিমানটাকে পিষে দিলো আঙুলের চাপে। 'বুদ্ধি জুটলো না বুঝি?' ব'লে হাসলো। 'কিন্তু সে-দোষ তোমার বুদ্ধির নয়, গীতা। মেটাফিজিকাল কবিতা অন্য কাউকে পড়াতে দেবার জন্য আন্দোলন করা উচিত তোমাদের!'

'আমি ভাবছিলাম তোমার কাছে এসে একদিন—কিন্তু তোমার কি সময় হবে?'

'সময়? আমাকে এতদিন ধ'রে দেখার পর তুমি কি এই ভাবলে, গীতা, যে আমি "ব্যস্ত" মানুষ?'

'আমি জানি যে সময়ের অভাব কখনোই কারো হয় না। শুধু ইচ্ছারই অভাব হয়। তাই জিগেস করলাম।'

'শুধু ইচ্ছার নয়, শক্তিরও অভাব হয় মনে রেখো। যারা বলে যে সময় পেলে তারা এই করতো ঐ করতো, তারা করুণারও যোগ্য নয় ভুলো না।'

'তাহ'লে দেবে একদিন বুঝিয়ে?'

'আমি পারি না বুঝিয়ে বলতে।' মৌলি সরল গলায় হেসে উঠলো, তার কপালের উপর নেচে উঠলো একটি চুলের গুছি। 'আর তাছাড়া' —হাসির স্বর হঠাৎ মিলিয়ে গেলো তার গলা থেকে—'আমি কি নিজেই কিছু বুঝেছি যে অন্যকে বোঝাবো? কোনো বিষয়েই মনস্থির করতে আমি কি পেরেছি এখনো? আমি বড়ো উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ—কত সময় কত রকম মনে হয় নিজেই তার দিশে পাই না।'

—উদ্‌ভ্রান্ত! তা-ই তো, তাই-তো তোমাকে হ'তে হবে। তার মানেই জীবন্ত, তার মানেই মনের তার বার-বার হাজার স্বরে বেজে ওঠে। তুমি কি কখনো তাদের একজন হ'তে পারো, যারা পায়ে পা তুলে নিশ্চিন্ত, যারা সব বিষয়ে 'ঠিক জানে', যারা কয়েকটি 'প্রিন্সিপল' মেনে জীবন কাটায়? শিখবে তুমি চিরকাল, নতুন হবে বার-বার, বেড়ে উঠবে তুমি চিরকাল! তোমার মতো উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে পারা কারো-কারো উচ্চাশার আকাশ, তা কি তুমি জানো?

'বোঝা গেলো।' আবার একটু হাসি ফুটলো গীতার ঠোঁটে, তার ছবির মতো ভুরুটি একটু বেঁকলো। 'আবেদন মঞ্জুর হ'লো না। এদিকে ক্লাশের সবাই ভাবে কী, জানো? ভাবে, "গীতার আর ভাবনা কী! স্বয়ং মৌলিনাথবাবু তার সহায়!"'

'স্বয়ং মৌলিনাথবাবু যার সহায় সেই ছাত্রকে ভগবান যেন দয়া করেন। পাশ করানো বিদ্যে আমি কিছুই জানি না, তা তো বুঝেছো?'

'বড্ড তোমার দেমাক! আমি তো পাশ করার জন্যই জীবন পণ করেছি!'

'ঠিক অতটা পণ না-করলেও তোমার চ'লে যাবে, মনে হচ্ছে। প্রোফেসরদের সকলেরই ধারণা যে এ-বছর দুটি ফার্স্ট ক্লাস হবে: একটি তুমি, আর একটি বিমলেন্দু। এর মধ্যে ফার্স্ট কে হয় সেটা একটা দ্রষ্টব্য বিষয়।'

'কী এসে যায়, বলো তো, ফার্স্ট হ'লে? প্রত্যেক বছর, প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে, কতই তো ফার্স্ট হ'য়ে বেরোচ্ছে। কী এসে যায়?'

'পারলে, যে-কোনো কাজ হাতে নিয়ে করতে পারলে, এইটুকুই এসে যায়। না-পারা কি ভালো?'

'কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা। তখন কিছুই ভালো লাগে না।'

'কী ভাবো বলো তো?'

'সাধারণের মধ্যে একটু অসাধারণ না-হ'য়ে নেহাৎই সাধারণ হওয়া কি ভালো নয়?'

মৌলি একটু তাকিয়ে থাকলো গীতার দিকে। নিচু গলায়, যেন কোনো গোপন কথা বলছে এমনি সুরে বললো, 'গীতা! এইটে আমার মনের মতো কথা বলেছো!'

'আমার খারাপ লাগে, কেমন রাগ হয়, যখন ইউনিভার্সিটিতে তোমার কথা বলাবলি করে ওরা। কথায়-কথায় বলে—"সবাই কি আর মৌলিনাথ হয়।" তোমাকে ওরা প্রতিযোগিতার বাইরে রেখেছে।—কিন্তু কেন?'

মৌলি একটু হাসলো, স্পষ্ট বোঝা গেলো সে খুশি হ'লো কথাটা শুনে। গীতা আবার বললো, 'আমি ভাবি যে তুমি যেখানে আছো সেখানে কখনো পৌঁছনো যাবে না, এই যদি স্বতঃসিদ্ধ কথা, তাহ'লে এ-সব চেষ্টার প্রহসন ক'রে লাভ কী।'

সেই তৃপ্তির হাসিটুকু—যে প্রশংসা নিজেকে সে দিতে চায় তা অন্যের মুখ থেকে শোনার ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ—মৌলির মুখ থেকে মিলিয়ে গেলো। 'গরম হচ্ছে ঘরটা,' ব'লে উঠে গিয়ে একটা জানলা খুলে দিলো, গীতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো একটুক্ষণ। হাওয়ার জোর আর নেই, বৃষ্টি পড়ছে অবিরল ঋজু রেখায়, যেন কোনো একই কথা অফুরন্ত বার মনে করিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর বিস্মৃতিপ্রবণ মানুষদের। পাড়ার ঝাপসা-দেখানো ইলেকট্রিক আলোর সারি পেরিয়ে তার চোখ চ'লে গেলো প্রান্তরের অন্ধকারে, ফিরে এলো যেখানে অন্ধকার আরো ঘন ব'লে বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যায়। বাইরের সোঁদাগন্ধ হাওয়ায় নিশ্বাস নিলো, মুখে মাখলো স্পর্শময় বর্ষণের নির্যাস। তারপর ফিরে এলো চেয়ারের কাছে, কিন্তু বসলো না, গীতার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো: 'আমি? আমি কি কোনোখানে পৌঁচেছি? না, গীতা। আমার দুঃখের কথা বলি তোমাকে; এতদিনেও মনের কোনো আশ্রয় আমি খুঁজে পাইনি। তাই তো অন্যদের কোনো কাজে আমি লাগি না: তুমি, গীতা—তোমারও কোনো কাজে লাগতে পারি না আমি। সাহিত্যের পথে বেরিয়েছো তুমি আজ: কী দেখছো এখানে? এখানেও পাণ্ডা আছেন, পুরুৎ আছেন, নানা মতের মোহান্ত—সমালোচক তাঁরা, পণ্ডিত, ধর্মযাজক, তাঁরা তোমাকে হাতে ধ'রে নিয়ে যাবেন পর-'র সুশৃঙ্খল পা ফেলে, তাঁদের কাছে পদ্ধতি শিখবে

তুমি, নির্দেশ পাবে, নির্দিষ্টের আশ্রয় পাবে তাঁদেরই কাছে, গীতা। আর আমি এই এঁদেরই এড়িয়ে গেছি বরাবর, দূর থেকে গড় ক'রে পালিয়ে গেছি, পৈতে নিইনি, তিলক কাটিনি—এঁদের কারোরই কোনো ইশকুলে আমি ভর্তি হলাম না কখনো—স্বর্গরাজ্যের যে-চাবির গোছা বাঁধা আছে এঁদের কোমরে, তার রুনুঠুনু আওয়াজের আহ্বানে আমার মন সাড়া দিলো না; আমি চ'লে এলাম মন্দির গির্জে পাশ কাটিয়ে; আমি চাইলাম স্বাধীনভাবে স্বর্গে পৌঁছতে, আঁকাবাঁকা ধুলোর পথে ঘুরে-ঘুরে সোজাসুজি স্বর্গে পৌঁছতে চাইলাম: আমাকে বলতে পারো সাহিত্যের পথে বাউল, আপন উপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই যে মানে না সেই মিস্টিক বলতে পারো আমাকে। এই পর্যন্ত বেশ ভালো।' ব'লে মৌলি থামলো, গীতার মুখে চোখ রাখলো একবার, গীতার চোখের তারা দুটি ছোট্ট দু-ফোঁটা হিরের মতো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। তারপর নিশ্বাস ফেলে আবার বললো, 'হ্যাঁ, এই পর্যন্ত শুনতে বেশ ভালো। কিন্তু যেখানে আমি তাঁবু বাঁধতে চেয়েছিলাম, সেই উপলব্ধি আমার কোথায়? এতদিনে কিছুই আমি সম্বল কুড়োতে পারিনি—শুধু অভিজ্ঞতা ছাড়া। কিন্তু সেই আমার দিনে-দিনে, পলে-পলে পাওয়া অসংখ্য অবাক-করা আঘাত—আমার সাহিত্যের অভিজ্ঞতা, বলতে পারো জীবনেরও অভিজ্ঞতা—তার উত্তরোল অস্থিরতাকে উপলব্ধির সূত্রে কি আমি বাঁধতে পারলাম এখনো? না, গীতা, তা আমি পারিনি—তার মানে কিছুই পারিনি। অভিজ্ঞতা ঢেউয়ের মতো আসে আর যায়—উচ্ছৃঙ্খল তারা, নিয়ম মানে না, পরস্পরের প্রতিকূলে চলে কত সময়—ফেলে রেখে যায় কিছু পলিমাটি, দিনে-দিনে জ'মে ওঠে ভূমি —কিন্তু সেই মাটির স্তরে-স্তরে ফসল ফলাতে হ'লে শিক্ষা চাই, শাসন

চাই, হয়তো—হয়তো কোথাও আত্মসমর্পণেরও শক্তি চাই, গীতা। কিন্তু আমি—আমি আমার অহমিকাকেই সিংহাসনে বসিয়েছি, কবিতার ক্রিমিন্যাল আমি—বিদ্রোহী—স্বপ্নের স্বৈরাচার আমার পেশা। এখানে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু নিঃসঙ্গতাও আছে, গীতা; একরকম বলতে-না-পারা তীব্রতার আস্বাদ আছে, কিন্তু শান্তি নেই—শান্তি নেই।'

'মনে করো আমি শান্তি চাই না?' যে-মুহূর্তে মৌলি থামলো সে-মুহূর্তেই গীতা ব'লে উঠলো, 'মনে করো আমিও যদি উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে চাই?'

ছোট্ট আওয়াজ ক'রে হাসলো মৌলি। তার বসবার ইজিচেয়ারটায় এক পা তুলে দাঁড়িয়ে গীতাকে একটু দেখলো যেন মন দিয়ে। 'মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছো?' তারপর হঠাৎ অন্য রকম গলায় বললো, 'তোমার পড়াশুনোয় কখনো কোনো অসুবিধে ঘটলে বিমলেন্দুকে জিগেস করতে পারো।'

'উদ্‌ভ্রান্ত হবার ওষুধ বুঝি বিমলেন্দু সেন?'

'ও অমন সুস্থির ব'লেই ওকে আমার ভালো লাগে।'

'সত্যি?' হাসির আভাস ঝিলিক দিলো গীতার চোখে।

না, সত্যি নয় কথাটা। সুস্থির মানুষ মৌলিনাথের ভালো লাগে না। ভালো লাগে না, কিন্তু তারিফ করে মনে-মনে। বিমলেন্দুর নিচু গলার কথা, তার অপ্রগল্‌ভ, অনুচ্ছ্বসিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ কথাবার্তা, তার চোখের স্মিতশীতল দৃষ্টি, তার বইয়ের পাতা ওল্টাবার অতিশয় মৃদু এবং সশ্রদ্ধ ধরনটি—এমন কখনো হয় না যে এ-সব মৌলিনাথের মনের কোনো-এক অংশের প্রশংসা কেড়ে না নেয়। ক্লাশে যখন বিমলেন্দুর দিকে তার চোখ পড়ে—মন দিয়ে শোনার ফলে একটু

লম্বাটে দেখায় মুখটি, কিন্তু চোখে চোখ পড়লেই বোঝা যায় যে শুনতে-শুনতেই বাহুল্য অংশ ছেঁটে দিচ্ছে সে—কিংবা যখন ছাত্রদের কোনো অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায় সে ন্যূনতম ব্যস্ততা দেখিয়ে অধিকতম সুচারুতা সম্পাদন করে—কিংবা কোনোদিন যখন মৌলিনাথের বাড়িতে এসে—সেদিন হয়তো রবীন্দ্রনাথের হাল আমলের গদ্য নিয়ে কথা উঠলো—অধ্যাপকের অনেক কথার ফাঁকে-ফাঁকে গদ্য-কবিতার অবাস্তবতা প্রমাণ ক'রে অল্প কয়েকটি সারবান মন্তব্য ক'রে কৃতজ্ঞ মুখে উঠে চ'লে যায়—তখন মৌলিনাথ মনে-মনে বলে, 'ছেলেটির সবই ভালো, কিন্তু এমন—পরিমিত!' আর সঙ্গে-সঙ্গে তখনই আবার বলে, 'ভাগ্যবান যুবক! ভাগ্যবান!'

'বিমলেন্দুকে সত্যি খুব ভালো লাগে আমার,' যেন একটু ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে মৌলি বললো। 'সত্যি খুব ভালো ছেলে।'

' "ভালো ছেলে"দের ভক্ত হ'লে কবে থেকে?'

'সে অর্থে নয়,' মৌলি চোখ দিয়ে প্রায় তিরস্কার করলো গীতাকে, 'ও পড়েছে বিস্তর, বুঝেছে অনেকটা, যা বুঝেছে তা গুছিয়ে বেশ বলতেও পারে।—কিন্তু আমার চাইতে তুমি তো ওকে বেশি জানো।'

'হ্যাঁ, জানি। জানি ওর মস্ত গুণ এই যে ও যা বোঝে না তা নিয়ে কথা বলে না। হয়তো,' একটু থেমে গীতা জুড়ে দিলো, 'হয়তো তা বুঝতেও চায় না।'

'যা বোঝা যায় না,' গীতার কথাটা ভুল শুনলো মৌলি, কিংবা হয়তো ইচ্ছে ক'রেই বদলে নিলো, 'তা বুঝতে না-চাওয়াই তো ভালো! যা বোঝা যায় না তা বোঝার চেষ্টা, যা বলা যায় না তা বলার চেষ্টা—' হঠাৎ থেমে গেলো মৌলি।

একটি বর্ষার সন্ধ্যা

'বলো!' যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এলো গীতার এই নিচু গলার ডাক, আবেদনে ভরা আহ্বান, নিশ্বাসের স্বরে মনে মনে বলা প্রায় কোনো প্রার্থনার মতো। কিন্তু মৌলি জবাব দিলো না, স'রে গিয়ে পাইচারি করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। আ, এ-সব কথা গীতাকে কেন বলছে সে, কেন সে তার মনের ভাবনা গীতার সামনে মেলে ধরে যখনই গীতাকে সে কাছে পায়? এটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে তার, ওরও তা-ই হয়েছে হয়তো; গীতা এলেই এই রকম কথা চলে খানিকক্ষণ, ও কেমন একরকম পারে তার কথাকে ঠিক সে-সব দিকেই বইয়ে দিতে যেখানে বলতে গেলে কথা আর ফুরোয় না। ভালো না—ভালো হয়নি এটা। কথা বলার তার হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু অন্যের তো শোনার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই শুধু নয়, রীতিমতো অপ্রয়োজন আছে, ক্ষতি হয় ওতে, নষ্ট হ'য়ে যায় জীবন। এক দিকে এই কবিতা, সাহিত্য—যা কিছু বানানো, রচিত, কল্পিত, অর্থ-দিতে-চাওয়া, অন্য দিকে বিনা-জবাবদিহির জীবন। সুখ শুধু তারাই জানে, শুধু বাঁচা, শুধু বাঁচতে পারাই যাদের যথেষ্ট। বাস্তবে ছাড়া আর কোথায় স্বাস্থ্য আছে মানুষের? সংসারে ছাড়া আর কোথায় আশ্রয় আছে? নিজে যারা সুন্দর হ'তে জানে, সুন্দর ক'রে বাঁচতে পারে, কোন দুঃখে সুন্দরের পিছনে ছুটবে তারা—সেই উন্মাদ অভিশপ্ত মৃগয়া, যার শেষে বিজেতাই একদিন মুখ থুবড়ে মাটিতে প'ড়ে থাকে কিরাতের বর্বর তীরের লক্ষ্য হ'য়ে! আগে সে ভাবতো যে জীবন আর সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক: জীবনে যে-সব প্রশ্ন জাগে তারই উত্তর মানুষ খুঁজে পায় সাহিত্যে।—কিন্তু না! কিছু জানবার জন্য আমরা লাইব্রেরিতে যাই, সেটা সাহিত্য পড়া নয়;

শোকের দিনে আমরা গীতা খুলে বসি, সেটা কবিতা পড়া নয়। জীবন-সমস্যার মেটিরিয়া মেডিকা নয় সাহিত্য, তার সম্বন্ধে সবচেয়ে ভয়ংকর কথাই তো এই যে সে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, এই বিশ্বে স্বাধীন সত্তা আছে তার। তাই তো খুঁজে-খুঁজে তার অন্ত কেউ পায় না; তাই তো সব ব্যর্থ—অর্থহীন—যত কথাই কবিতা নিয়ে আমরা বলি না, যত না আমরা সুন্দরের সুতো ছিঁড়ি ব'সে-ব'সে! কবিরা কবিতা লেখেন—সব সময় বলবার কিছু' আছে ব'লেই কি লিখতে বসেন? তা তো নয়। এর আরম্ভ কোথায়? সেই প্রথম চালিয়ে-দেয়া ধাক্কা আসে কোথা থেকে? খেলাচ্ছলে আরম্ভ হয় কত সময়—হয়তো কোনো ছন্দের পোকা মগজ থেকে তাড়াবার জন্য, কিংবা যখন হঠাৎ কোনো তৈরি লাইন পথের ধারে নর্দমার জলে উপহার পায়, কিংবা কোনো চমকে-দেয়া আদরের মতো মিল—শুধু একটি মিলেরই জন্য কি কবিতা লেখা শুরু হয় না কখনো? কিন্তু সেই তুচ্ছ আরম্ভ থেকেও মহৎ পরিণাম সম্ভব হয় কোন জাদুবলে? কেমন ক'রে তাতে বেরিয়ে আসে পরতে পরতে অভিজ্ঞতা, ধরা পড়ে স্তরে-স্তরে অর্থ, আসে ব্যাপ্তি, ঘনতা, সংগতি,—শুধু তা-ই নয়, তার উপরেও এমন কিছু এসে মিশে যায় কবি নিজে যা ইচ্ছে করেননি, ইচ্ছে করলেও দিতে পারতেন না কখনো—যার ফলে কবিতা হ'য়ে ওঠে মনুষ্যজাতির সংহত ইতিহাস? খেলা আর খেলা থাকে না যখন, তখনকার তাপ, হিম, পরিশ্রম, ত্যাগ—নিজেকে নিংড়ে বের করার দম-বন্ধ-করা কষ্ট—সব বুঝে নিয়েও, সেখানে পূর্ণ মূল্য মিটিয়ে দিয়েও—তবু তো কিছু বাকি থাকে যা বোঝা যায় না—সেই সর্বশেষ স্পর্শটুকু, যা না-হ'লে কিছুই হ'তো না, যেটুকু না-ঘটলে কথার সারি তাসের বাড়ির মতো ভেঙে

পড়ে। সেই অনির্বচনীয়ে উঁকি দেবে কে? সৃষ্টির রহস্য যেখানে সহনীয় দৃশ্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে—সেই আশ্চর্য দ্রৌপদীর শাড়ি!—কার এত স্পর্ধা যে পরদা সরিয়ে উঁকি দিতে যাবে সেখানে? না, না! এই গীতা, আজকের এই উনিশ বছরের গীতা আমাদের, যার সামনে আস্ত একটা ভরপুর জীবন প'ড়ে আছে—তাকে কেন লুব্ধ করা, ব্যর্থতার পথে, আবেগের ব্যভিচারের পথে, তাকে কেন টেনে আনা?

'তুমি কী ভাবছো জানতে পারি?'

'তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।' মৌলি পাইচারি থামিয়ে আবার এসে ইজিচেয়ারে বসলো।

'আমাকে কোনো কথা বলতে এতক্ষণ ভাবতে হয় তোমার?'

'তোমার জন্য আমার ভাবনা হয়, গীতা, যেহেতু তুমি কবিতা ভালোবাসো।'

—কবিতা ভালোবাসি? হায় মূঢ় মানুষ! পৃথিবীর সমস্ত কবিতা আমি কি মহানন্দে বানের জলে ভাসিয়ে দিতাম না, আমার চাওয়ার এক বিন্দু তাতে মিটতো যদি! কী পড়ি আমি কবিতায়, কেন পড়ি, কোন মূল্য সেখানে আমার জমা আছে তা তুমি বোঝো না—বুঝো না—কোনোদিন না-বুঝে আমায় বাঁচিয়ে দিয়ো তুমি, আমার এই ফাঁকির বেসাতি ধ'রে ফেলো না।

'হ্যাঁ, ভাবনা হয়,' আস্তে, সস্নেহ সুরে মৌলি বললো, 'কখনো-কখনো ভয় করে তোমার জন্য। না, গীতা না; এ-সব নিয়ে কেন এত ভাবছো তুমি?'

'কী নিয়ে ভাবছি বলো তো?'

'ভালো না এ-সব। ঐ-যে তুমি বললে যে তবু ঐ ইচ্ছেটুকু থাক, ও-রকম কথা ভালো না, গীতা। তাতে বুঝবে বেঁচে আছো? না, না! আমি বলছি তোমাকে, ওতে মানুষ বাঁচে না। আমি তো জানি, আমি তো একটা ইচ্ছার পিণ্ড হ'য়ে ব'সে আছি, আমি তো জানি যে চীৎকার ক'রে বুক ফাটালেও সাড়া দেবে না সেই বধির। এই পাপ, হৃদয়ের এই ব্যাধি যদি উপড়ে ফেলতে না পারো, গীতা, তাহ'লে জীবন তার প্রতিশোধ নেবে তোমার উপর, তুমি বুড়ো হবে অকালে, জিভে স্বাদ থাকবে না, বন্ধুরা তোমাকে ছেড়ে যাবে—তাহ'লে তোমার দু-চোখে দুটি হিরের ফোঁটা আর জ্বলজ্বল করবে না, গীতা। ঐ পরিণামের দিকেই রঙিন পথ মেলে দিয়েছে এই—এই সব—কবিতা ইত্যাদি ব্যাপার। বুঝেছো আমার কথা?'

'বুঝেছি। কিন্তু রাখুকে একটু সাহায্য করলে বোধহয় ভালো হয়,' ব'লে গীতা উঠে দাঁড়ালো।

৩

দু-হাতে ধ'রে চায়ের ট্রে নিয়ে আসতে-আসতে রাখু ঠেকে গিয়েছিলো দরজার পরদায়, গীতা গিয়ে পরদাটা তুলে ধরলো। ঘরে এসে বেতের টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখু একটু দাঁড়ালো। আধবুড়ো মানুষ, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চওড়া মুখের ভাবটি যেন অভিভূতি ধরনের গম্ভীর। একটু ঢিলে, দীর্ঘসূত্রী, কিন্তু মোটের উপর বিশ্বাসী, কাজের লোক, আর অবশ্য অনেক দিনের পুরোনো—তবে বড্ড যেন রাশভারি, এই বিশ্বসংসারে অনুমোদনের অযোগ্য কিছু আবিষ্কার

করতে সর্বদাই যেন প্রস্তুত। মৌলি তাকে সমীহ করে, প্রায় একটু ভয় করে বললেও ভুল হয় না; তার মনে হয় রাখু যেন কঠিন সমালোচনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়—এই ঘরের মধ্যে বইপত্র নিয়ে ব'সে যা-কিছু সে করে কিংবা করে না, তার সমস্তটাই রাখুর বিচক্ষণ আনুকূল্যহীন বিচারের অধীন ব'লে মৌলি সন্দেহ করে মনে-মনে।

বেতের টেবিলের বই, চিঠিপত্র, লেখার টেবিলে তুলে রাখলো রাখু। ঠিক দরকার ছিলো না, তবু ট্রে-সুদ্ধ টেবিলটি মৌলির আরো হাতের কাছে এগিয়ে দিলো। ঈষৎ শ্লেষ্মাজড়িত গলায় জিগেস করলো, 'আর-কিছু লাগবে?'.

'না,' রাখুর দিকে না-তাকিয়ে মৌলি জবাব দিলো।

'চিনির শিরেয় চিনেবাদাম পশিয়ে ভাজা হয়েছে; মা খেতে বললেন।'

'আচ্ছা।'

মাপা-মাপা পা ফেলে রাখু চ'লে গেলো ঘর থেকে। তার ফতুয়া-পরা জোরালো পিঠটা—মৌলির মনে হ'লো—যেন নিঃশব্দে তাকে বিদ্রূপ ক'রে গেলো। হঠাৎ কেমন নিস্তেজ লাগলো তার, অবসন্ন; যেন একটা হিম কাঁপুনি নামলো মেরুদণ্ড বেয়ে; মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো তার এই সাহিত্যচর্চা—জীবনের সর্বস্ব তার—তা কিছু না, কিছুই না, কিছুই এতে এসে যায় না। মনে হ'লো যৌবন তার ফুরিয়ে গেছে; আর সেই অভাবের ক্ষতিপূরণ হয় এমন কোন সম্পদ আছে পৃথিবীতে?

বাইরের কালো রাত্রির দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনলো মৌলি,

আপাতত এ-কথা ভেবেই সুখী হবার চেষ্টা করলো যে ঠিক সময়ে চা পাঠিয়ে দিয়েছেন মা। সুখ: কথা ব'লে ক্লান্ত হ'য়ে গরম চায়ে গলা ভিজোবার সুখ, কোনো বৃষ্টি-নামা শেষরাত্রের ভাঙা ঘুমে পায়ের তলায় পুরোনো কাঁথার উষ্ণ-নরম শীতলতার স্পর্শসুখ—সুখের এ-সব উঞ্ছবৃত্তি নিয়েই সারা-জীবন কেটে যায় মানুষের। ভালো—কিন্তু তাও কি ভালো নয়, এইটুকুই কি বাঁচোয়া নয়, সত্যি বলতে? কোনো না-কোনো রকমের সুখ যদি না থাকে তাহ'লে আত্মসম্মানও থাকে না, আর আত্মসম্মান না-থাকলে আর থাকলো কী জীবনে? হ্যাঁ, ভালোই তো, ভালোই তো দেখাচ্ছে এই সাজানো ট্রে, সবুজ হলুদে ডোরা-কাটা কাপড়ের উপর গোয়ালিয়রের গাঢ়-নীল পেয়ালা—সেবার নিয়ে এসেছিলো কলকাতা থেকে—গন্ধ উঠছে গরম নিমকির, চিনিতে পশানো চিনেবাদামটাও দেখতে কিছু মন্দ লাগছে না। মৌলির মনে হ'লো যে এই সব দৈনন্দিন জিনিশ—জীবনের সাধারণ সব উপকরণ, যা সে ব্যবহার করে, ভোগ করে, নির্ভর ক'রে থাকে যাদের উপর—এদেরও কিছু পাওনা আছে তার কাছে, কিন্তু এদের সেই মূল্যটুকু মিটিয়ে দিতে সে-যে ভুলে যাচ্ছে আজকাল, এতেই বোঝা যায়—এটাই কি তার ব্যর্থতার পরিমাপ নয়?

গীতা আবার সেই মোড়াটিতে এসে চুপ ক'রে ব'সে ছিলো, মৌলির চোখ স'রে গেলো তার দিকে। একটু পরে বললো, 'তোমার শাড়ির রংটি বেশ।'

'হেলিওট্রোপ রং তোমার ভালো লাগে?'

'হেলিওট্রোপ—সুন্দর কথা! আসল মানে "সূর্যমুখী"। অবশ্য আমাদের ভাষায় সূর্যমুখী আলাদা। হেলিওট্রোপ ফুল তুমি দেখেছো?'

'না, দেখিনি।'

'আমিও দেখিনি। তবে কচুরিপানার ফুল দেখেছি। তাও সুন্দর। আর ঠিক এই রকমই তার রং।' একটু চুপ ক'রে থেকে মৌলি আবার বললো, 'বেশ রংটি।'

'বেশ বলছো ? না, রংটা বাজে।'

'বাজে ?'

'নয়তো আমাকে ছাড়িয়ে শাড়ির রংই তোমার চোখে পড়লো !'

'আসলে এই রংটিতে তোমাকে মানিয়েছে বেশ।'

'কিন্তু আর কি মেয়ে নেই যাকে এ-রঙে মানায় ?'

'একচ্ছত্র আধিপত্য চাও ?' মৌলি হাসলো।

'তোমার চা বোধহয় কড়া হ'য়ে যাচ্ছে,' গীতা মনে করিয়ে দিলো মৌলিকে, কিন্তু চা ঢেলে দেবার মেয়েলি কর্তব্যটুকু সম্পাদন করতে অগ্রসর হ'লো না।

'চা—বেশ, বেশ। আমাদের পূর্বপুরুষদের আমি ক্ষমা করতে পারি না, গীতা—এই ভারতবর্ষীয় চা-পাতা তাঁরা পাঁচ হাজার বছরে আবিষ্কার করতে পারলেন না। কাজটা বাকি রাখলেন ইংরেজের জন্য।'

'আমি কিন্তু এখন চা খাবো না !'

'খাবে না ?'

'এইমাত্র খেয়ে আসছি।'

'তাহ'লে নিমকি একটা ?' মৌলি নিচু হ'য়ে টী-পটের ঢাকনা তুললো।

'আচ্ছা, দাও। মৌলির হাত থেকে আধখানা নিমকি ভেঙে নিলো গীতা, বাঁ-হাতে দু-আঙুলে ধ'রে থাকলো।

'তোমাকে প্লেট দিইনি বুঝি ?'—মৌলি ভ্রম সংশোধন করলো

তাড়াতাড়ি—'একটু মিষ্টি চিনেবাদাম? রাখু বিশেষভাবে রেকমেণ্ড করলো এটা।'

গীতা দুটি-তিনটি চিনেবাদামের দানা তুলে নিলো। 'আচ্ছা, একটু চা-ও দাও। আধ পেয়ালারও কম কিন্তু।' তারপর মৌলির হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে তার উপর মুখ নামিয়ে গভীরভাবে নিশ্বাস নিলো একবার। চোখ বুজে এলো তার, সেই গন্ধে, সেই দুর্বার, ক্ষণকালীন আঘ্রাণে, যাকে কিছুতেই ধ'রে রাখা যায় না কিন্তু মুহূর্তেই যে অনেক কিছু কাজ ক'রে চ'লে যায়, যে-গন্ধ প্রথম তাকে আঘাত করেছিলো যখন।। নাডতে টী পটের ঢাকনা তুলেছিলো মৌলি। সে কি চায়ের গন্ধ? না চাঁপা ফুলের? না কোনো বৈশাখের সোনার মতো সকালবেলার? এ তো সে-ই আবার—বৃষ্টি, অন্ধকার, বছর, সময়, সমস্ত পার হ'য়ে সে-ই আবার, সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল সকালবেলাটি, যখন সে পা টিপে-টিপে এই ঘরে এসেছিলো, ওদের দু-জনের কত কী বলাবলির মধ্যে হঠাৎ এসে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়েছিলো! আ— ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ গীতা। কিন্তু তার মন, তার হৃদয়, তার বারো বছরের কাঁপন-লাগা শরীরের অণু-পরমাণু দিয়ে তখনই কি সমস্ত ইতিহাস সে প'ড়ে নেয়নি—ইতিহাসের পাত্রীও কি হ'য়ে পড়েনি সঙ্গে-সঙ্গে?—ওদের দু-জনের—কথাটা কি উচ্চারণ করা যায়? কিন্তু এখন আর বাধাই বা কী—ওদের দু-জনের কিশোর-প্রণয়ের তাপ সেও কি আভাসে কিছু পায়নি, ঢেউ তুলে ছড়িয়ে যায়নি তার আবহাওয়ায়— যেমন ফাল্গুন মাসে দুপুরবেলায় হঠাৎ দক্ষিণে হাওয়া দেয়, আর আমের ডাল শিউরে উঠে মুঠো-মুঠো মুকুল তোলে ফুটিয়ে?—সেইখানেই আরম্ভ! অনেক দিন, অনেক মুহূর্ত, বার-বার কত সোনালি ঝলক ব'য়ে গেছে

তার উপর দিয়ে—কিন্তু সেদিনের সেই সকালবেলাটির মতো, চাঁপার গন্ধে, চায়ের গন্ধে নেশা-ধরানো সেই মুহূর্তটির মতো, কিছুই আর ঘটেনি এই ইতিহাসে। কী তীব্র ভালো লাগা ছিলো তাতে, সেই শুধু কাছে এসে একটু দাঁড়ানোয়, তার হাত থেকে চাঁপা ফুল নিয়ে মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে ফিরে যাওয়ায়—যাতে কিনা এই জীবনের যা-কিছু সুন্দর, সমস্তই ঐ গন্ধ হ'য়ে জড়িয়ে আছে তার মনের মধ্যে। আর এখন? এখনই কি তোমার ভালো লাগার অবসান হয়েছে, গীতা? এই তো তুমি ব'সে আছো—যে-চায়ে সত্যি তোমার ইচ্ছে নেই সেই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে, যে-কবিতায় সত্যি তোমার মন নেই তারই স্বচ্ছ জালের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে—শুধু কাছে থাকতে, ব'সে থাকতে, তাকিয়ে থাকতে!

'চা খাচ্ছো না? ভালো হয়নি?'

'খাচ্ছি।' গীতা মুখ নিচু করলো পেয়ালায়, কিন্তু চুমুক না-দিয়ে তখনই আবার বললো, 'তোমার মনে পড়ে, একদিনের কথা? একদিন—অনেকদিন আগে—সকালবেলা তোমার এখানে এসেছিলাম। সবাই এসেছিলাম আমরা। মা, দাদা—দিদিও। তোমার টেবিলে সেদিন পাথরের থালায় চাঁপা ফুল ছিলো।' এটুকু ব'লে চুপ করলো গীতা, যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো।

একটু কি ছায়া পড়লো 'মৌলির মুখে? চোখের পাতা মুহূর্তের জন্য নেমে এলো চোখের উপর? কিন্তু তখনই হাসি ফুটলো ঠোঁটে, পরিষ্কার চোখে হেসে তাকিয়ে বললো, 'মনে আছে তোমার? তোমাকে সেদিন একটা ফুল দিয়েছিলাম, কিন্তু সব ক-টাই দেয়া উচিত ছিলো। যা সুন্দর তুমি ছিলে তখন!'

'ছিলাম!'

নিশ্বাস পড়লো মৌলির। সবচেয়ে নিষ্ঠুর কথা—ঐ ছিলো, ছিলাম। কিন্তু ঐ তো হয়, গীতা, ঐ তো হয়। তোমার ঐ বয়সে—তোমার রূপের যেন তুলনা ছিলো না। আর এখন—আরো দশজন রূপসীর ভিড়ে মিশে গেছো তুমি। এক দশা তোমার আর আমার।

'কেউ-কেউ হয়তো বলবে যে এখন তুমি আরো সুন্দর।'

'কিন্তু তুমি তা বলবে না—এই তো? তা তোমার মতো বছর-বছর আরো সুন্দর তো সবাই হয় না।'

মৌলি হাসলো, যেন বেশ খুশি হ'য়েই হাসলো। 'আমার অনেক প্রশংসা শুনেছি, গীতা, কিন্তু আমি দেখতে ভালো এ-কথা এই প্রথম শুনলাম।'

এই প্রথম? কেন এ-সব মিথ্যা ব'লে আমাকে আরো মনে করিয়ে দাও আমার হার? আমি কি জানি না যে আমি হেরে গেছি, প্রথম থেকেই হেরে ব'সে আছি, ঠিক শুরু করতেই আমি কখনো পারলাম না!

'দিদি কী বলতো, জানো?' একটু সাবধানে, কিন্তু আপাতত খুব সহজ ক'রে গীতা বললো, 'বলতো—মৌলির মতো চোখ, মৌলিব মতো হাসি, কোনো মানুষের হয় না।'

'হ্যাঁ, তোমার দিদি যদি ও-রকম বলতেন,' ব'লে মৌলি একটু আয়াস ক'রে হেলান দিলো চেয়ারে। 'কিন্তু তোমার উপর দিদির প্রভাব স্বাস্থ্যকর হয়নি।'

—দিদির প্রভাব? কে জানে কার প্রভাব। দিদিকে সে ভালোবাসতো—সেই তার শিউরে-ওঠা সবুজ বয়সে দিদিকে সে ভালোবাসতে খুব,

মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতো দিদির দিকে—সবচেয়ে ভালোবাসতো মৌলির সঙ্গে যা-কিছু তখন ছিলো চিত্রার। আ—ঈর্ষার পর্যন্ত স্থান ছিলো না তখন, এত সে অস্ফুট, অব্যক্ত, দুর্বল। দিদির যখন বিয়ে ঠিক হ'লো, বিয়ে হ'লো, তারপরেই মহেন্দ্রবাবু দিল্লিতে চাকরি নিয়ে চ'লে গেলেন—সেই সমস্তটা সময় সে কেঁদেছিলো খুব—থেকে-থেকেই তার কান্না পেতো তখন—কিন্তু সে-কান্না কিসের? কার জন্য? দিদির বিয়ের খবর সে প্রথম যখন শুনলো—সেই চাঁপাফুলের সকাল-বেলার দু-একদিন পরেই—তখনই কি লাফিয়ে ওঠেনি তার হৃৎপিণ্ড, মনে-মনে 'হায়-হায়' ক'রে ওঠেনি যে আর তো সে আমাদের বাড়ি আসবে না! কিন্তু তারপর, সেই বসন্ত ঋতুর প্রথম ঝড়ঝাপট কেটে যাবার পর, যখন সে প্রামাণ্যরূপে বড়ো হ'য়ে শাড়ি ধরলো, স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে এলো—কপালগুণে পড়াশুনোর জোরে লক্ষ্যণীয়ও হ'তে পারলো একটুখানি—আর সর্বশেষে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসে নতুন একটা অধিকার পেলো যখন—এই এতগুলি বছর ভ'রে গীতার মনে এই কথারই ঢেউ দিয়েছে থেকে-থেকে যে ভাগ্যে এখন দিদি কাছে নেই। ভাগ্যে সুমতি হ'লো দিদির, মানুষটাকে আস্ত জুড়ে দখল করার স্পর্ধা হ'লো না, ভাগ্যে দিদি স্থিত হ'লো হাজার মাইলের নিশ্চিন্ত পরপারে—যখন—যখন আর অন্য কারো পিছন-পিছন পা টিপে-টিপে ঘরে আসতে তাকে হয় না, যখন সে নিজেরই পায়ে দাঁড়াতে পারছে!—নিজের পায়ে, কিন্তু অন্যের জমিতে বোধহয়? অন্তত, অন্য কেউ এই পথেই এগিয়েছিলো তার আগে—পৌঁছতে না পারুক, এই পথেরই দূর্বাঘাস মাড়িয়েছিলো? এমনি ক'রে এই ঘরে এসেছিলো অন্য কেউ, এমনি ক'রে কথা শুনেছিলো, দু-চোখ ভ'রে

দেখেছিলো। জানি, মেনে নিয়েছি সব, তবু অসহ্য লাগে এক-এক সময়। তুমি, মহেন্দ্র ঘোষের স্ত্রী, তোমাকে কি আসতেই হয়েছিলো এই দেশে দু-দিনের জন্য বেড়াতে? আমার এই স্বর্গে, এই অলীক, ভিত্তিহীন, অনুপার্জিত স্বর্গে, এই একটু ছায়া কি তোমাকে ফেলতেই হ'লো, দরিয়াগঞ্জের দোতলা বাড়ির গৃহলক্ষ্মী? এ-কথা যখন ভাবে, তখন যেন দিদিকে আর ক্ষমা করতে পারে না গীতা, দিদির কারণে যত পুলক সে পেয়েছিলো তার জন্য কৃতজ্ঞ হ'তে ভুলে যায়—তখন তার মনে হয় যে দিদির সবই ফাঁকা, ফেনিয়ে-তোলা, ভেজাল, ঐ তার লম্বা-চওড়া সাহিত্যিক ভাবের চিঠিপত্রেরই মতো, যাতে মৌলিনাথের আগেকার গদ্যের অসাধু অনুকরণ লক্ষ্য ক'রে গীতার যন্ত্রণাবিদ্ধ মন কিছুতেই আর সান্ত্বনা মানে না।

'বোধহয় কারো উপরেই অন্য কারো প্রভাব স্বাস্থ্যকর হয় না,' ব'লে গীতা যেন সন্ধানী চোখে চকিতে একবার মৌলির দিকে তাকালো। তারপরেই বললো, যেন তার প্রথম কথাটারই দ্বিতীয়টা কোনো উদাহরণ, 'দিদি আমাকে এখনো খুব চিঠি লেখে, অনেক সব উপদেশের কথা থাকে তাতে।'

'ভালো, ভালো।' পিঠ-চাপড়ানো মোলায়েম গলায় মৌলিনাথ জবাব দিলো। 'ও-বিষয়টায় বরাবরই তিনি পারদর্শী। তারপর—কেমন আছে সে?'

'ভালো আছে।' গীতা লক্ষ্য করলো 'তিনি'র বদলে 'সে' কথাটা, আর সেই সঙ্গে বলার সুর কেমন একটু বদলে গেলো। একটু নিমকি ভেঙে মুখে দিলো, সঙ্গে একটি মিষ্টি বাদাম, চুমুক দিলো স্মৃতিভরা চায়ের পেয়ালায়। কিন্তু ততক্ষণেও মৌলি যখন আর-কিছু বললো না,

তখন চোখ তুলে হালকা ক'রে জিগেস করলো, 'দিদির সঙ্গে শিগগির তোমার দেখা হয়নি বোধহয় ?'

'শিগগির ?' ঐটুকু ব'লেই মৌলি থামলো। তাকে মনে হ'লো অন্যমনস্ক, যেন বিষয়টাতে ঠিক মন দিচ্ছে না।

'দিদি তো ছুটিতে আসেন, আর তুমি তো তখন প্রায়ই আবার থাকো না।'

গীতা কি ভাবছে তার দিদিকে এড়াবার জন্যই ছুটিতে আমি বাইরে চ'লে যাই ? কত বাষ্প ঢুকেছে ওর মগজে, ওর সুন্দর মুখটি ম্লান ক'রে দেবার জন্য কত কল্পনার ষড়যন্ত্র ওকে ঘিরেছে ? টুক-টুক টোকা দিচ্ছে দরজায়—শুনতে চায় ও, জানতে চায়, আসতে চায় ও যাকে ভাবছে 'ভিতরে', অতীতটাকে সৃষ্টি ক'রে নিতে চায় আবার, তারই মধ্যে বাঁচতে চায়। বেচারা! তার দিদির জন্য ছুটিতে আমি থাকি না ? আ—যদি তা-ই, যদি তা-ই হ'তো! কাউকে এড়াতে চাই, কারো সঙ্গে পাছে দেখা হয় তাই পালিয়ে যাই—সে-রকম কোনো আশ্চর্য সম্ভাবনা দিগন্তে কোথাও জেগে থাকতো যদি! দেখা হয়নি ? তাও হয়েছে। প্রমাণ পেয়েছি উত্তরভারতীয় জলবায়ুর স্বাস্থ্যকরতার, প্রমাণ পেয়েছি সে ভুল বলেনি, তার কথাই ঠিক—তোমার কথাই সত্য হ'লো, চিত্রা। ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষি! কিন্তু আমি কি তার মুখের দিকে তাকিয়ে—তার প্রিব্র্যাকেফাস্ট-পাণ্ডুতাজয়ী এখনকার মেদচিক্কণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কি মনে-মনে বলতে পেরেছি, 'কী বোকাই আমি ছিলাম তখন!' ভগবান না করুন! ভগবান করুন এত বিজ্ঞ যেন কখনো আমি না হই যে রঙ্গমঞ্চে নায়ক আর নই ব'লেই দর্শকের আসনে ব'সেও একাত্ম হ'তে পারি না!

সবই আমরা ভুলে যাই—কিছুই আমরা ভুলি না। অতীত—কী আশ্চর্য এই যাকে আমরা অতীত বলি, প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে বর্তমানের স্রোতের মধ্যে—কোনো-একটি মুহূর্ত সেই মুহূর্তকালের বেশি দাঁড়িয়ে থাকবে না—অথচ কোথাও সব হ'য়ে-যাওয়ার একটা নিজস্ব সত্তাও আছে যেন, সেখান থেকে কিছুতেই তাকে নড়ানো যাবে না। যা ছিলো তাকে এখন দেখলে চিনতেই পারবো না, কিন্তু যা কোনো-একদিন ছিলো তা যেন চিরকাল ধ'রেই আছে। চিরকাল, চিত্রা, চিরকাল। আমি কি ভুলতে পারি—সেই তুমি যখন আমার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়েছিলে, সেই তোমার শরীরের স্পর্শ, বুকের উত্তাপ, তোমার সমস্ত শরীরের সৌরভে ভরা নিশ্বাসের উন্মাদনা! আমি কি ভুলতে পারি তোমার কথা—'তোমাকে ভালোবাসি, মৌলি!' আকাশ ভ'রে বাঁশি বেজে উঠলো, সে-বাঁশি আর থামলো না। 'ভালোবাসি!' কিন্তু সে তুমি নও, চিত্রা, সে তুমি নও—এ-কথাও তুমি ঠিক বলেছিলে। তোমার সঙ্গে দেখা না-হ'লে আর এসে যায় না আমার—তোমার সঙ্গে দেখা হ'লেও আর এসে যায় না, চিত্রা! তুমি—আমি—ও-সব কিছু না, খেলা, ছেলেমানুষি। কিন্তু এর পরেও আরো একটু কথা আছে যা তুমি বলোনি, বলতে পারোনি। আর তাই—যদিও তুমি অনেক দিয়েছো আমাকে, অনেক করেছো আমার জন্য, তবু এই ছেলেমানুষির চিকিৎসা আমার তোমার হাতে হ'লো না। সংসার ডাকলো তোমাকে, বাঁচলে তুমি সেখানে গিয়ে, জীবনের মৃন্ময় তাপ মুঠোর মধ্যে পেলে সেখানে—সেই একমুঠো জীবন, চিত্রা, যার অভ্যাসে, প্রথায়, দুটি-চারটি বিশ্বাস্য প্রতীকের আশ্চর্য বলশালিতায় আমাদের হাজার উতরোল ইচ্ছা যেন

মায়ের বুকে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে আমি—আমার মনে কোনো একটি ইচ্ছা আজও বেঁচে থাকে যদি, সে-ইচ্ছা শুধু ছেলেমানুষির, শুধু অফুরন্ত বার বোকা হবার, পাগল হবার! আর তাই তো আমাকে জীবন ভ'রে খুঁজে বেড়াতে হবে কে আমাকে আবার বলবে 'ভালোবাসি', যে আমাকে ভালোবাসে তাকে পাবো না জেনেও খুঁজে-খুঁজে পাগল হ'তে হবে চিরকাল।

মৌলির মনে পড়লো তার চায়ের পেয়ালা—তার প্রিয় পানীয় —এটা ভালোই যে এ-সব সহজলভ্য জড় বস্তুতেও কিছু ভালোবাসা ছড়িয়ে থাকে মানুষের। পেয়ালা হাতে তুলে বললো, 'বৃষ্টি থামলো, মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, ধ'রে এলো বোধহয়।'

'তোমাকে গাড়ি আনিয়ে দিতে হবে?'

'আমার যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছো, মনে হয়?'

'না,' মৌলি হাসলো। 'আমি বরং তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে এখনই যেয়ো না। আর-একটু বোসো। আরো দু-একটা কথা বলি তোমাকে।'

গীতা চোখ তুলে তাকালো, প্রায় ছাত্রীর মতোই একান্ত দৃষ্টিতে; তার মসৃণ শাদা কপালটির উপরে কুমারী সিঁথি সুন্দর দেখালো।

'কথাটা এই যে আমাদের, এই মানুষদের মাপে জগৎটা ঠিক তৈরি হয়নি। এই পৃথিবী—জগৎ—এটা বড্ড বড়ো, আমাদের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো এটা। ভেবে ছাখো এই জগৎ জুড়ে কত কিছু ব্যাপার চলছে অনুক্ষণ—তার কতটুকু আমরা নিতে পারি, পেতে পারি? একটা সহজ উদাহরণ নাও: পৃথিবীতে প্রতিদিন

সূর্যাস্ত হচ্ছে—আশ্চর্য, হৃদয়প্লাবী ঘটনা—কিন্তু কোনো মানুষ তার সমস্ত আয়ুষ্কালে ক-টা সূর্যাস্ত চোখে ছাখে, বলো তো? আর দেখলেও বা তার কতটুকু দেখতে পায়? কতক্ষণ দেখতে পারে? গ্যেটে বলেছিলেন, পনেরো মিনিটের বেশি না। হয়তো বাড়িয়েই বলেছিলেন। হয়তো পাঁচ মিনিটেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে অধিকাংশ মানুষ। যা প্রিয়, যা সুন্দর, যা পরম, তার দিকে বেশিক্ষণ মন দিতে পারি না আমরা, তার দিকে নিবিষ্ট হওয়া প্রায় অসম্ভব। ছোটো-ছোটো ইন্দ্রিয়ের দূত ছোট-ছোটো অভিজ্ঞতা এনে দেয় আমাদের—কতটুকু তাদের দৌড়, কত অল্প গিয়েই হাঁপিয়ে পড়ে তারা, তা কি সবচেয়ে দুঃসাহসী মানুষও উপলব্ধি করে না তারা-ভরা আকাশের দিকে অন্ধকারে তাকিয়ে? মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে অনেকটা তুমি জানতে পারো তা সত্যি; কিন্তু তাও তোমার নিজেরই মাপে অনেক, জগতের মাপে কিছুই না। যে-কোনো একটা বিষয় সম্পূর্ণ ক'রে জানতে হ'লে—শুধু তা-ই বা কেন, কোনো একটিমাত্র অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে হ'লে মানুষের সমস্ত জীবন যথেষ্ট নয়, গীতা। আর তাছাড়া, ঐ বুদ্ধি ব্যাপারটা অবাস্তর, বলতে পারো বাইরেকার কথা ওটা। আসল কথাটা—সেটা কী আমি জানি না; শুনেছি ঋষিরা জানেন—মেয়েরাও জানে আমার মনে হয়।'

পেয়ালার অবশিষ্ট চা আস্তে-আস্তে শেষ করলো মৌলি, তারপর আবার বললো:

'আর তাই আমরা এই পৃথিবীটাকে—জীবনটাকে—ছোটো-ছোটো টুকরো ক'রে ভাগ ক'রে নিই—নিতেই হয়, গীতা,

না-নিয়ে কোনো উপায় নেই শেষ পর্যন্ত। কিংবা থাকলেও সে-উপায় ভালো না, তাতে ভালো হয় না, হয়তো শুধু সর্বনাশের লাল বাতি জ্ব'লে ওঠে। হ্যাঁ গীতা, তা-ই ভালো—যার ভাগ্যে যেটুকু পড়লো সেই চিলতেটুকু নিয়ে খুশি হওয়া, তার বেশি সাহস না-করা—শুধু তা-ই নয়, তার বেশি কিছু হ'য়ে উঠতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া, ঠেকিয়ে রাখা, এড়িয়ে যাওয়া। কথাটা তোমার ভালো লাগছে না বুঝতে পারছি—এখন লাগবেও না—কিন্তু কোনো-একদিন—সে-দিন খুব দূরেও নয় হয়তো—তুমি ঠিক বুঝবে যে সম্মোহন ভাঙে না শুধু তথ্যের, প্রথার, পরিমিতির, তখন ঐ টুকরোটিকেই সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার শক্তিও তুমি পাবে নিজের মধ্যে। যে-সুন্দর সত্যি পর্যাপ্ত, তৃপ্তিকর—যা শুধু তৃষ্ণা বাড়িয়ে চ'লে যায় না—তাও শুধু ওখানেই আছে। একটু আগে তোমার দিদির কথা জিগেস করছিলে না? না, শিগগির দেখা হয়নি তার সঙ্গে, কিন্তু দেখা হয়েছে। আর তাকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম—বুঝেছি—যা-কিছু ব'লে-ব'লে এতক্ষণে তোমার ধৈর্যের পুঁজি উজোড় ক'রে এনেছি প্রায়। আমি তাকে সুন্দর দেখেছিলাম; নিজের ছোটো গণ্ডির মধ্যে একান্তে বাঁচতে পারা যে কী-রকম সুন্দর, তা তোমার দিদিকে দেখেই বুঝেছিলাম, গীতা।

'কিন্তু এটা পরের কথা। এর আগে অন্য একটা সময়—অন্য একটা অবস্থা যায় মানুষের। তখন তার মনে হয় যে সমস্ত পৃথিবীটাই তার, কোথাও তার বাধা নেই, একটিমাত্র ক্ষুদ্র জীবনে মহান জীবন বাঁচবার তার স্পর্ধা হয় তখন। সেটাকে বলতে পারো মনের ছেলেবেলা—ছেলেমানুষি—কিছুতেই যখন তৃপ্তি হয় না,

শান্তি হয় না—যা-কিছুই হোক মনে হয় আরো কিছু—অন্য কিছু কেন হ'লো না—আর সেই অন্য কিছু ঘটিয়ে তুলতে তার ইচ্ছাই শুধু যথেষ্ট মনে হয়। মধুর বলতে পারো সেই সময়টাকে—সেই প্রথম-ঘুমভাঙা ভোরবেলা, যখন আমরা স্বপ্নও দেখছি আবার রাস্তার আওয়াজও কানে আসছে, যখন আমরা স্বপ্নও দেখছি আবার স্বপ্নটাকেই ইচ্ছেমতো চালিয়ে নিচ্ছি যেন হঠাৎ-পাওয়া অদ্ভুত কোনো দৈব বলে। হ্যাঁ—মধুর হয়তো, কিন্তু সুখের না—অন্তত আমি তাকে সুখের বলবো না—আর তথ্য তাতে কম থাকে ব'লে তার জ্বালাযন্ত্রণার মজুরিও মেলে না সব সময়। সুখ এসে পৌঁছয় পরে—যখন বেলা বাড়ে, সোনালি আভা মুছে যায়, স্বপ্নের অলস বিছানা ছেড়ে স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা জলে নাইতে হয় যখন, যখন রান্না চড়ে, আপিশের ঘণ্টা বাজে ঘড়িতে—বেলা বাড়ে। তখন আমরা চিনতে পেরে সুখী হই, প্রামাণ্যকে বুঝতে শিখি—তখন থেকে পলে-পলে সুখী হ'তে শিখি আমরা, যার উপরে জীবনে আর শিক্ষা নেই। কেউ-কেউ থাকে কুঁড়ে, তারা দেরি না-ক'রে উঠতে পারে না; কেউ-কেউ তাদের দুপুর আলোতেও ভোরের স্বপ্ন ব'য়ে বেড়ায়—লোকে তাকে পাগল বলে। কিন্তু তুমি, গীতা—তোমার ঐ সুন্দর ক-টি আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিনের ভরপুর অঞ্জলি গ'লে-গ'লে ঝ'রে যাবে—এমন ভয় কল্পনাতেও তুমি স্থান দিয়ো না। তুমিও শিখবে একদিন, মেনে নিয়েই হারিয়ে দিতে পারবে; আর তখন—এই আজকের দিনে যা-কিছু নিয়ে তুমি জড়িয়ে আছো, সব ঠিক উচিত মূল্যই পাবে তখন; এই তোমার কবিতা নিয়ে মধুর খেলা, এই এখানে আমার কাছে ব'সে-ব'সে কত রকম ভাবনা নিয়ে ছেলেখেলা—'

'কী বললে? খেলা? ছেলেখেলা?'

'হ্যাঁ, গীতা, খেলা। কিন্তু তাই ব'লে অনর্থক নয়; জীবনেরই জন্য তৈরি হওয়ার উপায় এটা—কিন্তু উপায় মাত্র, অস্থায়ীরূপে প্রয়োজনীয়, সে-কথা ভুললে চলবে না। শিশু খেলতে-খেলতেই অভিজ্ঞ হয়, কিন্তু তাই ব'লে কি এমন সময় আসে না যখন তার অভিজ্ঞতার সে প্রমাণ চায় জগতের কাছে? তোমার মনের এখনকার ভাব আমি বেশ বুঝতে পারি। তোমার শাড়ির রং কারো চোখে ভালো লাগলে তোমার মনে হয় তোমাকে ছাপিয়ে শাড়িটাই তার চোখে পড়লো। তোমার কথা শুনে কেউ ভালো বললে তুমি সন্দেহ করো সে-কথা তোমার নিজের নয়। মনে-মনে নিজেকে যে-মূল্য দাও তুমি, বাইরের কাছে তা পাচ্ছো না ভেবে দুঃখ পাও। কিংবা হয়তো ভাবো—"এই শাড়ি, কথা—যা আভরণ, বিশেষণ, গুণ—তার বাইরে এমন কিছু কি নেই আমার মধ্যে, যাতে কোনো আয়োজনের কথাই ওঠে না—যা শুধু আছে ব'লেই মূল্যবান?" কিন্তু আমাদের মধ্যে যে-অংশটা সহজ,—বিনা-সাফাই, বিনা-জবাবদিহির অন্তরঙ্গ,—যেটা গ'ড়ে তোলা, ঘটিয়ে তোলা নয়,—সেটা কখনোই কোনো মূল্য পায় না যতক্ষণ না কেউ এসে তার মূল্য দেয়। সে-মূল্য আমরা সকলের কাছে, অনেকের কাছে চাই না, কোনো একজন বিশেষের কাছেই চাই। তোমাকে যে তোমার পূর্ণ মূল্য দেবে, সে-ও একদিন আসবে, গীতা।'

'হয়েছে তোমার? শেষ করেছো?' মৌলি চমকে উঠলো আওয়াজ শুনে—ঐ রকম ন্যাকড়া ছেঁড়ার মতো চাপা অথচ কর্কশ আওয়াজ গীতার গলা থেকে বেরোতে পারে সে ভাবেনি কখনো—আর এ কী আগুন-রং কখন তার মুখে জ'লে উঠলো! 'গীতা!'—তার দিকে হাত বাড়ালো মৌলি—'কী হয়েছে তোমার?' কিন্তু গীতা মাথা নেড়ে

উড়িয়ে দিলো ঐ উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, তার সামনের শূন্যটাকেই ঠেলে দিলো হাত দিয়ে। 'শেষ করেছো তুমি? আর কিছু তো বলবার নেই তোমার? তাহ'লে শোনো—আমার দু-একটা কথা শোনো এবার। তুমি তো অনেক বললে—জীবনের তত্ত্ব বোঝালে, মেয়েদের বিষয়ে মন্তব্য শোনালে, আমার বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণীও করলে দু-একটা। পণ্ডিত তুমি—চিন্তাশীল সুধীজন—কথা বলার অধিকার আছে তোমার। হ্যাঁ, কথা বলা—তোমার নিজের মনটাকে বাইরে বেশ মনোরম ক'রে ফুটিয়ে তোলা—তা পারো তুমি, সেটাই পেশা তোমার, সেটা তোমার "আসে", বেশ ভালোই আসে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐটুকুই! শুধু কথা! বোঝো না তুমি কিছুই, জানো না তুমি কিছুই; নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছো তুমি সারাক্ষণ, নিজেরই মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছো, তার' বাইরে কিছুই তোমার চোখে পড়ে না।' কথাগুলি ঝেঁকে-ঝেঁকে বের করলো গীতা, যেন তার গলার উপর তার বশ নেই আর—কখনো হঠাৎ চড়া পরদায় আবার কখনো এত নিচুতে যে প্রায় শোনাই যায় না; আর এই অসম স্বরেরই দৃশ্যমান ছবির মতো তার মুখের রঙেরও বদল হ'লো থেকে-থেকে—আগুন থেকে ছাই, পাংশু, পাংশু দুটি ঠোঁট কখনো নড়তে গিয়ে কেঁপে উঠলো, আবার সেই ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে থেকেই গনগনে তেতে উঠলো কখনো। 'না, কিছুই না! আমি নিজের মনে কী ভাবি আর না ভাবি তাও জানো তুমি? না, কিছুই জানো না! একটিমাত্র মানুষকে তুমি চেনো—অন্তত, চিনতে চাও—একটিমাত্র মানুষে তোমার মন আছে: সে তুমি নিজে। নিজের মনেই অন্যদের তুমি ভাঙো গড়ো—কল্পনার কারিগরি তোমার—তা-ই নিয়ে বিলাস করো ব'সে-ব'সে অন্যদের তাতে কিছুই এসে যায় না। অন্যকে দেখতে পাওয়া—মনে-মনে

বানানো কেউ নয়, উপন্যাসের চরিত্র কেউ নয়—জ্যান্ত কোনো মানুষকে ঠিক দেখতে পাওয়া—সেই দৃষ্টি যদি থাকতো তোমার—'এখানে হঠাৎ গীতার গলা ভেঙে গেলো—'তাহ'লে আমাকে আজ পরিপাটি যে-সার্মনটি তুমি শোনালে তা নিজের উপরেই প্রয়োগ করার বুদ্ধি কি তোমার হ'তো না? বুদ্ধি—তোমার মতে বাজে জিনিশ—তোমার মধ্যে তার অভাব আছে ব'লে গর্ব করো তুমি—আর তাই বোধহয় তুমি যা বলো নিজেই তার মানে বোঝো না, বলতে ভালো লাগে ব'লেই বলো—মুখে তোমার কথা জোগায় তাই শুধু ব'লে যাও। কিন্তু এই একটা কথা আজ শুনে রাখো আমার মুখে—' গীতার চোখের হিরের দুটি ফোঁটা থেকে হঠাৎ যেন লাল ফুলকি ঠিকরে বেরোলো—'যে তোমার ঐ মনোহরণ মাকড়শার জালে কাউকে তুমি বাঁধতে পারবে না শেষ পর্যন্ত, কাউকে তুমি কাছে পাবে না কোনোদিন। অনেক কীর্তি রাখবে তুমি, লোকের মুখে নাম থাকবে তোমার, সভাস্থলে আসন পাবে উঁচুতে—কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে এসে বুক শুকিয়ে তিলে-তিলে মরবে তুমি;—তোমার সব আশা, ইচ্ছা, তোমার শরীরের রক্ত মাংস মজ্জা—সব ঐ কথাতেই পর্যবসিত হবে, ঐ তোমার কথার ছায়ালোকে—যার গোলকধাঁধাঁর অলিতে-গলিতে নিজেকেই তুমি হারিয়ে ফেলবে একদিন!'

ব'লে গীতা উঠে দাঁড়ালো, কোনোদিকে না তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

মৌলি উঠে জানলার ধারে দাঁড়ালো। বৃষ্টি আর নেই; মেঘ চুঁইয়ে জ্যোছনা পড়েছে ভিজে মাঠে। এরই মধ্যে ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়েছেন সুবোধবাবু—মোটা মানুষটির দুলে-দুলে চলা দেখে মৌলি চিনলো—রোজ সন্ধ্যায় প্রসন্ন সিংহের তাসের আড্ডায় তাঁর যাওয়া

চাই। পাশের পুব-দিক-ঢাকা দোতলা বাড়ির রেডিওর গান কানে এলো, একটু শুনলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে; তারপর জানলা থেকে স'রে এসে বসলো—আরামচেয়ারে আর নয়, লেখার টেবিলেই সোজা হ'য়ে বসলো। টেবিলের উপর না-খোলা দুটো খামের দিকে তাকালো একবার. পকেট থেকে বের করলো বিদ্যুৎ সেনের চিঠিটা। বেশ লিখেছে কিন্তু—পড়তে-পড়তেই তার জবাবেরও কয়েকটা লাইন—কয়েকটি ছিপছিপে শ্রবণসুভগ বাক্য—তার মনের উপর ভেসে উঠলো। পড়া শেষ ক'রে ফিরে তাকিয়ে দেখলো মা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত মুখে তার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে অবাক হ'লো না—মা-কে সে আশাই করছিলো মনে-মনে।

মা বললেন, 'গীতার কী হয়েছে রে?'

'কিছু হয়েছে নাকি?'

'তুই ওকে কী বলেছিস?'

'অনেক কথাই বলেছি।'

'বারান্দা দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ আমার চোখে পড়লো। অন্ধকারে ব'সে আছে আমার ঘরে। আলো জ্বেলে দেখি—'

'কাঁদছিলো?' জিগেস করলো মৌলি।

'তুই কেমন মানুষ বল তো!' মা আর-কিছু বললেন না।

'তুমি ওর সঙ্গে কথা বললে?'

'বলবো আর কী—সবই তো বুঝি। এ-রকম ক'রে আর চলতে পারে না, মৌলি।'

'আমিও তা-ই ভাবছিলাম। আমার সংসর্গ থেকে ওকে দূরে সরানো দরকার।'

'মানে?'

'যা বললাম তা-ই। আমার প্রভাব ভালো হচ্ছে না ওর উপর। ওর সুখের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছি আমি।'

'বলছিস কী তুই?' মা চোখ বড়ো ক'রে ছেলের দিকে তাকালেন। 'ওর সুখের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিস—তুই!'

'দেখছি তো তা-ই। এ-রকম কিছু-একটা হবে, অনেকদিন থেকেই ভয় করছিলাম মনে-মনে।'

'তুই কী বলছিস আমি বুঝতে পারছি না, মৌলি। যেটা সবচেয়ে সুখের, যার চাইতে সুখের কিছু আর হ'তে পারে না—ওর মা, বাবা, আমি নিজে—আমরা সবাই এতদিন ধ'রে যা আশা করছি—'

'তোমরা আশা করছো? কিন্তু—'

'এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই, মৌলি। যা পাঁচজনে দ্যাখে—রূপ, গুণ, বিদ্যেবুদ্ধি—ও-সব ছেড়েই দে, ওর নিজের মন আজ কোনদিকে ছুটেছে তা তো তুই জানিস। এর পরেও কি অন্য কোনো কথা থাকে?'

'অসম্ভব, মা!' মৌলি একটু বিষণ্ন ক'রে হাসলো।

'কোনটাকে অসম্ভব বলছিস?'

'তোমরা যা ভাবছো তা হবার নয়।'

মা এক পা পিছনে সরলেন, যেন ছেলের মুখ ভালো ক'রে দেখবেন ব'লে। একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভালো ক'রে ভেবে কথা বল। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা চলে না, মৌলি।'

'আমি কোনো খেলা করিনি, মা,' মৌলি মিনতির সুরে বললো। 'আমাকে কেন বলছো?'

'কাকে বলবো তবে? সত্যি ক'রে বল, তুই কি ওকে ভালোবাসিস না?'

'ভালোবাসি না? ঐটুকু থেকে দেখছি ওকে—আমাদের গীতা—ওকে ভালোবাসি না?'

'ঐটুকু', 'আমাদের গীতা'—এই কথাগুলি বেসুরো লাগলো মায়ের কানে। মুখে বললেন, 'ওকে প্রথম যখন দেখেছিলি তুইও তখন "ঐটুকু"ই ছিলি। আজ তোমরা দু-জনেই যথেষ্ট বড়ো হয়েছো।' একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, 'এটাই ঠিক সময়, আর দেরি করা তোমাদের উচিত না।'

'না, মা, আর দেরি করবো না। আমি চ'লে যাবো এখান থেকে।'

'নিশ্চয়ই—যেখানে তোর ভালো লাগে—যা তোদের ভালো লাগে। বিয়েটা হ'য়ে যাক, তারপর বিলেত যেতে চাস তাই যাবি তোরা। আমি যেমন ক'রে পারি পাঠাবো।'

'থাক, মা,' ক্লান্ত সুরে জবাব দিলো মৌলি, 'এ-সব কথা থাক।'

'বিয়ে যে তুই করবি না তা তো নয়?'

'আমি কি সে-কথা বলেছি?'

'তবে? তুই আর গীতা—এর সঙ্গে তুলনা হয় নাকি অন্য কিছুর? এ-রকম বন্ধু, স্বজন, সর্ববিষয়ে ওর মতো সহায়—সারা জীবনে আর কি তুই পাবি ভেবেছিস?'

'কতটা পেলাম, সেই লাভের হিশেব ওঠে কিসে। বিয়েটা কি ব্যবসা?'

'দেয়া-নেয়া নিয়েই তো মানুষের জীবন। তুই বল, আমাকে বুঝিয়ে বল, এতে তোর আপত্তি কোথায়।'

'বলতে পারবো না, মা। বোঝাতে পারবো না। ঠিক—ঠিক ও-রকম ক'রে ওকে আমার লাগেনি কোনোদিন। ওকে আমার ছেলেমানুষ লাগে। ওকে আমার—বোনের মতো লাগে, মা।'

'বোন!' মার শীর্ণ ঠোঁটে বিদ্রূপের ছটা ঝিলিক দিলো। 'ও-সব বাজে কথা মুখে আনিস না, মৌলি!' তারপর কাছে এসে, মৌলির চেয়ারের হাতলে এক হাত রেখে বেদনা-ভরা নরম গলায় বললেন, 'আমার কথা শোন। আমার এই একটা কথা রাখ। বাজে কথা ব'লে—বাজে কথা ভেবে—ওর জীবনটা তুই ব্যর্থ ক'রে দিস না।'

'তুমি জানো না, মা, ওকে বাঁচিয়ে দিলাম। ওর জীবন প্রায় ব্যর্থ হ'তেই চলেছিলো—কিন্তু আর ভয় থাকলো না।'

মা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলেন ছেলের দিকে। তাঁর নিষ্প্রভ চোখের উপরে-নিচে বয়সের রেখা গভীর দেখালো। একটু পরে বললেন, 'কিন্তু তোর জীবন? তোর নিজের কথা একবার ভাবিস? আমি আর ক-দিন। আর এখনই আমি কতটুকু করতে পারি তোকে। গীতাকে তোর পাশে দেখলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম।'

মৌলির একটু অপমান লাগলো কথাটায়। মা তাকে উত্তরাধিকার-সূত্রে রেখে যেতে চান গীতার হাতে। তার 'দেখাশোনো করা'র কেউ একজন চাই—নয়তো সে কি বাঁচতে পারে, বেচারা! একটু হেসে বললো, 'আমার জন্য ভেবো না, মা। আমি ঠিক আছি। ঠিক আছে সব।'

'শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকলেই হ'লো,' ব'লে মা নিশ্বাস ফেললেন। 'একবার আসবি নাকি ও-ঘরে?'

'থাক। আমি আর গিয়ে কী করবো।'

'গাড়ি আনতে পাঠিয়েছি। তুই যাবি ওর সঙ্গে?'

'রাখুই যাক,' ব'লে মৌলি হাতে তুলে নিলো তার সেদিনের ডাকের অন্যান্য চিঠিপত্র।

মা নিঃশব্দে চ'লে গেলেন। মৌলি তার পাব্লিশারের খাম খুললো। তার শেষ বইটা বিক্রি হচ্ছে না তেমন—ছোটোগল্পের চাহিদা নেই—তবে সে যদি কোনো উপন্যাসে হাত দিয়ে থাকে, কিংবা যদি শিগগির দেয়···মৌলি রেখে দিলো চিঠি, ওটা যেন তার নিজেরই অজান্তে খ'সে পড়লো তার হাত থেকে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরে তাকালো, নতুন-জেগে-ওঠা রাত্রির দিকে পাঠিয়ে দিলো চোখ। এতক্ষণে আরো একটু হালকা হয়েছে মেঘ—মৌলি ব'সে-ব'সেই জানলা দিয়ে দেখতে পেলো—একটি তারা, যেন স্বর্গের কোনো বৃষ্টিবিন্দু, জ্বলজ্বল করছে তার চোখের সামনে। চাপা চাঁদের ফ্যাকাশে আলোয় নীল দেখাচ্ছে রাত্রিটাকে, সবুজের আমেজ লাগা ভিজে-ভিজে নীলচে-মতো; মাঠের মধ্যে তাকালে—যদিও খানিক পরেই রেল-লাইন, রেল-স্টেশন, চিলকোঠার ত্রিভুজ-তোলা শহর—তবু কেমন শান্তিভরা মস্ত একটা ঝাঁ-ঝাঁ দূরের স্পর্শের মতো মনে হয়। আশ্চর্য বিস্মৃতিপ্রবণ প্রকৃতি, আশ্চর্য তার অম্লান চপলতা। একটু আগেকার হুলুস্থুল—সেই উত্তাল আকাশ—কোথায় গেলো সব? মৌলি তাকিয়ে দেখলো—দেখলো, লাল দুটো চোখ জ্বেলে এগিয়ে আসছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়োয়ানদের দাঁতে-জিভ-চেপে-বের-করা গাড়ি থামাবার চেনা শব্দে হঠাৎ কেমন মুচড়ে উঠলো তার বুকের মধ্যে। 'এর মানে কি এই হ'লো যে ও আর আসবে না?' আর তারপর

শুনলো রওনা হবার চাবুকের শিষ—রাখু ব'সে আছে উপরে—টক-টক ঘোড়ার খুর বটগাছের মোড়ের কাছে মিলিয়ে গেলো। না, ঝড়বৃষ্টি সবই হ'য়ে গেলো, কিন্তু বটগাছটা মরতে পারেনি বাজ প'ড়ে—ঐ তো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে আবছা জ্যোছনায়, তার লক্ষ পাতা থেকে লক্ষ-লক্ষ জলের ফোঁটা টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ছে—সারা রাত ধ'রে ঝরবে—মৌলি কানে না-শুনেও মনে-মনে সেই শব্দ শুনলো। এই গাছ কেটে ফেলবে ওরা; বোবা হবে মাঠ, বিধবা হবে দৃষ্টি, বর্ষার তানপুরোর তার ছিঁড়ে যাবে। একটা নিশ্বাস উঠে এলো মৌলির বুকের ভিতর থেকে। 'আমি—আমিও আর এখানে থাকবো না।'

৩

শীতের শিকল

১

কে আমাকে ছুঁয়ে গেলো আমার স্বপ্নে, হালকাছোঁয়া হাওয়ার মতো স্বপ্নে, পায়রা-পায়ে চলচপল ঝিরিঝিরোজ্জ্বল ভোরের স্বপ্নে! কতকাল পর ফিরে-পাওয়া স্বপ্ন আমার: কে তুমি? এই তো তুমি ছিলে এখানে, আমার পাশে—'পাশে' বললে কিছুই বলা হয় না—মিশে গিয়েছিলে আমার মধ্যে, গ'লে-গ'লে ঝরেছিলে আমার সত্তায়, যেমন শরতের দুটি টুকরো মেঘ পরস্পরে মিশে গিয়ে হঠাৎ কিছু বৃষ্টি ঝরিয়ে ফুরিয়ে যায়। এই তো এইমাত্র। কোথা থেকে নিয়ে এলে ঐ বাহু, অপ্সরীর মতো উজ্জ্বল, রাশি-রাশি ফুলের মতো স্পর্শময়, অথচ যেন স্পর্শহীন, স্পর্শের অতীত—না, আলিঙ্গন তাকে বলা যায় না, কেননা শরীরের কোনো বাধাই যেন নেই আর—আমার ভিতর দিয়ে বেপথুমান ব'য়ে গেলে তুমি, আমি তোমাকে স্বপ্নের মতো শুষে নিলাম সেই আশ্চর্য-সহজ পূর্ণমিলনে, কোনো বাসরশয্যায় কখনো যা সম্ভব নয়। আবার অমনি ক'রেই ফাঁকি দিলে আমাকে, লোকোত্তরা ক্ষণিকা আমার, স্বর্গমর্ত্যের অসম্ভব সেতুবন্ধে মুহূর্তের বেশি দাঁড়ালে না;—যে-মুহূর্তে আমি তোমাকে জানলাম সে-মুহূর্তেই তোমার শেষ হ'লো। আর এখন—এখনো—আমাকে ঘিরে আছে সেই সৌরভ, নিশ্বাস, শীতের ভোরে ঘুম-ভাঙা বিছানার কনকনে উষ্ণতার আবেশে ফেলে গেলে শুধু চ'লে যাওয়ার নিশ্বাসটুকু তোমার। নিষ্ঠুর তুমি, সকরুণ তুমি। স্পর্শে ধরা দিলে না—নাকি সইতে পারলে না স্পর্শ—স্থূল সেই যোগসূত্র দেহীদের!—কিন্তু আমার চোখ আমার চোখের লক্ষ্য এড়াতে তুমি পারলে না, আমার দৃষ্টি তোমাকে ধ'রে ফেললো,

৯

মোহিনী! না কি তুমি—তুমিই আমাকে ধ'রে ফেলেছিলে, ধ'রে রেখেছিলে অন্তহীন, মায়াবী একটি মুহূর্ত ভ'রে—না কি তুমিই আমাকে খুঁজতে এসেছিলে অচেতনের বীজাণুব্যাকুল অন্ধকারে, খুঁজে বের করেছিলে আমাকে—স্বপ্নের সুরঙ্গ-পথে নেমে এসেছিলে, বাসনার হাজার সিঁড়ি উঠে এসেছিলে—আমারই সঙ্গে দেখা হবে ব'লে! স্পষ্ট দেখলাম তোমাকে। যেমন সিনেমার পরদা কালো হ'য়ে গিয়ে তখনই আবার আলো হ'য়ে ওঠে—না, সে-রকম নয়; যেমন যবনিকা স'রে যায় ঢেউয়ের মতো দুই দিকে, আর পদ্মের মতো ফুটে ওঠে নটী—না, সে-রকমও নয়;—ঠিক বলতে পারবো না কী-রকম—মনে হ'লো আমার ঘুম ছিঁড়ে গেলো, ভাঁজে-ভাঁজে ঝ'রে পড়লো, ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো—যেন কালো রঙের পটভূমির উপর সম্পূর্ণ ক'রে আঁকা একটি মুখ। আর তখন আমি বুঝলাম, জানলাম—আমার স্বপ্নের আধেয়বস্তু কী, আমার ঘুমের কৌটোয় কোন কৌস্তুভ লুকোনো আছে। মুখটি স্থির থাকলো আমার সামনে—বতিচেলি-মুখ, পাণ্ডুর, বিষণ্ণ, অথচ পরিষ্কার দুটি কালো ভুরুতে কৌতুকের ইঙ্গিত যেন, অথচ পুষ্ট দুটি সরস ঠোঁটে একটু যেন প্রলোভনের আভাস। চোখে চোখ রাখলাম: গম্বুজের মতো খোঁপা নেড়ে হাসলো সে, তার চোখের তারা হিরের মতো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। কে তুমি?

অন্ধকারে শব্দ শুনলো মৌলিনাথ। একটু পরে আলো জ্ব'লে উঠলো; তার শিয়রে রাখা টেবল-ল্যাম্পের সীমিত আলো ফুটিয়ে তুললো এক চিলতে দেয়াল, জানলার ধুলো-পড়া কাচ, পাতার ফাঁকে পোস্টকার্ড-গোঁজা বই, দিশি নেটের মশারির একটা অংশ। ঝলক দিলো চায়ের বাসনে।

'বাবু!'

অস্ফুট আওয়াজ ক'রে মৌলিনাথ জানিয়ে দিলো তার ঘুম ভেঙেছে।

'চা দিলাম।' ব'লে আগন্তুক—ঠিক আগন্তুক নয়, মৌলিনাথের পরিচারক সে—ছিটের শার্ট গায়ে ছিপছিপে মানুষটি—শিয়রের দিকে স'রে এলো। আধো আলোয় আবছা দেখা গেলো—ঠিক দেখা গেলো বললে ভুল হয়, কেননা আলো তার মুখে পড়েনি, তাছাড়া মশারির তলায় আধো চোখ বুজে শুয়ে কতটুকুই বা দেখতে পাওয়া সম্ভব—না, মৌলি ঠিক চোখ দিয়ে দেখলো না, কিন্তু শুয়ে-শুয়ে মনে-মনেই দেখলো তার সেবকের অভ্যস্ত মুখ—হলদে-ঘেঁষা রঙের উপর লালচে দুটি মদির ভাবের চোখ বসানো—এই ভোরবেলায় আরো বেশি লালচে দেখায়—পাৎলা সরু বিনয়ী গোঁফ ঠোঁট ছাড়িয়ে একটুখানি ঝুলে আছে। সেই গোঁফের বিষণ্ণ প্রান্তটুকুও দেখতে পেলো মৌলি, দেখতে পেলো মনে-মনে, মনের চোখে, তার রাতশেষের ঘুম-ভাঙা উষ্ণতায় শিথিলস্নায়ু শুয়ে-শুয়ে। —এরই মধ্যে অন্য ছবি! এরই মধ্যে, এই মুহূর্তমাত্রের ব্যবধানেই অন্য ছবি ভেসে উঠেছে তার স্বপ্ন পেরিয়ে; তার কতকাল পর ফিরে-পাওয়া রত্নটিকে এখনই এসে ঢেকে দিচ্ছে প্রতিদিনের প্রতিবিম্ব, উপস্থিতের অভিজ্ঞান, মৃদু, বৈধ, বিশ্বাসযোগ্য চিত্ররূপ!

মৌলি একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বললো, 'ঠিক আছে, প্রদীপ।'

প্রদীপ—কুলপ্রদীপ তার নাম—মশারির সামনের দিকটা তুলে দিয়ে চ'লে গেলো। মৌলি লেপের তলায় পায়ে পা ঘষলো—যেন আবার একা হবার আরামটুকুর প্রমাণস্বরূপ—তারপর পাশ ফিরলো বিছানায়। দেয়ালের দিকে ফিরলো সে, আলোর উল্টো দিকে—সেদিকে মশারিটাও ফেলা আছে এখনো—যেন এই ছায়াচ্ছন্নতায়, আর দেয়ালের আর

মশারির আশ্রয়ে, একটু বেশি নির্বিঘ্ন হবে তার স্বপ্ন, একটু কম আক্রমণীয় হবে। হাঁটু মুড়ে শুলো, একটি হাত রাখলো হাঁটুর ফাঁকে, অন্যটি গালের তলায়; চোখ বুজে, অপেক্ষমান তপ্ত পানীয় উপেক্ষা ক'রে, যেন নতুন ক'রে ঘুমিয়ে পড়ার আয়োজন করলো।

কিন্তু না, স্বপ্ন আর ফিরবে না, তার স্মৃতিও মিলিয়ে গেলো এতক্ষণে—না কি জমা হ'লো অচেতনের সেই মঞ্জুষায়, যার সম্পদ সুদে খাটিয়েই সমস্ত কিছু ক'রে যাই আমরা, কিন্তু যার চাবি নিজেদের হাতে নেই আমাদের? তাই তো বিদায় বলবো না; আছো তুমি, থাকো তুমি, জানি তোমাকে হারাতে পারি না কোনোদিন। রেশ দাও, আরো একটু রেশ দাও, তোমার ফেলে-যাওয়া নিশ্বাসে লীন ক'রে দাও আমাকে ঘুমের কোমলতম প্রান্তটুকুতে অবশ ক'রে দাও। সেই ঘুম ভেঙে ঘুমিয়ে থাকার স্বরাজ, স্বপ্নের উপর ইচ্ছার যেন প্রভুত্ব, স্বপ্নের নীল জল থেকে সেই অধৈর্যহীন, মদির উঠে আসা! ধীরে ধীরে: লম্বা দিন সামনে প'ড়ে আছে, এটুকু আর কতটুকু সময়। তার ছেলেবেলায়—যৌবনে—এই ঘুম ভাঙার মুহূর্ত ক-টি নিয়ে স্বেচ্ছাচারী কত খেলাই খেলেছে সে। কত প্রিয় নামে ডেকেছে একে, একে বলেছে শুভক্ষণ, কবিতার জন্মক্ষণ, প্রেরণার দৈব লগ্ন, যখন মানুষ—ঘুম আর জাগরণের সীমান্ত-রেখায় স্পন্দমান কোনো সত্তা—হঠাৎ কখনো বুদ্ধি ছাড়িয়ে বিবেক পেরিয়ে চ'লে যায়, ফিরে পায় মুহূর্তের জন্য তার আদিম বোধি, যখন সাধারণ মানুষও বোধিসত্ত্ব হয় মুহূর্তের জন্য! হ্যাঁ, ছিলো তখন, এ-বিষয়ে বিশেষ একটু প্রতিভাই ছিলো তার, সোনালি-নরম অলস হয়ে ঘুমের উপর ভেসে থাকায়। সেই একটি শক্তি সে হারিয়েছে, সেই একটি অভিজ্ঞতা চ'লে গেছে তার পরিধির বাইরে। তাহ'লে—মৌলি

শোবার ভঙ্গি বদল করলো, মাথার নিচে দু-হাত রেখে টান করলো শরীরটাকে।

না, ও-রকম আর পারে না এখন, আধো-ঘুমের আবেশে আর মগ্ন হ'তে পারে না। তার ঘুম আর জাগরণের মধ্যে ব্যবধান খুব ক'মে গেছে আজকাল—বলতে গেলে কিছুই নেই—যে-মুহূর্তে তার ঘুম ভাঙলো সে-মুহূর্তেই সে পূর্ণ সজাগ। যে-মুহূর্তে তার ঘুম ভাঙলো সে-মুহূর্তেই—হ্যাঁ, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চলতে শুরু করে চাকা—মগজের কলকব্জা তার; ভাবতে শুরু করে আগের দিন যেখানে থেমেছিলো ঠিক সেখান থেকেই, যেন মাঝখানে ঘুমের বিরতি ঘটেইনি। ভাবে—তার কাজের কথাই ভাবে অবশ্য, যে-সব এখন হাতে আছে আর অন্য যে-সব মনের মধ্যেই আছে এখনো; ভাবে শব্দ, শব্দযোজনা, বাক্য, বাক্যাংশ; ভাবে ছন্দ, রূপ, রূপকল্প; ভাবে ঘটনা, চরিত্র, অনুভূতি—অনুভূতি প্রকাশ করতে হ'লে তারও বিষয়ে ভাবতে হয়—আর কখনো-কখনো এমন কিছুও ভাবে নিজেই যার নাম জানে না। এই ভাবেই ভোর হয় তার রাত্রি, আরম্ভ হয় তার দিন—ঠিক সুখে নয়, আরামে নয়, যেন কিসের অনিশ্চয়তায়; ভাষার সঙ্গে ভাবনার এই বিরতিহীন অসম যুদ্ধে সেদিন ঠিক ল'ড়ে উঠতে পারবে কিনা, যেন তারই অনিশ্চয়তায়। আজও তার ব্যতিক্রম হ'লো না।

আবার পাশ ফিরলো মৌলি, স্পষ্ট ক'রে চোখ মেললো। আলোর দিকে এবার, দিনের দিকে, দিনের ভূমিকাস্বরূপ প্রথম পেয়ালা চায়ের দিকে। বালিশে কনুই রেখে অর্ধেক উঠে ব'সে চা ঢাললো; ক্রুশেন সল্টটা বেশি ক'রেই নিলো একটু। হ্যাঁ, এবারেও ঠিক জানান দিয়েছে, শীতের প্রথম সাড়া পেয়েই তার আঙুলে—ডান হাতের অনামিকায়

ছোট্ট একটু বাতের ছোঁয়া—বেশ সম্ভ্রান্ত গোছের ব্যাপার, একটু গর্ব ক'রেই বলার মতো—কিন্তু ভাগ্যে ও-আঙুলটা লেখার সময় কাজে লাগে না। শুয়ে-শুয়েই চুমুক দিলো চায়ে, পেয়ালাটি শেষ হওয়ামাত্র বিছানা ছেড়ে নামলো।

অন্ধকার কাটেনি তখনো। টেবল-ল্যাম্পের সংকীর্ণ সীমার বাইরে প'ড়ে আছে অর্ধেক ঘর। আবছা দেখা যাচ্ছে লেখার টেবিল, দেয়াল জুড়ে বইয়ের শেলফ, আলনায় ঝুলন্ত জামাকাপড়। মৌলি স'রে এলো আবছায়ায়, একটু দূরে একটা খোলা জানলার ধারে দাঁড়ালো। হিম ভোর স্পর্শ করলো তার মুখ; কেঁপে উঠে আলোয়ান তুলে নিলো চেয়ারের পিঠ থেকে, গায়ে জড়িয়ে বসলো তার লেখার টেবিলে। যেন স্থায়ীভাবে বসলো—তার নিজেরই তা-ই মনে হলো—কিন্তু ওটা অবশ্য ভান, কিংবা অভ্যাস—বলা যেতে পারে রিফ্লেক্স—ঐ টেবিলটার সামনে বসলেই তার এমন ভাব হ'য়ে যায় যেন শিগগির আর উঠবে না। আসলে অবশ্য উঠতে হবে একটু পরেই—কেননা নিত্যকর্মের পারম্পর্য আছে, আছে বাথরুমের বিবিধ প্রাথমিক অনুষ্ঠান। ও-সব—ও-সব বেশ ভালোই লাগে মৌলির, ভাবতেও ভালো লাগে। দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, স্নান—ও-সবে কোথায় একটা অনাড়ম্বর সান্ত্বনা আছে, একটুও পরিশ্রম না-ক'রে প্রয়োজনীয় কিছু ক'রে ওঠার আরাম অন্তত একবার ক'রে পাওয়াই যায় দিনের মধ্যে। কিন্তু তারও একটু দেরি আছে আপাতত। আলো ফুটুক।

একটি সিগারেট ধরালো, জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। এ-জানলাটা খুলে শোয় রাত্রে—বিছানা থেকে দূরে এটা—ঘরের

মধ্যিখানটা জুড়ে আছে তার লেখার টেবিল—কাগজ থেকে মাঝে-মাঝে চোখ তুলে এই জানলা দিয়ে দেখতে পায় একটা দেঁতো দেয়াল, সিনেমার পস্টার-মারা ডাস্টবিন, আর—এই 'অন্ধ' গলিটা নেহাৎই এখানে শেষ হয়েছে ব'লে—এক টুকরো পোড়ো জমিতে কয়েক কুচি দুর্বল কিন্তু দুর্দমনীয় ঘাস। আপাতত অবশ্য অন্য ছবি, রাত্রির যবনিকা ওঠেনি এখনো; এখন দেখা যাচ্ছে—প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না বাইরে, শুধু ঐ গ্যাসের বাতিটা কুয়াশা-মোড়া ভাবপ্রবণ চেহারা ক'রে ঠিক জানলার বাইরে জ্বলছে। পুবের জানলা এটা;—কিন্তু 'পুব' কথাটার সত্যি কোনো অর্থ নেই এখানে, ওটা বলতে হয় ব'লেই বলা, বুদ্ধির একটা সংস্কার মাত্র, বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ একটা ধারণা—কেননা এখানে, এই বাগবাজারে গলির মধ্যে একতলায়, 'পুব' 'পশ্চিম' ইত্যাদির সব সংজ্ঞা যেন হারিয়ে যায়, কোনোটারই স্বাতন্ত্র্য ঠিক বোঝা যায় না; যে-কোনো ঋতুতে, এবং দিনের প্রায় যে-কোনো সময়ে, সব ক-টা দিকই এক ব'লে মনে হয়। তবু—ভাষার ঐ প্রথাটুকুরও মূল্য আছে; অন্তত ভাবতে ভালো লাগে যে এটাই পুব দিক এবং এ-দিকেই সূর্য ওঠে।

ঐ তো কেঁপে উঠলো পরদা। বদল হচ্ছে দৃশ্যের, বেরিয়ে আসছে আশে-পাশের দুটো-তিনটে বাড়ি—তার বেশি আর চোখ চলে না—আলো জ্বলছে কোথাও কোনো রান্নাঘরে, উনুন-ধরানো ধোঁয়ার গন্ধ এখানে ব'সেও পাওয়া যায়। আ, গন্ধ! ধোঁয়ার গন্ধ, ধুলোর গন্ধ, ভিস্তির জলের গন্ধ; একটু ভিজে, একটু পচা, একটু দম-আটকানো, কিন্তু মোটের উপর মিষ্টি এবং আদরে ভরা গন্ধ এই ভোরবেলার! [illegible] আঁধার গন্ধ বাগবাজারের! দশ বছর ধ'রে নিশ্বাসে নিচ্ছে এই গন্ধ, রোজই তবু চমক লাগে। মনে হয় ওটা অদ্ভুত, অচেনা,

বৈদেশিক; মনে প'ড়ে যায় এখানকার সে স্থানীয় নয়, এতদিনের বসবাসেও মেলাতে পারেনি নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে। মেলাবার কথাই অবশ্য ওঠে না—আর ওঠে না ব'লেই এর মূল্য। এই দশ বছরের মধ্যে কতবার ভেবেছে বাসা-বদলের কথা—বন্ধুরাও তা-ই পরামর্শ দিয়েছে—শহরের দক্ষিণ পাড়ায় কোথাও, ছোট্ট ছিমছাম আধুনিক ফ্ল্যাটে—যেখানে আছে বারান্দা, বাথরুমে ঝর্না, আছে—এমনকি—ফুটপাতে গাছের সারি, এবং একটুমাত্র দূরে গেলেই রীতিমতো জোনাক-জ্বলা ঝোপঝাড়। ভেবেছে, কিন্তু হ'য়ে ওঠেনি—না কি তেমন ক'রে ভাবেইনি কখনো, না কি সত্যি কখনো যেতেই চায়নি এই একতলার ঘর, কলকাতায় তার প্রথম এই বাসা ছেড়ে? এর কারণ কি জাড্য—ইনার্শিয়া—আমরা যাকে বুদ্ধির বিরোধী ভেবে নিন্দে ক'রে থাকি অনেক সময়, কিন্তু আসলে যেটা প্রাণশক্তি ছাড়া কিছুই না, প্রাণশক্তি, লাইফ-ফোর্স—সেই আশ্চর্য অবিরোধী শক্তি, যার প্রভাবে দিনের পর দিন বেঁচে থাকার প্রেরণা পাই আমরা? শুধু তা-ই? না, এতে তার চেতন মনের কথাও আছে; এটা তার সুচিন্তিত নির্বাচন। কলকাতায় প্রথম এসে ইচ্ছে ক'রেই সে বাসা নিয়েছিলো এখানে—দেখে পছন্দ করেছিলো; এর ভিন্নতা, এর চরিত্র, এর প্রতিতুলনার সৌষ্ঠব দেখেই পছন্দ করেছিলো। আর তারপর থেকে এই বাগবাজারকেই সে ভালোবেসেছে—হ্যাঁ, এও একরকম ভালোবাসা—সেটা তার বিরোধী ব'লেই, প্রতিকূল ব'লেই, তার স্বভাবের, অভ্যাসের, তার সমস্ত সাহিত্যিক-মানবিক শিক্ষাদীক্ষার পরিপন্থী ব'লেই।

সে—জীবনের অনেকগুলি বছর যে যত্নলালিত প্রশ্রয়ের মধ্যে কাটিয়েছে, আবাল্য যার পরিবেশ ছিলো বলতে গেলে তারই ইচ্ছার

ছায়ামাত্র, অথচ লেখা প'ড়ে যাকে বিপ্লবীও ভেবেছে কেউ-কেউ—এই বিরুদ্ধ শক্তির প্রয়োজন সে নিত্যই অনুভব করে আজকাল। অবশ্য বিরুদ্ধতার অভাব নেই জীবনে—আর তার জন্য বেশি দূরেও যেতে হয় না—এই শরীরটাই তো শত্রুতা করে মনের, কত অপমান ক'রে যায় তাকে কত সময়। তবু জীবনের এই সব অসংগতি, অসমাঞ্জস্য, বেঁচে থাকা নামক কর্মটির এই মৌলিক স্বতোবিরোধ—এর একটা বাইরের চেহারা—কিছু-বাস্তব-কিছু-কাল্পনিক চেহারা—দেখতে পেলে তো ভালোই লাগে। ভালোই—এ-ই তার ভালো লাগে, এই খাশ কলকাতা, খাঁটি কলকাতা, যেখানে কিছুরই সঙ্গে তার 'মিল' নেই, কিছুই তাকে 'খুশি' করে না, সবই তার নিজেরই মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনে। যা-কিছু এখানকার স্থানীয়—আর স্থানীয় এবং বিশিষ্ট ছাড়া কিছুই প্রায় নেই এখানে—কলকাতার 'বাবু' নামক সেই বিখ্যাত এবং বিলীয়মান প্রতিষ্ঠান, গাঙ্গেয়ভূমির পরিপুষ্ট গৌরবর্ণ ধীরগামিনী তীক্ষ্ণভাষিণী ললনাকুল, ধারালো, কাটাছাঁটা, মুড়কির মতো মুড়মুড়ে এখানকার বাচনভঙ্গি, গলি, ঘেঁষাঘেঁষি, সবুজের অভাব; অধিবাসীদের প্রথাবদ্ধ, অবিচলিত জীবনযাত্রা, জীবনের গতানুগতিকতা, লৌকিকতা, স্থায়িত্ববোধ; —এই সব-কিছুরই মধ্যে সে দেখতে পায়, শুধু অন্য এক ভূগোল নয়, অন্য এক ঐতিহ্য—যেন দেখতে পায় তার বিপরীতের চিত্ররূপ। এই বৈপরীত্যটাই পছন্দ করে সে—মানে, সম্মান করে, 'বোঝে', সেটা উত্তেজনার মতো কাজ করে তার মনে, আবার এই রক্ষণশীল চরিত্রবলেই কোথায় যেন আশ্রয়ও দেয় মৌলিনাথকে। এর কাছে বালিগঞ্জ? মৃদু, মোলায়েম, অবিশেষ, চাটুকারী, শৌখিন এবং পল্লবশোভন বালিগঞ্জ? প্রোফেসর, সাহিত্যিক, আর অবাঙালির উদার ক্ষেত্র, আধুনিকতার—

অর্বাচীনতার—পীঠস্থান, পূর্ববঙ্গীয় উপপ্লবের বিবর্ধমান বিজয়গড় ? যেখানে সে 'আরামে' থাকতো, গৃহীত হ'তো, গণ্য হ'তো 'তাদেরই একজন' ব'লে, যেখানে—এমনকি—হয়তো মেনে নিতেও সে শিখতো এতদিনে ? না ! তার চেয়ে এই ভালো—এই বাগবাজার, এই বনেদি, পুরোনো, ঘুণ-ধরা, ঐতিহাসিক, ইতিহাসবিরোধী, হুতোম প্যাঁচার ধোঁয়ারিধূসর এই বাগবাজার।

—কিন্তু কী এসে যায় ? কোথায় আছে সে, কোথায় তার শারীরিক অবস্থান, মানচিত্রের কোন ক্ষুদ্র বিন্দুটিতে সে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে—কী এসে যায় তাতে ? যেখানেই থাক, সে তো সে-ই থাকবে , যে-কোনো শহরে, যে-কোনো পাড়ায়, যে-কোনো দেশে, শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র ঘরেই তো তার প্রয়োজন। এই ঘর, মৌলি চারদিকে তাকালো একবার—প্রথম ধূসর ভোরের আলোয় ফুটে উঠছে আস্তে-আস্তে—টেবিলের পাশে আরামচেয়ার, দেয়ালে ঝোলানো গোল আয়না, বাথরুমের দরজার পাশে টুলে বসানো জলের কুঁজো, আর তার পাশে ছোটো একটা দাগ-ধরা চৌকো টেবিল, যেটা নানারকম ব্যবহারেই লাগে তার—এই ঘর তার দশ বছরের বাড়ি, 'বাড়ি' বলতে যতটা বোঝায়—যতটা বাড়ি কোনো মানুষেরই থাকে আজকাল, কিংবা যতটা বাড়িতে যে-কোনো কালেই সত্যি মানুষের অধিকার আছে। বড়ো ঘর—মানে, তার পক্ষে বড়ো, অন্তত যথেষ্ট—এইটিতেই সে শোয়, বসে, কাজ করে—এমনকি খেয়েও নেয় এক-এক সময় ; পাশের ছোটো ঘরটি, যেখানে 'ড্রয়িংরুম' সাজানো আছে গোটা কয়েক বেতের চেয়ারে, সেখানে এমনও হয় যে সপ্তাহে একবারও সে যায় না—কেননা যখন ঝোঁক চাপে সে-ই বেরোয় বাড়ি ছেড়ে আড্ডা দিতে, আর সন্ধেবেলা বন্ধু কেউ এলে তার 'নিজের' ঘরেই

চেয়ার টেনে গল্প করে—এমনও হয় যে মাসের মধ্যে একবারও সে পা বাড়ায় না এই ঘরের চারটি দেয়ালের বাইরে। এমনি ক'রে কেটে যায় তার দিন—অন্তত যখন কলকাতায় থাকে সে; যখন কোনো বই শেষ ক'রে, কিংবা শরীর সারাতে, কিম্বা নতুন দৃশ্যের তাগিদে—কিংবা সে-সব কোনো কারণেই নয়—একান্তই অকারণে এবং বিনা প্ররোচনায় যখন সে বেরিয়ে পড়ে না ভ্রমণে, ঘুরে বেড়ায় না হিমালয়ের পাইনবনের আলোছায়ায়, কিংবা হোটেলের বারান্দায় ব'সে সমুদ্র দেখে দিন কাটিয়ে দেয় না। কিন্তু ঐ তার ছুটির দিন, ভ্রমণের পালা—বিশ্রাম, বৈচিত্র্য, স্বাস্থ্য—কখন এক সময় মনে হয় যে এদের কাছে অনেক ঋণ জ'মে উঠলো তার, এবার ফিরিয়ে দাও, শোধ করো দ্বিগুণ ক'রে—আর তখন আর দেরি না-ক'রে বাক্স গোছাতে ব'সে যায়—যদিও তখনই হয়তো কালিম্পঙে হেমন্ত এলো পাতাঝরার সোনালি গান হাওয়ায় ছড়িয়ে, কি বৃষ্টি কেটে গিয়ে বেরিয়ে এলো রাশি-রাশি আনন্দের মতো বঙ্গোপসাগর—দেরি না-ক'রে ফিরে আসে এই ঘরে, এই তার টেবিলটিতে, যেখানে ব'সে-ব'সে দিনের মধ্যে বারো, চোদ্দ কি ষোলো ঘণ্টাও সে কাটিয়ে দেয় কখনো-কখনো, ব'সে থাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস; ব'সে-ব'সে—লেখে।

'লেখে'—এই কথাটা সহজে বলা হ'য়ে গেলো, শেষ হ'লো যেন এক নিশ্বাসেই, কিন্তু এর মধ্যে অনেক-কিছু প্রচ্ছন্ন আছে, অনেক তথ্য, ইতিহাস, সমস্যা, ব্যবস্থাপনা—বলতে গেলে মৌলিনাথের সমস্ত জীবনটাই ধরা আছে ঐ ছোট্ট কথাটিতে। কেননা এই তার কাজ—লেখাকে সে 'কাজ' বলে সব সময়—এটা সে উপায়হিশেবে ব্যবহার করে না, এটাই তার লক্ষ্য, গন্তব্য, অবিরত আরো দূরে-স'রে-যাওয়া

গন্তব্য তার। অর্থাৎ, দু-চারখানা ভালো বই লিখে 'নাম' ক'রে, সেই নাম সুদে খাটাতে চেষ্টা করেনি সে, তারই জোরে প্রতিষ্ঠা খোঁজেনি জীবনের অন্যান্য বিভাগে। বসতে চায়নি বড়ো দরের দপ্তরে; ডিনার-টেবিলে ধনী গৃহিণীর অলংকার ব'লেও গণ্য হ'তে চায়নি। তার লেখার কাছে অন্য কোনো মূল্যই সে ইচ্ছা করেনি, বরং তার নিজের যেটুকু মূল্য সব নিংড়ে দিয়েছে ওখানে। সবই দিয়েছে, কিছুই হাতে রাখেনি। খাদ্য থেকে, ঘুম থেকে, ভ্রমণ থেকে যা-কিছু সে পুষ্টি পায়, সবই এনে দেয় এখানে, প্রয়োগ করে; এখানেই ব্যয় করে তার উদ্যম, উৎসাহ, দৃঢ়তা, ধৈর্য—যা-কিছু মানসিক আর নৈতিক বল প্রকৃতির কাছে পেয়েছে সে। এটা—এই একটু অস্বাভাবিক অবস্থা—এটাকেই সে সম্ভব ক'রে নিয়েছে, এরই ছাঁচে গ'ড়ে নিয়েছে তার জীবন। অন্য কোনো পাওনাদার রাখেনি, অন্য কোনো বশ্যতা মানেনি, সংসারকে স্বীকার করেনি কোথাও। আর তার এই স্বাধীনতা—স্বাবলম্বিতা—একান্তরূপে শুধু 'আমি' হবার ক্ষুরধার স্বাধীনতা তার—এটা বজায় রাখার জন্য কিছু ত্যাগও তাকে করতে হয়েছে, অত্যাচারও সইতে হয়েছে কিছু। এটা বজায় রাখার জন্য তাকে অন্ধকারে নামতে হয়েছে কখনো-কখনো, নামতে হয়েছে শরীরময়ীদের উন্মোচিত পাতালে—যখন তাকে আঁকড়ে ধরেছে অন্ধ শীত—একই সঙ্গে তপ্ত আর তুহিন সেই বেগ—যখন কামের ঝড় ব'য়ে গেছে তার উপর দিয়ে।

চকিতে মৌলির মনে পড়লো তেমনি একটি রাত্রি, একটি মুহূর্ত;—একটু হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। কাম! পুষ্পধনু, বসন্তসখা, পঞ্চশর। মহামোহ, মোক্ষ-রিপু মার। কত বিচিত্র তার রূপ এই জগতে! কত আদরের সুরে তাকে ডেকেছে মানুষ, আবার কত ভয়াল ক'রে

এঁকেছে। একই সঙ্গে কত কুৎসিত সে, কত সুন্দর; কত স্থূল, কত সূক্ষ্ম; কত আবদ্ধ, কত অসীম। এই চাতুরী, প্রকৃতির তুচ্ছ কৌশল, প্রজননের ক্ষুদ্র, কৃপণ উপায়, শরীরের ক্ষণস্থায়ী এই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া—এই কি আবার উৎস নয় সেই তেজের, সেই প্রেরণার, যার জোরে নিজের সীমা, দেহের সীমা, এমনকি মৃত্যুর সীমা লঙ্ঘন ক'রে যায় মানুষ, ঝাপট দেয় পাগল পাখায় অমর্ত্যের সীমান্তে? শরীরে যার জন্ম তার ইন্দ্রিয়ে কেন তৃপ্তি নেই; কেন সে নিয়ে আসে সুন্দরের ধারণা—সেই আশ্চর্য সৃষ্টি মানুষের—আনে আনন্দ, সেই অজৈব উপার্জন এই জীবনের? মহাকাম ব্যক্তি ছাড়া কেউ কি হ'তে পেরেছে সাধক, শিল্পী, বীর, স্রষ্টা? আর ঐ যাকে মোক্ষ-রিপু বলেছেন প্রাচীনেরা, তা-ই কি আবার মুক্তির পথ, মোক্ষেরই উপায় নয় মানুষের, আর কোথায় তার অমৃত আছে প্রেমে ছাড়া, আর কিসে মানুষ বাঁচে, বলো তো, যদি-না সে প্রেমে বাঁচে? কাকে বলে কাম? কাকে বলে প্রেম?···পার্থিব, পবিত্র? কিন্তু সত্যি কি ও-দুয়ে কোনো তফাৎ আছে? তেমন কোনো স্পষ্ট একটি মুহূর্ত কি আছে, যখন কামের স্রোত এঁকে-বেঁকে বইতে-বইতে হঠাৎ প্রেমে রূপান্তরিত হয়? না কি একই উৎস, শুধু ক্ষেত্র ভিন্ন, প্রয়োগ ভিন্ন—না কি তাও নয়, না কি একই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দুটোই, না কি পার্থিবাকে ভালো না-বাসলে অমৃতময়ীর সন্ধান মেলে না?···তার ভোরের স্বপ্নটি একটু ভাবলো মৌলি, যে-লেখাটি হাতে আছে এখন, সে-বিষয়ে একটু চিন্তা করলো। প্রদীপ এলো গরম জল নিয়ে; সেই চৌকো দাগ-ধরা টেবিলটিতে সাজিয়ে দিলো দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, তারপর বিছানার দিকে স'রে গিয়ে দিনের আলোয় বিবর্ণ-দেখানো টেবল-ল্যাম্পটি নিবিয়ে দিয়ে শুরু

ক'রে দিলো ঘর গোছাতে। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মৌলি; দিন আরম্ভ হ'লো।

* * *

অন্য যে-কোনো দিনেরই মতো এও একটি দিন; মৌলির জীবনের অন্য সব দিন থেকে আলাদা ক'রে নেবার মতো কিছু নেই এতে। কিন্তু তার মানে এ-রকম নয় যে তার দিনগুলি সব 'একঘেয়ে', কিংবা একটা আর-একটার পুনরাবৃত্তি শুধু; যে-রকম দিন অভ্যাসে কাটিয়ে দেয় মানুষ, কেমন ক'রে কেটে যায় সে বোঝে না; কিংবা যে-রকম দিনের মসৃণ ঢালুর উপর দিয়ে ব্যস্ততার দ্রুত চাকায় গড়িয়ে চ'লে যায়—সে-রকম দিন মৌলিনাথকে মঞ্জুর করেননি তাঁর ভাগ্যবিধাতা। যদিও একই ছাঁচ, একই গড়ন, বাইরের চেহারা যদিও একই, তবু প্রতিটি দিনের অভিজ্ঞতা তার নতুন লাগে, নতুন যাত্রার মতো মনে হয়—যেন বেরোতে হচ্ছে অজানার আবিষ্কারে, যেন প্রত্যেক বার প্রথম থেকে শুরু করতে হচ্ছে আবার। এই রকমই মনে হয় তার—যদিও জেগে উঠে তার মনের ভাবনা আগের দিনের সুতোটি ঠিক খুঁজে পায়—যেন দিনগুলি হাতে হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে পর-পর, যেন সুর থামে না কখনো, তার সমস্ত সময়ের অন্তর্লীন সুর—আর তাই তার ঘুম ভাঙার প্রথম ক-টি মুহূর্তের অস্বস্তির সঙ্গে মিশে থাকে প্রতীক্ষার মতো, প্রত্যাশার মতো শিহরণ; তাই বিছানায় শুয়ে আসন্ন ঘটনাগুলির কথা ভাবতে কেমন একটা স্নায়ুতে-টান-পড়া গম্ভীর উৎসাহ সে অনুভব করে—চাঞ্চল্য নয়, ব্যস্ততা নয়, বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে কাজের টুঁটি চেপে ধরার মতো ক্ষিপ্রতা নয়, বরং যেন প্রেমিকের

মতো কম্পমান কিন্তু অধৈর্যহীন অবস্থা—যখন মনে হয় সে এখনই আসুক, আবার প্রতীক্ষা করতেও ভালো লাগে, কেননা প্রতীক্ষাটাও প্রেয়সীতেই পরিপূর্ণ। আসল কথা মৌলিনাথের দিন কাটে সচেতনভাবে, নিবিড়ভাবে প্রতি মুহূর্তে বাঁচে সে—প্রায় তীব্রভাবে, যেন হাতের মুঠো শক্ত ক'রে, যেন ধনুকের ছিলা চড়ানোই আছে সব সময়—আর সেই টান যাতে সইতে পারে তাই বাইরে একটি বিরামের ভাবও বজায় রাখতে হয় তাকে। আর এইজন্যই সে 'ব্যস্ত' থাকে না কখনো—কাজ যা-ই করুক আর না-ই করুক—'সময় বাঁচাতে' চায় না, বরং এ-কথা বললে ঠিক হয় যে ব্যস্ত হবার সময় তার নেই। হ্যাঁ, তার সময় কম এই অর্থে যে সময়টাকে অনুভব করতে চায় সে, তাই অনেক সময় 'নষ্ট' তাকে করতেই হয়, দিতে হয় এক ঘণ্টার কাজে দেড় ঘণ্টা;—একটু ধীর, এমনকি একটু দীর্ঘসূত্রী তার ধরন-ধারন;—কিন্তু সতর্ক, কিন্তু প্রস্তুত;—দিনটাকে হুশ ক'রে ফশকে বেরিয়ে যেতে সে দেয় না, ঘণ্টাগুলিকে যেন স্পর্শ ক'রে-ক'রে চ'লে যায়।

এই দিনটি, আপাতদৃষ্টিতে অন্য যে-কোনো দিনেরই মতো এই দিন—এটিও তার এমনি ক'রেই কেটেছে এতক্ষণ, অন্তর, অবিরল, ভিতরে-ভিতরে শিহরণময় কিন্তু বাইরে অনুত্তেজিত স্রোতে। সকাল থেকে এ-পর্যন্ত কিছুই উল্লেখযোগ্য ঘটেনি, তার মানে ছন্দ ভাঙেনি কোথাও। তার দাড়ি কামানো হ'তে-হ'তে কুলপ্রদীপ ঘর গুছিয়ে ফেলেছে; ত্রিভুজ হ'য়ে ঝুলে-থাকা কুশ্রী মশারিটাকে লুকিয়ে ফেলেছে তোশকের তলায়, মোটা মণিপুরী সুজনি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে বিছানা, যেখানে-সেখানে প'ড়ে-থাকা বইগুলো কুড়িয়ে স্তূপ ক'রে সাজিয়েছে

টেবিলে, ঝাঁট দিয়েছে, সাফ করেছে অ্যাশট্রে, মৌলির কাপড় তোয়ালে হাতের কাছে রেখে বেরিয়ে গেছে লালচে চোখের নত ভঙ্গিতে। স্নান সেরে—এঁদো বাথরুমে চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে বেরিয়ে মৌলি দেখেছে তার প্রাতরাশ তৈরি; সেই চৌকো টেবিলটা—যেটাতে দাড়ি কামালো একটু আগে, সেটাতে একটা শাদা-কালো বরফি-আঁকা কাপড় পেতে প্রদীপ সাজিয়ে দিয়েছে তার দ্বিতীয়বারের চা, পাশে রেখেছে খবর-কাগজ—নগরের ভোরের কাকলি, কালিমালিপ্ত বৈতালিক এই কলকাতার। চায়ের সঙ্গে খেয়েছে একটি আধা-সেদ্ধ ডিম, মাখন আর মামলেড মাখিয়ে দু-খানা টোস্ট,—ফাঁকে-ফাঁকে চোখ ফেলেছে খবর-কাগজে—খাওয়া শেষ ক'রে ব'সে গেছে কাজে। আরম্ভ করেছে তার অভ্যেসমতো উল্টো দিক থেকে, অর্থাৎ হালকাগুলো হাতে নিয়েছে আগে। চিঠি কিছু জ'মে ছিলো জবাব দেবার, প্রুফ ছিলো এক তাড়া, পুরোনো একটি প্রবন্ধের কিছু সংশোধন ছিলো;—এইগুলো সেরে নিয়েছে একে-একে। অনেকেই ব'লে থাকেন যে সকালবেলার সতেজ সময়টাই কঠিনতম প্রয়াসের পক্ষে প্রশস্ত, কিন্তু এ-বিষয়ে মৌলিনাথের মতটা একটু অন্য রকম। যেটা একেবারেই নতুন এবং প্রথম কাজ, যেটা রচনা, মৌলিক সৃষ্টি—সেটাকে সে পেছিয়ে দিতে ভালোবাসে, অন্য সব চুকিয়ে দিয়ে তবে তার মুখোমুখি দাঁড়ায়—যেমন সারাদিনের অন্য সব পাওনা মিটিয়ে তবে আসে প্রেয়সীর সঙ্গে মিলনের সময়, কিংবা যেমন বড়ো যুদ্ধে নামার আগে প্র্যাকটিসের মাঠে হাত খেলিয়ে নিতে হয়। আর তাই, এই অভ্যাসের ফলে, এ-সব 'অন্যান্য' নিয়েই কেটে গেছে তার সারা সকাল, ও-সব শেষ হ'তে-হ'তেই দুপুর বেজে গেছে ঘড়িতে। তখন উঠেছে,

একটু পাইচারি করেছে ঘরে, কোনো-একটা মাসিক পত্রের পাতা উল্টিয়েছে, তারপর প্রদীপ এনে দিয়েছে তার দুপুরের খাওয়া— ভাত, আলু আর কাঁচাকুমড়ো-সেদ্ধ-ফেলা মুগের ডাল, পালং শাক, ট্যাংরা মাছের চচ্চড়ি, সবশেষে কাঁচা দুটো টম্যাটো। খাওয়ার পরে আবার বসেছে টেবিলে, লেখার প্যাড খুলে কলম হাতে নিয়ে মুখ নিচু করেছে।

এখন দুপুর, ভরা দুপুর, শীতের দিনে দুপুর বলতে যেটুকু বোঝায়। বেলা প্রায় দুটো। সারা পাড়া চুপ; ঘরকন্নার এই বিরামের সময়ে প্রায় অস্বাভাবিক রকম শুদ্ধ হ'য়ে গেছে এই গলি। সকাল ভ'রে নানা রকম শব্দ থাকে; জলের শব্দ, রান্নার শব্দ, বাচ্চাদের চ্যাচামেচি, ঝিয়েদের নাটুকে গলা—তখন কোনোটাই ঠিক লক্ষ্য করেনি মৌলি, কিন্তু এখন তাদের অভাবটাকে লক্ষ্য করলো। লক্ষ্য করার কারণ আছে। এই এক ঘণ্টা সে ব'সে আছে এখানে, সামনে প্যাড খোলা, হাতে কলম, তাকিয়ে আছে কাগজটার দিকে—অর্ধেক লেখা পাতা একটা—কয়েকটি আড়িতে বলা সুঠাম গদ্যের বাক্যবন্ধ, যাতে একই সঙ্গে দুটো অর্থের ইঙ্গিত চলেছে, যার রচনাশিল্পের অনুমোদন করতে মৌলিনাথের আপত্তি হয় না। কিন্তু এই অনুমোদনে কোনো সুখও হয় না তার—অন্তত আপাতত হচ্ছে না—কেননা ঐ অংশটুকু তার কালকের লেখা, কাল রাত্রে থেমেছিলো ওখানে; তারপর আজ, এতক্ষণে, এর পরে আরো কিছু যোগ করার তার কথা ছিলো, উচিত ছিলো সেটা, না-হবার কোনো কারণই ছিলো না—কিন্তু হয়নি। এই এক ঘণ্টায় একটি শব্দও লেখেনি সে, কাল যেখানে থেমেছিলো তার পরে কলমের আর একটি আঁচড়ও কাটেনি।

এতে এমনিতে অবাক হবার কিছু নেই। মৌলিনাথ—যে তার যৌবনকালে ব'লে বেড়াতো যে সহজে যা পারে না তা সে পারেই না—এমনকি, যেটা সহজে হয় না সেটা করবারই যোগ্য নয় ব'লে ঘোষণা করেছিলো—সে আজকাল অনায়াসে কিছু ক'রে ওঠার কোনো কল্পনাও স্থান দেয় না মনে। না, কিছুই আর সহজ নেই তার কাছে, কিছুই আর দ্রুত চলে না; ভাবতে সময় লাগে, লিখতে সময় লাগে, মনস্থির করতে সময় লাগে। আর এটা—তার লেখার এই দীর্ঘায়িত ছন্দ, এই বিলম্বিত লয়—এটা তার ভালোই লাগে; ভালোই, যে তার লেখা আর হঠাৎ-হঠাৎ 'পেয়ে বসে' না তাকে, আঁকড়ে ধরে না গলা, যেন বাষ্পের চাপে বুক ফেটে যাবার দশা করে না, 'কী' 'কেন' 'কোথায়', 'কতটুকু', এই ধরনের সমস্ত প্রশ্ন ভাসিয়ে দেয় না এক দুর্বার ফেনিল খরস্রোতে। না, সে আর 'ভেসে' যায় না আজকাল; এই খেলার নিয়ম-কানুন বদলেছে, সুখের খেলা আর নয়, সরল নয়, নয় দ্বিধাহীন, দায়িত্বহীন, আকস্মিকের চমকও আর নেই; এখন দীর্ঘ জটিল লুকোচুরির পথে সতর্কভাবে চলতে হয় তাকে, পথ হারাতে হয় বার-বার, অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়, ধৈর্যের সলতেটুকু জ্বালিয়ে রেখে ব'সে থাকতে হয় অন্ধকারে, যেন কোন কত দূরের পদধ্বনি শুধু শুনতে হয় ব'সে-ব'সে। এটা তার ভালোই লাগে—এটাকে সে উপভোগ করে রীতিমতো—এই সব কঠিন ছলাকলা, তার সঙ্গে তার লেখার একটা গোপন চুক্তি যেন, এই অবিচ্ছেদী, অত্বরান্বিত সম্বন্ধসূত্রে,—যাতে দ্বিধা অনেক, বাধা অনেক, অথচ সত্যি কোথাও একটু ফাঁক নেই, যাতে কাগজের গায়ে লেখা না-পড়লেও মনের কাজ থেমে থাকে না কখনো, চোখ বুজে কথা ধরতে হয়, ঠোঁট নেড়ে ফেলে দিতে হয়—ভালো

লাগে এই অভিনিবেশের আস্বাদ, এই ধীর, ক্রমানুগামী আরোহণ, তার রচনার এই মন্থর, কষ্টকর, কিন্তু অবিরল প্রবাহ—না, প্রবাহ বললে ভুল হয়, স্রোত আর বলা যায় না—বলা যাক তার বিন্দু-বিন্দু ক'রে বেরিয়ে আসা এই চিত্তক্ষরণ। সে যা কিছু করে এইভাবেই করে আজকাল; তার 'অন্যান্য' কাজ—প্রুফ দেখা, চিঠি লেখা, নিজের লেখার পরিমার্জনা—কোনোটাকেই 'হালকা' ঠিক বলা যায় না, চিন্তার ছায়া পড়ে সবটাতেই, দায়িত্ববোধ আক্রমণ করে, কলম বেঁকে যায়, হোঁচট খায়, থমকে থাকে। আর লিখতে ব'সে মাঝে-মাঝে খানিকক্ষণ—এমনকি অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকা—এটাও নতুন নয় তার কাছে, এর সঙ্গে বেশ চেনাশোনা আছে তার—এতে সে অবাক হয় না, ভয় পায় না, এর মধ্যেও আশ্বাস কিছু খুঁজে পায়।

কিন্তু এখন—এই নিঃশব্দ দুপুরবেলায় কলম হাতে ব'সে-ব'সে একটু অন্য রকম মনে হচ্ছিলো মৌলিনাথের। মনে হচ্ছিলো ঘরটা বড্ডো ঠাণ্ডা, মনে হচ্ছিলো আলো বড়ো কম, কালি বড়ো ফ্যাকাশে—না কি তাকে চশমা নিতে হবে?—মনে হচ্ছিলো গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে ঠিকমতো লেখা যায় না কখনো। ও-সব অবশ্য লক্ষণ, উপসর্গ মাত্র; আসল কথাটা—এতক্ষণে নিজের কাছে স্বীকার না-ক'রে উপায় থাকলো না—আসল কথাটা এই যে সে থেমে গেছে—স্রেফ থেমে গেছে—তা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা নেই এর। সুর থেমে গেছে মনের মধ্যে, কোথাও কোনো স্পন্দন নেই, যেন কোনো নিথর হিম হঠাৎ নেমেছে তার মনের উপর, যেন মৃত্যুর হাত ধ'রে ফেলেছে তাকে—না কি কারো প্রতিহিংসা, না কি অলক্ষ্যে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ক্ষমাহীন কোনো অভিশাপ? আজই তো প্রথম নয় যে এ-রকম

হ'লো তার। না, আর লুকোনো যায় না নিজের কাছে, মেনে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয় ব্যাপারটা। কী? কী হয় তার কখনো-কখনো, সম্প্রতি হচ্ছে, এই দু-এক বছরের মধ্যে কয়েকবারই হ'লো থেকে-থেকে—যখন, কেমন ক'রে জানে না, কারণ কিছু বোঝে না, যেন কোন নেপথ্যে চলা চক্রান্তের ফলে হঠাৎ রুদ্ধ হ'য়ে যায় তার সমস্ত কিছু চিন্তার আর অনুভূতির উৎস, যেমন সারা শহর অন্ধকারে ডুবে যায় কোথায় কত দূরে একটিমাত্র সুইচ বন্ধ হ'লে। কথা খোঁজা, বাছাই করা, বিন্যাস, ব্যবস্থাপনা—এ-সবের কোনো কথাই আর থাকে না তখন; ব্যাপারটা—একেবারে নিছক সত্যটাই বলা যাক—ব্যাপারটা এই হয় যে সে কী লিখবে তা-ই আর ভেবে পায় না; শুধু তা-ই নয়, শুধু যে লিখতে পারে না তা নয়, কেন লিখবে, লিখে কী হবে, তাও আর ধারণা করতে পারে না যেন—এই তার লেখা নামক কর্মটির কোনো অর্থ, কোনো সার্থকতাই খুঁজে পায় না মনের মধ্যে। আর এই রকম সময়ে—হঠাৎ মেরুদণ্ডের ঠাণ্ডা স্রোতে শিউরে উঠে সে জিগেস করে—নিজেকেই জিগেস করে—যে সে সত্যিই বেঁচে আছে কিনা, না কি শুধু ছায়া হ'য়ে ভেসে আছে এই পৃথিবীতে।

এই রকম সময়ে, সত্যি বলতে, মৌলির সঙ্গে তার নায়কের অবস্থার মিল ধরা পড়ে—আর সেটা—সেই অশুভ সাদৃশ্য—তার নিজের কাছেও গোপন থাকে না। যে-লেখাটা এখন লিখছে, কিছুদিন ধ'রে লিখছে, যার পাণ্ডুলিপি সামনে খুলে ব'সে আছে এতক্ষণে এক ঘণ্টারও কিছু বেশি হ'লো, তাতে যেন নিজেরই মূর্তি দেখতে পেয়ে সন্ত্রস্ত হ'লো মৌলিনাথ। লেখাটা একটা গল্প, গল্প গল্প—আজকাল

গদ্যই বেশি লেখে সে, জীবিকার জন্য লেখে, নিজেরও জন্য লেখে—গদ্যের পরিসরে নিজেরই তার প্রয়োজন আছে মনে হয়। গল্প লেখে;—কিন্তু কোনো একটি গল্প তার বলার আছে বলেই লেখে না, গল্পটাকে উপলক্ষ্য ক'রে অন্য কিছু কথা সে ব'লে নিতে চায়। কোনো একটি ধারণা তার মনে জন্মায়, কোনো একটি চিন্তা বেড়ে ওঠে দিনে-দিনে—সেটিকে সে বের ক'রে আনে, চেহারা দেয়, কাপড় পরায়, সেটিকে সে মূর্ত ক'রে তোলে একটি গল্পে, গদ্য কাব্যে, কোনো একটি রূপক-কাব্যে নীড় বেঁধে দেয় তার। এখন লিখছে একটি অসুস্থ মানুষের কাহিনী। অসুস্থ, রুগ্ন, কোনো এক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির কবলে পড়া একটি আধ-বয়সী মানুষ—কেমন ক'রে তার অসুখ সারলো এইটুকু নিয়েই, এতটা নিয়েই—গল্প লিখছে সে। শক্ত অসুখ, মাসের পর মাস সমানে ভুগছে, বছর পেরিয়ে গেলো, ডাক্তারের পর ডাক্তার এসে কত রকম ব্যবস্থা দিলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না; অসুখটায় সবচেয়ে যা বিশ্রী সেটা এই যে তা বিছানায় শুইয়ে রাখে না, জ্বালাযন্ত্রণাও নেই কিছু; রোগী হেঁটে-চ'লে বেড়াচ্ছে, বাইরে থেকে দেখতে একজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই, অল্প-স্বল্প কাজকর্মও করে, মাঝে-মাঝে একটু ভালোও থাকে, এক-এক সময় খুব আশাও হয় যে সেরে উঠছে। কিন্তু এটাই—এই যে হঠাৎ কোনো ওষুধে যেন 'ধ'রে' যায়, কি হাওয়া-বদলে 'উপকার' হয়, ঠিক এটাই সবচেয়ে অন্যায়, বলা যেতে পারে দুর্নৈতিক—যেন তাকে রুগ্ন রাখার জন্যই ধিকিধিকি বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। বাঁচিয়ে…? হ্যাঁ, অন্তত ডাক্তারি অর্থে সে বেঁচে আছে তা মানতেই হয়। শুধু তা-ই বা কেন, ভালোই আছে। কেউ যখন জিগেস

করে সে নিজেও বলে, হ্যাঁ, ভালো আছি। কী বা আর বলা যায় তা ছাড়া? সে কি যকৃতে কোনো কষ্ট পাচ্ছে? না। তার হৃৎপিণ্ড দুর্ব্যবহার করে কোনো রকম? না। ফুশফুশ? ঠিক আছে। ঘুম হয় না রাত্রে? ভালোই হয়। খিদে? আছে। সবই আছে তার; আইনত, কাগজেপত্রে সবই আছে;—কিন্তু আসলে তার কিছুই নেই। তার হৃৎপিণ্ড বিকল, যকৃৎ অস্থয়াপন্ন, ফুশফুশ দুষ্ক্রিয়; তার খাওয়া, ঘুম, একটু-একটু কাজকর্ম করা, ভদ্র বেশে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়ানো—এ-সব কিছুরই কোনো অর্থ নেই, সত্যি বলতে; সব মেকি, দেখানোপনা—তাও খুব অক্ষম অভিনয়—অভ্যাসেরও কঙ্কালটুকু শুধু; এ-সবে প্রাণ আসে, স্বাদ আসে, সুখ—অথবা দুঃখ—আসে যেখান থেকে, সেই মূল উৎসই তার শুকিয়ে গেছে। যা-কিছু করে সে, কিছুই তার ভালো লাগে না—তার মানে মন্দও লাগে না;—ভালো আর মন্দ, সুখ আর দুঃখ, ও দুটো তো একই প্রাণসত্তার এপিঠ আর ওপিঠ ছাড়া কিছু না। না, ভালো-মন্দ কিছুই আর লাগে না তার, মন শূন্যে ঝুলে আছে, স্বত্ব হারিয়েছে, এক ফোঁটা দখল তার নেই কোথাও। যে-বিশ্বাস, জীবনের উপর সহজে স্বস্থ যে-বিশ্বাসের কথা মুখে কেউ বলে না কখনো, যার কথা জানেও না কেউ, অথচ অলক্ষ্যে যা অনবরত কাজ করে যায়, আর যার ফলে প্রতিদিনের সমস্ত কাজ সজীব হ'য়ে ওঠে—ঘুমের মধ্যে যা বিশ্রাম দেয়, খাদ্যের মধ্যে যা পুষ্টি জোগায়, আলোকে যা উজ্জ্বল করে আর হাওয়াকে যা নিশ্বাসের যোগ্য ক'রে তোলে—জীবনের জীবনস্বরূপ সেই বিশ্বাসটাই চ'লে গেছে তার। অতএব কেমন ক'রে বলা যায় সে বেঁচে আছে? অথচ সে ম'রেও যায়নি, মরবার কোনো লক্ষণও

দেখাচ্ছে না, মরবার মতো অসুখও একটা ঘটাতে পারছে না এতদিনেও—যদিও এক বছরের বেশি হ'য়ে গেলো রীতিমতোই অসুস্থ আছে সে। ক্রমে তার সন্দেহ হ'লো—মানে, রোগীর, মৌলিনাথের গল্পের এই নায়কের ক্রমে সন্দেহ হ'লো যে এই অসুখটা তার শরীরের নয়, মনের—ঠিক মনেরও না, আত্মার—হ্যাঁ, আত্মার অসুখ—যদি না ঐ কথাটায় কেউ আপত্তি করেন তাহ'লে এ-ই বোধহয় এর ঠিক বর্ণনা। এখানে গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ, আরোগ্যের ইতিহাস এখানে শুরু হ'লো—মানে, হবে—কেননা মৌলি তার রচনায় এখনো এতদূর পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এই শেষের অংশটা এখনো ঠিক স্পষ্টও হয়নি তার মনে, তার বিবরণ খুঁজে পায়নি এখনো—তবে মূল কথাটা মনে-মানে জানে সে, অনেক দিন ধ'রেই জেনেছে—ঐ কথাটি ফোটাবার জন্যই পুরো গল্পটা ভেবে নিতে হয়েছে তাকে। কথাটা এই যে রোগী এর পর তুচ্ছ কোনো ঘটনার সূত্রে আশ্চর্য এক আবিষ্কার হঠাৎ ক'রে ফেললো। সে দেখলো যে তার অসুখের কারণ—কারণ বললে ঠিক হয় না, দেখলো যে তার অসুখটাই আর-কিছু নয়, শুধু ভালোবাসার অভাব। ভালোবাসা নেই, তাই স্বাস্থ্য নেই; রোগ, ব্যাধি, পীড়া, এই কথাগুলি—স্পষ্ট বুঝলো সে—ভালোবাসার অভাবেরই নামান্তর মাত্র—আর-কিছু নয়, আর-কিছু নয়। কিন্তু অভাব কোথায় তার? বাড়িতে তার আপন জনেরা—তারা কি তাকে ভালোবাসে না? তাদের ভালোবাসার প্রমাণ সে কি দিনে-দিনে নতুন ক'রে পাচ্ছে না তাদের সেবায়, যত্নে, তাকে সারিয়ে তোলার সনির্বন্ধ চেষ্টায়? তবু কেন অসুখ সারে না তার? তবু কেন সে ম'রে আছে? আর

এর পরে ভাবতে-ভাবতে আরো একটি আবিষ্কার করলো এই রোগী—একেবারে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে বলার মতো অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার—অন্তত তার নিজের তা-ই মনে হ'লো তখন। ভালোবাসার অভাব বলতে কী বোঝায়, ভালোবাসা বলতে কী বোঝায়, এই কথা—এই পুরোনো কথা—যেন এই প্রথম বার জানলো সে। সে বুঝলো যে ভালোবাসা পেলে কিছু হয় না, তাতে আনন্দ নেই, তাতে বাঁচে না মানুষ; ভালোবাসতে পারাকেই বলে আনন্দ, বলে স্বাস্থ্য, বলে সার্থকতা। সে বুঝলো যে ভালোবাসতে আর পারে না সে, নিজের মনে বিচার ক'রে বুঝলো যে সত্যি সে কাউকেই এখন ভালোবাসে না—না কি কোনোদিনই বাসেনি, আর তাই কি এই জীবন্মৃত্যুর অভিশাপ পড়েছে তার উপর? এ-কথা যেই বুঝলো সে আর দেরি করলো না; বেরিয়ে পড়লো বাড়ির আরাম, ডাক্তারের সান্ত্বনা ছেড়ে—কিংবা হয়তো তার আপন জনেরাই তাকে পাঠিয়ে দিলো আরো একবার হাওয়া-বদলে, তার পক্ষে নতুন কোনো স্বাস্থ্যকর জনপদে। মনে করা যাক সেখানে, শরতের কোনো সমুদ্রতীরে, কিংবা কোনো উপত্যকার বসন্তকাননে—একদিন একটি মানুষকে সে দেখতে পেলো, একটি মুখ তার চোখে পড়লো একদিন। কিংবা ট্রেনে যেতে-যেতে কোনো-এক অখ্যাত স্টেশনে হঠাৎ একটি মুখ দেখতে পেয়ে তখনই নেমে পড়লো সেখানেই। কার মুখ? হয়তো কোনো বিদেশিনীর, কোনো বিবাহিতা পতিপ্রেমিকার, হয়তো কোনো বালিকার—তার প্রায় কন্যা হ'তে পারতো এমনি একটি কিশোরীর—না কি কোনো গণিকার, বারাঙ্গনার, স্বৈরিণীর, মুখে যাদের মদের গন্ধে মাছি বসে—ধরা যাক না তেমনি কোনো বিলোল রূপসীর? কিছু এসে যায় না, কে।

এটুকু হ'লেই হয় যে ব্যাপারটা হাস্যকর, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব—অন্তত প্রণয়ের বিনিময় অসম্ভব, বিনিময়ের কোনো কথাই ওঠে না এটুকুই এর সার কথা। আর তারপর? তারপর সে—সেই রোগী—দিনের পর দিন কাটাতে লাগলো সেই নতুন শহরে, শুধু একটি মুখ দেখে-দেখে, কোনো একটি মানুষকে শুধু চোখে দেখার জন্য। কাছে গেলো না ছুতো ক'রে, আলাপের কোনো চেষ্টাই করলো না—যদিও তার বাধাও ছিলো না তেমন, দুটো-একটা সুযোগও ছিলো, কিন্তু বাইরের দিক থেকে এতটুকুও অগ্রসর হবার কোনো কল্পনাই জাগলো না তার মনে। তাকে দেখবার জন্য সে দাঁড়িয়ে থাকলো রাস্তায়, রোদ্দুরে; তার কাছাকাছি একটু দাঁড়াবার জন্য দোকানে ঢুকে খামকা কিছু জিনিশ কিনলো; তার ফেলে-দেয়া কোনো টুকরো কাগজ লুকিয়ে রাখলো বুকের পকেটে, তার নখ কামড়াবার অভ্যেস আছে ব'লে সে—আমাদের রোগী, মৌলিনাথের গল্পের নায়ক—সেও তা-ই করতে লাগলো। তাকে দূর থেকে আসতে দেখলে বুকের মধ্যে ঝড় ওঠে, হাসির আওয়াজ কানে এলে দু-চোখে তার জল আসে আনন্দে, আর কখনো—কচিৎ কখনো যদি এমন হয় যে তারই চোখে তার চোখ প'ড়ে গেলো হঠাৎ, তাহ'লে এই প্রৌঢ় পুরুষের হৃৎপিণ্ড কয়েক মুহূর্ত নড়ে না। এমনি ক'রে-ক'রে আরোগ্য হ'লো তার, এমনি ক'রে সে পূত হ'লো, এমনি ক'রে তার উদ্ধার হ'লো প্রেমে—এমনি ক'রে তার মুক্তি হ'লো—মৃত্যু হ'লো। মনে করা যাক সুন্দরী একদিন বেড়াতে গেলেন দলের সঙ্গে হিরণ হ্রদে—সত্তর মাইল দূরে জঙ্গলে—ফিরতে রাত হ'লো, গাড়ি খারাপ হ'লো রাস্তায়, এদিকে আমাদের প্রেমিক—রোগী বললে ভুল হবে এখন—সে দাঁড়িয়ে আছে

বিকেল থেকে ফেরার পথে, ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায়, গাড়ি থেকে নামার সময় একটুখানি চোখে দেখবে ব'লে। সন্ধ্যা হ'লো, রাত হ'লো; সে নড়লো না, একটু চোখে না-দেখে যেতে পারে না সে, একবার চোখে না-দেখলে ঘুমোতে পারবে না রাত্রে। রাত বাড়লো, ঝড় উঠলো—ঠাণ্ডা ঝড়—আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি; এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা—কতক্ষণ কোনো হিশেব নেই—স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো সে।···পরের দিন বিছানা: ;ড়ে আর উঠতে পারলো না, এতদিনে সত্যি তার অসুখ সারলো, সত্যি অসুখ করলো—এতদিনে শয্যাশায়ী হ'তে পারলো অসুখে। বেশিদিন ভুগলো না এবার;—কিন্তু মরবার আগে জেনে গেলো তার মুক্তি হয়েছে।

এই গল্প এখন লিখছে মৌলিনাথ, এরই নায়কের সঙ্গে নিজের অবস্থার—অন্তত এখনকার 'হারিয়ে-যাওয়া' অবস্থার সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে এইমাত্র যেন আতঙ্কে সে কেঁপে উঠলো; এই গল্প লিখতে-লিখতে—লিখতে ব'সে—হঠাৎ আজ শীতের দুপুরে পক্ষাঘাত নেমেছে তার মনের উপর। গল্পের প্রথম অংশের শেষের দিকে সে আছে এখন, রোগীর হতাশার বর্ণনা দিচ্ছে, তার নাস্তিবোধের গূঢ় তথ্য উদ্‌ঘাটিত করছে একটু-একটু ক'রে;—কেমন ক'রে বিরাট একটা 'না'য়ের মধ্যে সারা বিশ্ব মুছে গেলো তার—সেই ধূসর বিবরণ প্রায় শেষ ক'রে এনেছে মৌলিনাথ। এর পরেই একটি দুটি ক'রে প্রশ্ন জাগবে রোগীর মনে; প্রথমে অবশ্য শরীর বিষয়ে প্রশ্ন—খুব অন্তরঙ্গ বিষয় তার—অনেকদিন ধ'রেই ও ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না—রোগের সেই চরম দুঃখ, যাতে মানুষ শুধুমাত্র তার শরীরটাতেই পর্যবসিত হয়, তার সঙ্গে এতদিনে বেশ ভালোই চেনাশোনা হয়েছে ত—যদিও

অবশ্য এ-রকম কোনো পরিচয়কে কোনো অর্থেই 'ভালো' বলা সম্ভব হয়। শরীরের সঙ্গে শারীরিক উপায়েই বোঝাপড়া চলে, এ-কথা সে ধ'রেই নিয়েছিলো এতদিন—আর কেনই বা নেবে না—প্রত্যেক প্রকৃতিস্থ মানুষের এটা ধ'রে নেয়াই তো কর্তব্য। খিদে পেলে খাবার, তেষ্টা পেলে জল, অসুখ করলে ডাক্তার—এর উপর আর কথা কী আছে। আর এমন করিৎকর্মা ডাক্তাররা আজকালকার—এমন আশ্চর্যরকম উপায়নিপুণ! তাদের সঙ্গে এতদিনের পরিচয়ে এই রোগী তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, প্রায় ভক্তি করে মনে-মনে, কৃতজ্ঞ বোধ করে ধুরন্ধর বিজ্ঞানের কাছে, বিশ শতকে জন্মেছে ব'লে ভাগ্য মানে তার নিজের। এর আগে জন্মালে কোথায় পেতো সেই মাংসভেদী রশ্মি, কে দেখতো তার শরীরের অভ্যন্তরে—চিরকালের নিষিদ্ধ সেই অন্তঃপুরে তাকিয়ে, কে ব'লে দিতো যে ফুশফুশ তার নির্দোষ, কোথায় পেতো এই আশ্চর্য খবর যে তার হৃৎপিণ্ড আকারে একটু বড়ো? একটু বড়ো—তাতে অবশ্য এসে যায় না কিছু, সেটা 'খুঁত' ব'লে গণ্য হয় না কোনোরকমেই, কোনো 'ব্যবস্থা'র কথা ওঠে না এর জন্য—তবু, তার হৃৎপিণ্ড যে একটু বড়ো, তার তুলনায় ছোটো-ছোটো সব হৃৎপিণ্ড নিয়ে যে জীবন কাটাচ্ছে অন্য মানুষরা—এ-কথা ভাবতেই অবাক লাগে না? অবাক লাগে না, যখন অণুবীক্ষণে ধরা প'ড়ে যায় শরীরের সব কত কৌশলে লুকিয়ে রাখা পাপ—রক্তকণিকার অনাচার, মলমূত্রের ধর্মভ্রষ্টতা, অন্ত্রতন্ত্রের কোন গোপন অভ্যন্তরে চতুর কোনো বীজাণুডিম্ব? এ কি আশ্চর্য নয় যে সব দেখতে পান ডাক্তারেরা, কোথায় কী হচ্ছে তার মধ্যে সব জানেন, তার 'ভিতরে'র কথা তাঁদের কাছে লুকোনো থাকে না কিছুই। কিছুই না?...এই

প্রশ্নটায় ধাক্কা লাগবে রোগীর, এটা খুব ভাবিয়ে নেবে তাকে, আস্তে-আস্তে যেন অন্য একটা দিক থেকে দেখতে পাবে সমস্ত জিনিশটা। তার মনে পড়বে যে ডাক্তারদের কাছে সে বিশদ ক'রেই বলতে চেয়েছে তার অবস্থার কথা—তাঁদের সাহায্য করতেই চেয়েছে—অবশ্য নিজেকেও—ব্যাপারটা সব জানলে তবে তো ঠিক ব্যবস্থা দিতে পারবেন তাঁরা। তাঁদের সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে, পরীক্ষা শেষ হ'য়ে যাবার পরে, সে বলতে গেছে—যথাসম্ভব সহজ ক'রে, এবং ইচ্ছে ক'রেই একটু হালকা সুরে, বলতে গেছে তাকে দেখে যা মনে হয় তার চেয়েও তার অবস্থা অনেক খারাপ : 'ভালো' থাকলেও তার ভালো লাগে না, 'খারাপ' থাকলেও একই রকম লাগে প্রায় ; এমন কোনো ব্যবস্থা কি হয় না যাতে তার কিছু একটা লাগবে, মানুষের যে অংশটায় 'লাগে', সেটা সে ফিরে পাবে কেমন ক'রে। অবশ্য এ-রকম ভাষায় বলেনি, তথ্য দিয়ে বলেছে ; মুখে হয়তো বলেছে যে অমুক ওষুধটায় কাজ হচ্ছে না তেমন, কিংবা সসংকোচে নিবেদন করেছে যে খেতে ব'সে বড্ড তার ভয় করে পাছে একটু বেশি খাওয়া হ'য়ে যায়। কিন্তু ঐটুকু থেকেই—ঐ 'ভয়' কথাটা থেকেই কি বুঝে নেয়া উচিত ছিলো না অমন অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ডাক্তারদের ? তাঁরা অবশ্য সদয়ভাবে শুনেছেন, 'সহানুভূতি' ফুটিয়েছেন মুখে, যাবার সময় দরাজ হেসে ব'লে গেছেন কিচ্ছু হয়নি আপনার, এই দেখুন না আর এক মাসেই সেরে যাবেন। আবার কেউ-কেউ—পরে সে জানতে পেরেছে—বাড়ির লোকের কাছে ব'লে গেছেন যে ও-সব কিছু না, মেন্টেল। এই সব মনে পড়বে রোগীর, হতাশার শেষ প্রান্তে পৌঁছনো সেই মানুষটির ; তখন তার মনে হবে যে তার সত্যিকার অবস্থাটা জানতেই পারেননি ডাক্তাররা, জানবার কোনো চেষ্টাই করেননি

কখনো। ও-সব মেণ্টেল? কোন সব? আর 'মেণ্টেল', মানসিক, সেটা কিছু না? মনটা কিছু না? তাহ'লে এটাই বলতে চেয়েছেন ডাক্তাররা যে অসুখটা তার মনের, তাঁদের বিষয়ের অন্তর্ভূ্তই নয় আসলে? আগে বললেই হ'তো—সেও তো বুঝে নিতে পারতো আগেই—নয়তো এত সব চিকিৎসারও পরেও সেরে ওঠা তার হচ্ছে না কেন? তবু অন্তত এটুকুই ভালো যে এখন বোঝা গেলো ব্যাপারটা, এই 'মনের অসুখ' নামক নতুন তথ্যটা আরো একটু এগিয়ে দিলো তার চিন্তাকে। তবে কি তাকে মনোবিকলন করাতে হবে? শরণ নিতে হবে মনস্তত্ত্ববিদের? যাঁরা মনের পাপ টেনে বের করেন, যেমন ডাক্তাররা শরীরের? রোগী লুব্ধ হবে, কিন্তু দেরি করবে। আরো একটু ভাববে, মনের বিষয়ে ভাববে এবার, যেমন এর আগে শরীর নিয়ে ভেবেছে। শুধু মনের অসুখ? না কি আত্মার—ঐ 'আত্মা' কথাটাকে হঠাৎ খুঁজে পাবে এই রোগী—আর তাতেই যেন অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে একসঙ্গে—তার শরীর-মন সমস্ত মিলিয়ে, সমস্ত ছাড়িয়ে যে-সত্তা, তার মধ্যে যেটা 'সে', সেই অস্তিত্বেরই অসুখ নয় তো এটা? তার অস্তিত্বের মর্মমূলে কি ঢোকেনি এই ব্যাধি—আর সেখান থেকে কে তা উৎপাটিত করতে পারবে, যদি না সে নিজে পারে? আর এই রকম সময়ে, এই তার দ্বিধার এবং কম্পমান আশার সময়ে—তখন ঘটবে সেই ছোট্ট ঘটনাটি যাতে সে আলো দেখতে পাবে, যা তার চিন্তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে একেবারে অন্য এক দিকে, যখন সে ভাববে—শরীর-মনের কথা আর নয়—যখন ভালোবাসার কথা ভাববে সে, ভালোবাসার বিষয়ে আশ্চর্য সব আবিষ্কার করতে সে আরম্ভ করবে যখন।

সব ভাবা আছে মৌলিনাথের। পর-পর সাজানো আছে তার মনে, কেমন ক'রে ঐ প্রেমতত্ত্বের আবিষ্কার পর্যন্ত পৌঁছবে, তার প্রত্যেকটি স্তর বিশদভাবে তৈরি আছে। অবশ্য একসঙ্গে বেশি দূর সে দেখতে পায় না, হাৎড়ে-হাৎড়ে পথ চলে, জিনিশটাকে গ'ড়ে তোলে বাক্যের পর বাক্যে, অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদে; লিখতে-লিখতেই ছায়া স'রে গিয়ে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে চেহারাটা। আজ যেখান থেকে তার ধরবার কথা সেখানে কোনো বাধাই তার ছিলো না। প্রথম ক-টি বাক্যও সে ভেবে রেখেছিলো কাল ঘুমের আগে, আবার আজ সকালে উঠে ভেবেছিলো—দেখতে পেয়েছিলো দুটি-একটি অনুচ্ছেদের গড়ন। লিখতে বসেছিলো হালকা মনে, অর্থাৎ ভরা মনে, কথাগুলোকে উল্টে-পাল্টে বেছে নিচ্ছিলো আঙুলের মধ্যে কলম ধ'রে। কিন্তু লিখতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলো হঠাৎ। না—এ চলবে না। ভুল।...আর তারপর কতবার কত রকম করে ভাবলো সে; একটি বাক্য, শুধু প্রথম বাক্যটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কত রকম ক'রে ভাবলো, আগের ভাবা বাতিল ক'রে নতুন আরম্ভের চেষ্টা করলো কতবার, কিন্তু কিছুতেই—কিছুতেই ঐ আরম্ভটুকুও সে করতে পারলো না। ভুল, সব ভুল! যা-কিছু সে ভাবে, সব যেন তার স্পর্শমাত্রে ঝ'রে প'ড়ে যায়। যেন ভাবতেই পারে না, জন্মাবার আগেই ম'রে যায় ভাবনাটা, যেন মনের মাটিতে পড়ার আগেই বৃষ্টিবিন্দু উবে যায়—নয়তো জ'মে গিয়ে বরফ হ'য়ে পড়ে। যত কথাই সে মনে আনে কোনোটাকেই ঠিক মুঠোর মধ্যে পায় না, যেন ফশকে যায় কাছে এসে—ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না কোনোটাকেই, সন্দেহ জাগে—

শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কথাগুলির উপরেই নয়—যা-কিছু সে এখন ভাবছে, বা ভাবতে পারছে না, তারই উপর সন্দেহ নয় শুধু—সমস্ত লেখাটারই উপর, তার নিজের উপর, নিজের সমস্ত অস্তিত্বটারই উপর সন্দেহ জাগে তার।…আর এমনি ক'রেই, এই শূন্যতার মধ্যেই, কাটলো তার এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা—সামনে প্যাড খুলে কলম হাতে নিশ্চল ব'সে-ব'সে। আড়াইটে বাজলো…প্রায় তিন—বেলা গেলো প্রায়—শীতের বেলা আর কতটুকু!

মৌলির যেন দম আটকে এলো। একটু নড়লো চেয়ারে, মেঝেতে পা ঘষলো, যেন কোনোরকমে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চাইলো সে বেঁচে আছে। কলমের মুখ বন্ধ ক'রে হেলান দিলো চেয়ারে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। ইট-বের-করা দেয়ালটায় আড় হ'য়ে রোদ পড়েছে—রোদ!—কত আকাশ ভেসে যাচ্ছে এই পড়ন্ত সোনালি আলোয়। আর তার ঘরে? আলো কম, শীত—বিশ্রী শীত—ঠাণ্ডা, কালো, মৃত—মৃত এই ঘর তার, মৃত সে নিজে—এই ঘরে যা-কিছু আছে কিছুতেই এখন প্রাণ নেই। উত্তুরে হাওয়া ব'য়ে গেলো ঘরের মধ্যে—কেউ জাগলো না, প্রতিবাদ করলো না, শুধু একটা হিম কাঁপুনি মৌলিনাথের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেলো।

*   *   *

মৌলির যখন এই অবস্থা, যখন দু-ঘণ্টা ধ'রে ব'সে-ব'সে একটি অক্ষরও সে বসাতে পারছে না কাগজে, তবু ব'সে আছে অন্ততপক্ষে নিজের কাছেই অভিনয়টা বজায় রাখার জন্য, তখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে একটি ছোটো কালো গাড়ি মসৃণ গতিতে এগিয়ে

চলেছে উত্তর দিকে। গাড়িতে ব'সে আছেন একজন ভদ্রমহিলা। সুশ্রী মহিলা, প্রায় সুন্দরী। যারা চলতি পথে চকিতে তাঁকে দেখছে শুধু তাদের চোখেই না, অন্যদের চোখেও। যখন চৌরাস্তায় হাত তুলেছে পুলিশ, আর পাশাপাশি অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে, তখন রাস্তা থেকে, পাশের গাড়ি থেকে, তাঁকে মন দিয়ে দেখেছে কেউ-কেউ, লক্ষ্য করেছে কোনো-কোনো চোখ—যদিও তিনি যুবতী আর নন, কিংবা নন ব'লেই। সেই রকম সুন্দরী ইনি—হয়তো কারো-কারো মনে হয়েছে—যে-রকম হ'য়ে থাকেন শুধু ভাগ্যবতীরা যৌবন প্রায় পেরিয়ে এসে, জীবনের সেই দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধিতে না-পৌঁছলে যে-রকম রূপ কোনো মেয়েরই ফুটতে পারে না। পুষ্ট, তৃপ্ত, পর্যাপ্ত, কোথাও কিছু অভাব নেই—অথচ উচ্ছল নয় তাই ব'লে—সংহত, সংবৃত, নিবিড়, নিজেরই মধ্যে পরিপূর্ণ—এই কথাই লেখা আছে এঁর বসার ভঙ্গিতে, তার চেয়েও স্পষ্ট ক'রে এঁর চোখের ভাবে। হ্যাঁ, চোখ—চঞ্চল না-হ'য়েও উন্মন ঐ চোখ—যেন জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখছে, যেন বাইরের দৃশ্য সবই দেখছে তবু কিছুই দেখছে না—সেই চোখের দিকে তাকালে আরো মনে হয় যে এই আত্মস্থ মহিলাটি একান্ত কোনো ভাবনায় এখন ডুবে আছেন, অন্য কিছুতেই মন নেই, কথাবার্তায় একেবারেই ইচ্ছে নেই আপাতত।

ইচ্ছে থাকলে অভাব ছিলো কী। বললেই আসতো বিমলেন্দু;—এতটা পথ, শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, গাড়িতেও সময় বড়ো কম লাগে না—একজন সঙ্গী হ'লে বরং ভালোই ছিলো তো। নয়তো মিতু—জানতে পেলে মিতুই কি আর না সাজতো সঙ্গে! মিতু—সেও বইপত্র প'ড়ে আজকাল, বিখ্যাত লেখকদের বিষয়ে কৌতূহল জাগছে তার,

আবার মাঝে-মাঝে দেখি তর্কও করে বাপের সঙ্গে। এই সেদিনের মিতু। কখন এত বড়ো হ'লো ?···মনে পড়লো চায়ের টেবিলে বাপে মেয়েতে সাহিত্যালাপ—প্রোফেসর বলেন ডেক্যাডেন্ট, বলেন পারভার্ট, পারভার্টেড রোমান্টিক—ঠিকই বলেন বোধহয়, আবার এও বলেন যে মৌলিনাথ আর যা-ই হোক বয়স্কপাঠ্য বই লিখছে বাংলা ভাষায়। হ্যাঁ, বয়স্কপাঠ্য তাতে সন্দেহ কী—সত্যি বোধহয় পড়া উচিত না মিতুর, সত্যি জানি না কী ওতে পায় ও, কিছু বোঝে কিনা—তা পায় হয়তো কিছু—ঐ গম্ভীর লেখা, আস্তে-আস্তে খুলে-যাওয়া চিন্তার সুতো—জটিল—হাঁপ ধরে—কিন্তু শেষ ক'রে উঠে একটা অপার্থিব আনন্দেও মন ভ'রে যায়। কোথায় এলাম ?

একটা চৌরাস্তায় থেমেছে গাড়ি, ট্র্যাম চলেছে পুবে-পশ্চিমে। কী রাস্তা ? চোখে পড়লো দোকানের সাইনবোর্ড—হ্যারিসন রোড। হ্যারিসন রোড—আর কি খুব বেশি দূর ? না কি খানিক পরেই, আর-একটু পরেই···বাগবাজার, কাঁটাপুকুর, একুশের দুই। হঠাৎ মহিলাটির গালে একটি গাঢ় লাল রং ছড়ালো। অবশ্য গাল দুটি তাঁর স্বভাবতই লাল—দেখে মনে হয় ইনি উত্তরভারতে থাকেন আর খাবার টেবিলে আপেল আঙুরের অভাব হয় না—কিন্তু স্বাস্থ্যের সেই অনপনেয় প্রমাণটুকু ছাপিয়ে উঠলো যেন ভিতর থেকে অন্য কোনো রং, অন্য কোনো অভিজ্ঞান। কিসের ? কেন ? কী ? কী হয়েছে আমার ? এ-রকম লাগছে কেন ? অপার্থিব আনন্দ—সে কি শুধু বই থেকেই পাওয়া যায়, সে কি আমাদের জীবনেও নেই, জীবনের সব আনন্দই কি অপার্থিব নয়, অকারণ নয়, একেবারেই অর্থহীন নয় ? এই-যে আমি চলেছি, চলেছি একজন—একজন পুরোনো বন্ধুকে বোনের বিয়েতে

নিমন্ত্রণ করতে—এই যাওয়াটুকু যে এমনতর স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠলো, যেন অন্য সমস্ত দিন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দাঁড়ালো এসে আমার সামনে—সত্যি কি কোনো কারণ আছে এর ?

না, কারণ নেই, যুক্তি নেই কোনো, কিন্তু—তা-ই তো হ'লো। কথাটা প্রথম তুললো বেণু, কাল রাত্রে খাওয়ার পরে চুপি-চুপি ডেকে নিয়ে। 'দিদি, মৌলিদাকে বললে হয় না ?' ঐ নিচু গলা, চুপি-চুপি ভাবটা—তারও কোনো কারণ নেই—অন্তত এখন আর নেই—কিন্তু সেটাই মেনে নেয়া হ'লো, যেন বিষয়টা একটু প্রচ্ছন্নভাবেই আলোচ্য। এটা নিয়ে সাধারণ কোনো পরামর্শ হ'লো না, কিন্তু আলাদা ক'রে বলা হ'লো প্রোফেসরকে, গীতাকে—হ্যাঁ, গীতাকেও বলা হ'লো। গীতা বললো, 'বেশ তো।' খুব সাধারণভাবেই বললো, কিন্তু কে জানে—কে জানে ওর মনের কথা! বড়ো গভীর মেয়ে, সেই ঢাকা ছেড়ে যখন দিল্লি চ'লে এলো একবার মুখে আনেনি নাম—তারপর এত কাল পরে দেশে ফিরে সকলের কথাই জিগেস করেছে শুধু ঐ একজন মানুষকে বাদ দিয়ে।...তা যা-ই হোক, এখন আর 'মনের কথা'র ভাবনা ভেবে লাভ কী। শেষ পর্যন্ত জয় হ'লো বিমলেন্দুর—হবে না ? অমন ধৈর্য, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়! দশ বছর, বারো বছর ধ'রে অপেক্ষা করেছে সে; বাড়ি বেচে, পাকা চাকরি ছেড়ে দিয়ে, মরীয়া হ'য়ে বিলেত চ'লে গেলো হিটলারের প্রবল বোমা মাথায় ক'রে। হ্যাঁ, বিলেত দেশটা টলোমলো তখন, কিন্তু গীতাকে ঠেকানো গেলো না কিছুতেই—স্কলারশিপটাও তখনই ঠিক জুটে গেলো—আর গীতা যেখানে বারণ মানলো না সেখানে কি বিরত হবে বিমলেন্দু? দু-বছরের কথা ছিলো, কিন্তু হ'তে-হ'তে প্রায় পাঁচ বছর হ'লো, পড়া শেষ ক'রে সেখানেই

চাকরি নিলো দু-জনে, পুরো যুদ্ধটা কেটে যাবার পরেও আবার ক-মাস ব'সে থাকতে হ'লো জাহাজে জায়গা পাবার জন্য। একই জাহাজে ফিরলো ওরা, জাহাজে থাকতেই বাগদত্ত হ'লো বম্বাই যখন এক রাত্রি দূরে। মনস্থির করতে কতদিন লাগলো গীতার, কত বছর! কিন্তু তবু যে শেষ পর্যন্ত—ভালো, ভালো। প্রায় তিরিশ বছর বয়স হ'তে চললো, এখনো বিয়ে না-হ'লে কবে আর হবে।

'তাহ'লে, দিদি, তুমি কাল একবার—' 'বেশ তো।' আমিও বলেছিলাম, 'বেশ তো।' বিয়ের আগের ঘরোয়া উৎসব কাল—শুধু আমরা-আমরাই—ঠিক মনে পড়েছে বেণুর—না কি অন্য কারো-কারো প্রতিনিধি হ'য়ে ওকেই বলতে হ'লো মুখ ফুটে? তারপর ব'সে-ব'সে এটা-ওটা বললো খানিকক্ষণ—ঐ বেণুই যা-একটু তবু টিঁকিয়ে রেখেছে এতদিন, সে-ই কাছে ছিলো ঢাকায় যখন মাসিমা মরলেন—একাধারে ডাক্তার এবং সাহায্যকারী—তারপর কলকাতাতেও খোঁজ-খবর নিয়েছে যতদিন-না যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চ'লে গেলো। এবার এসে আর সময় পায়নি, যা হাঙ্গামা কলকাতায় এখন বাড়ি পাওয়া, আর তারপর গীতার বিয়ের ব্যাপার। 'তা তুমি ওঁকে একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো, দিদি; "না" বললে শুনো না। সঙ্গে কেউ যাবে তোমার?' কী দরকার; ড্রাইভার তো বাড়ি চেনে?

না, দরকার নেই। শুধু তা-ই নয়, রীতিমতো অদরকার আছে। তাঁর আজকের এই যাত্রায় ইচ্ছে ক'রেই কোনো সঙ্গী আনেননি ভদ্রমহিলা—ঠিক ইচ্ছে ক'রে আনেননি বললেও ভুল হয়—ব্যাপারটা এই রকম যে সে-কথা যেন ওঠেই না। কাল রাত্রে আর-কোনো কথা হ'লো না, বেণু ব'সে গেলো রেডিও খুলে গান শুনতে, শোবার আগে বেহালার

জমির বিষয়ে কিছু কথা বললেন প্রোফেসর। যুদ্ধের আগেকার কেনা, এখন দাম চতুর্গুণ, অর্ধেকটা বেচে দিলে কেমন হয়? যা মনে হচ্ছে দিল্লিতেই জীবন কাটবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতায় একটা আস্তানা চাই তো—আরো, 'দেশ' বলতে যা বোঝায় তা যখন পাকিস্তানে পড়লো। না কি যা আছে থাকবে? কখনো কিছু তুলতে পারলে একটু বাগান-টাগানও হবে—এতদিনের দিল্লির অভ্যেসের পরে আর যা-ই হোক হাঁপ ধরবে না। তুমি কী বলো? থাকবে? বেশ। আমারও তা-ই ইচ্ছে—আর এমনি অবশ্য কথাটা উঠতোই না—তবে একজন দালাল জুটেছে কিনা—যা-ই হোক, তাকে জবাব দিয়ে দেবো কাল।

এই সব আলাপ হ'লো শুতে এসে, এ-সব ভাবতে-ভাবতেই ঘুম এলো—মনে তো পড়ে না ঘুমের আগে অন্য কিছু ভেবেছিলেন—অন্তত বেণুর ঐ প্রস্তাবের বিষয়ে আর ভাবেননি সেটা বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই—আজ সকাল থেকেই কেমন অন্য রকম লাগছিলো তাঁর—যেন হালকা হ'য়ে গেছেন, কোনোটাতেই ঠিক মন লাগছে না, যেন আলগা হ'য়ে ভেসে-ভেসে যাচ্ছেন মিনিট ঘণ্টা সারা বেলার উপর দিয়ে। অপেক্ষায় দীর্ঘ হয় সময়—না কি উল্টোটা? অপেক্ষা করা—তার মানে তো সময়ের সরল রেখাকে বেঁকিয়ে দেয়া, যেটা ঘটতে এখনো দেরি আছে মনে-মনে প্রথম থেকেই তাতে পৌঁছে থাকা—এই তো অপেক্ষা করার মানে? যেমন, রাত দশটায় যে-ট্রেন ছাড়বে, বাচ্চা ছেলে সকাল থেকেই তাতে চ'ড়ে থাকে। সত্যি কিন্তু—এ-কথাটা আগে আমার মনে হয়নি কোনোদিন।

ক্রমশ ডান দিকে বেঁকলো চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, এক ফালি চৌকো

শীতের শিকল

রোদ স্থয়েডের স্যাণ্ডেল-পরা ফর্শা ছুটি পা থেকে শুরু ক'রে আস্তে-আস্তে উঠে এলো কোলের উপর যুক্ত-রাখা হাত ছুটিতে। মহিলাটি স'রে বসলেন না—যদিও স্বভাবত রোদ্দুর তাঁর সহ্য হয় না একেবারেই—হয়তো রোদটাকে ঠিক অনুভব করলেন না সময়ের রহস্ত নিয়ে ভাবতে-ভাবতে। ঠিক তা-ই—সময় কেমন ফাঁকি দেবার কারসাজি দেখায় মাঝে-মাঝে—আজ যেমন সকালবেলাটা উড়াল দিয়ে চ'লে গেলো, দেখতে-দেখতে ছুপুর, আর ছুপুর মানেই তো বিকেল,—মানে, দেড়টা যদি বাজতে পারলো তাহ'লে আড়াইটে ভেবে নিতেই বা দোষ কী—আড়াইটের মধ্যেই গাড়ি পাঠিয়ে দেবে বললো না বেণু? অথচ বাইরে এতটুকু অধৈর্য ভাব দেখালেন না, গাড়ি আসার পর বেশ মন দিয়েই শাড়ি জামা বাছলেন, গঙ্গাকে ডেকে রাতের রান্নার অণুকোটি বুঝিয়ে দিলেন, নতুন ঝিকে মনে করিয়ে দিলেন চারটের সময় হিমকে যেন ওভাল্টিন দেয়। বেরোবার মুখে সিঁড়িতে দেখা বিমলেন্দুর সঙ্গে—একটু থেমে যথোচিত এবং সময়োচিত ঠাট্টা করলেন ছু-একটা, আর বিমলেন্দু যখন জিগেস করলো, 'কোথায়—?' তখন মিষ্টি একটু হাত নেড়ে বিদায় নিলেন। তারপর—যেই নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে, গাড়িতে উঠলেন, আর গাড়ি যেই চলতে লাগলো তাঁকে নিয়ে, তখন থেকেই সেই আশ্চর্য অনুভূতির আরম্ভ, যাকে ইনি একটু আগে নাম দিয়েছিলেন, 'অপার্থিব আনন্দ'—যেটা কচিৎ কখনো মুহূর্তের জন্ম ছুঁয়ে যায় মানুষকে, কিন্তু আজ যেন এই মেদমস্থণ মহিলাকে ঘিরে ধরেছে একেবারে। কিন্তু কী—ব্যাপারটা কী? কেমন লেগেছিলো, গাড়ি যখন ছুটো-তিনটে মোড় নিয়ে লম্বা সোজা ল্যান্সডাউন রোডে পড়েছিলো? যেন ছুটি, যেন ছাড়া পেয়েছেন। গাড়ির নরম গদিতে হেলান দিতেই

সারা শরীর অলস হ'য়ে এলো, অবশ, যেন ছেড়ে দিলেন নিজেকে, ছড়িয়ে দিলেন, নিজেকে সমর্পণ করলেন একান্তে এই অদ্ভুত নতুন অনুভূতির হাতে। ঝাপসা হ'য়ে এলো বাড়ি, সংসার, বেহালার জমি, দিল্লির বাগান; বোনের বিয়ে, আজ রাত্রের ঘরোয়া উৎসব, তারও উপর মনের তন্দ্রা নেমে এলো ধীরে-ধীরে; তাঁর প্রতিদিনের, এতদিনের জীবনটা যেন মুছে-মুছে এলো বাইরের শীতের বেলার এলিয়ে-পড়া রোদ্দুরে। না, কিছুই যেন আর থাকলো না; যত কাজ, দায়িত্ব, সম্বন্ধ, যা-কিছু মানুষকে টিঁকিয়ে রাখে এই সংসারে, সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় বাঁধন যেন শিথিল হ'লো হঠাৎ, বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগলো শুধু এক চিহ্নহীন চিরকালের 'আমি'। মা, বোন, স্ত্রী, গৃহিণী—কিছু না, শুধু আমি। মৃদু, অতিশয় মৃদু সেই কাঁপন, অথচ স্পষ্ট, তাকে ভোলানো যায় না, ভুলে থাকা যায় না মুহূর্তের জন্য। আ—এই নিছক 'আমি' হওয়ার সুখ, শুধু নিজেকে দিয়েই ভ'রে থাকার এই মুক্তি! একেই কি বলে অপার্থিব আনন্দ— আর একেই কি আমরা খুঁজে-খুঁজে বেড়াই বইয়ের পাতায়, ঘাসের ফুলে, রাতের আকাশে—এ-ই কি সেই, মাঝে-মাঝে যার পরশ না-পেলে বাঁচি না আমরা, কিছুতেই বাঁচতে পারি না?

গাড়ি চলতে লাগলো; পাশ দিয়ে ভেসে গেলো শহর—অনেকটাই অচেনা এই শহর তাঁর কাছে। অচেনা বইকি—কলকাতায় আসাই হয় কতটুকু, এলেও কেমন ক'রে কেটে যায় দিনগুলি—সিনেমা, জিনিশ কেনা, ডাক্তার দেখানো, আত্মীয়স্বজন—এর মধ্যে সময় হয় না। সময়? ইচ্ছে থাকলেই সময় হয়, মন করলেই সময় হয়। মনে পড়েনি কখনো? ভেবেছি মাঝে-মাঝে, কিন্তু—কী জানি, এতদিন দেখা না-হ'য়ে-হ'য়ে সেটাই যেন অভ্যেস হ'য়ে গেছে, নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে, যেন এই ব্যবস্থাই

নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে উভয় পক্ষ। কী বললে, উভয় পক্ষ? এখানে আবার 'উভয়'টা পেলে কোথায়—সবই তো তোমার এক পক্ষের ভাবনা। কিন্তু তা-ই বা ঠিক বলি কেমন ক'রে—ভাবতে গেলে 'উভয়ে'র একটু আভাস কি ধরা পড়ে না? শুনি তো ঘুরে বেড়ায় নানা দেশে, কিন্তু লেখকটির ভ্রমণ-পঞ্জীতে দিল্লির নাম উঠলো না কেন একবারও?

কাচের জানলার বাইরে স্রোতের মতো ব'য়ে গেলো কলকাতা—বড়ো-বড়ো বাড়ি, পার্ক, দোকান, মোড়ে-মোড়ে কত রাস্তার আঁকিবুঁকি—আর মনের উপর দিয়ে স্রোতের মতো ব'য়ে গেলো বছরগুলি।···কত কাল পর দেখা হবে? বারো, চোদ্দ, পনেরো বছর? না কি যুগযুগান্ত? না কি এক পলক? চোখ বুজলে মনে হয় যেন সেদিন সকাল।

মহিলাটি চোখ বুজলেন; বোজা চোখের অন্ধকারে ফুটে উঠলো মস্ত ফাঁকা মাঠ, শাদা ধুলোর রাস্তা, বটগাছের ঝিকিমিকি শরীর। সেই গাছের ছায়ায় ব'সে টেম্পেস্ট পড়া হচ্ছিলো একদিন। দুপুরবেলা, একটু মেঘলা, খুব হাওয়া ছিলো। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিলো কবিতা, পাতার মর্মরশব্দে ডুবে যাচ্ছিলো। কিছু শুনতে পাইনি, শুনতে চাইনি··· দেখছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়লো আমার চোখে—পড়া থেমে গেলো। কেউ উঠলাম না, কেউ কিছু বললাম না; হাওয়া ব'য়ে গেলো মাঠের উপর দিয়ে, আকাশে মেঘ ভেসে গেলো। বাড়ি ফিরে সেদিন অনেক চোরকাঁটা বাছতে হয়েছিলো শাড়ি থেকে। সেগুলো খামে ভ'রে দেরাজে রেখে দিয়েছিলাম।

গাড়ির মসৃণ গতি একান্তে একটু অনুভব করলেন ভদ্রমহিলা। অনেক দূর তো। তা হোক না—আরো অনেক দূর হোক, এমনি

আমাকে নিয়ে গাড়ি চলুক আরো অনেক সময়ের প্রান্তর পার হ'য়ে। দেখা হওয়া, কথা বলা—তার চেয়ে বরং এই কি ভালো নয়, এই মনে-মনে ভাবা, এই মনের মধ্যে কতকাল পর ফিরে পাওয়ার মণিময় মুহূর্তটি? যাকে ভাবছি তার বয়স ছিলো উনিশ, আমার মনে তার বয়স আর বাড়লো না—আর যাকে দেখতে চলেছি? কেমন দেখবো? কেমন আছে? খুব বই লিখছে, আশ্চর্য বই, নামের সঙ্গে 'বাবু' আর কেউ বলে না আজকাল—কিন্তু আছে কেমন? এখনো এত বোকা যে সংসারকে মানবে না, এত বড়ো বীর? ঐ একতলার ঘরে একজন চাকর নিয়ে—বেণু বলেছে সব—এ কী-রকম জীবন, কোনো রকম জীবন কি বলে একে? বিয়ে করলো না—করলোই না—এতদিন, এত দিনের মধ্যেও তাকে বাঁধতে পারলো না কোনো ভাগ্যবতী, কোনো মেয়েকেই মনে ধরলো না তোমার?

হঠাৎ একটি আশ্চর্য শিহরণ ভদ্রমহিলার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেলো একটি হাতের মুঠ বন্ধ করলেন, আস্তে-আস্তে ছেড়ে দিলেন আবার। ঘামছে? চামড়ার তলায় জ্বালা করছে নাকি মুখ? গরম—দিল্লির পরে কলকাতায় একটু গরমই মনে হয় জানুয়ারি মাসে। স্তুতি পরলেই হ'তো—নীল শাড়ি? হালকা-নীল? অদ্ভুত একটু হাসি ফুটলো মুখে, যেন নিজের কাছেই লুকোবার জন্য হাত দিয়ে চাপা দিলেন।

বোজা চোখের পাতার উপর রোদ লেগেই স'রে গেলো; গাড়ি ঘুরলো। চোখ খুলে অচেনা দেশে জেগে উঠলেন। পাঁচ রাস্তার মোড়—কেমন জায়গাটা, যেন সব পথ এখানে এসে মিলে গেছে। কিন্তু ভালো ক'রে দেখা না-হ'তেই গাড়ি বেঁকলো বাঁ দিকে, একটু পরেই আবার বাঁয়ে ঘুরলো।

শীতের শিকল

'আর কত দূর ?' ভদ্রমহিলা জিগেস করলেন ড্রাইভারকে।

'এসে গেছি। এই তো বাগবাজার।'

উত্তরটা বোধহয় আশা করেননি ইনি, শুনে একটু চমকালেন, অন্তত তাঁর ভঙ্গির একটু বদল হ'লো। এতক্ষণে সোজা হ'য়ে বসলেন, উন্মন চোখে চঞ্চলতা এলো। দৃষ্টি ফেললেন এদিকে-ওদিকে—চলতি গাড়ি থেকে যতটা দেখে নেয়া যায়। এ-ই বাগবাজার। অবাক হবার কিছু নেই এতে, নেহাৎই একটা ভৌগোলিক তথ্য এটা, কিন্তু ঐ তথ্যটুকুই অনুধাবনের যোগ্য হ'য়ে উঠলো এঁর মনে। লক্ষ্য করলেন ভাঙা ফুটপাত, ঘেঁষাঘেঁষি পানের দোকান, খাবার দোকান, তারপর গাড়ি যখন আবার বেঁকলো সরু গলিতে, চোখে পড়লো মোছা-মোছা অক্ষরে লেখা 'কাঁটাপুকুর লেন'। ভালো লাগলো গলির ছায়া, সোঁদা গন্ধ। আস্তে চললো গাড়ি, প্রায় দু-দিকের বাড়ির গা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, এঞ্জিনের অতি মৃদু শব্দটা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মতো শোনালো।

'থামলে যে ?'

'এই তো।'

'কোন বাড়ি ?

'ঐ যে সামনে ?'

মহিলাটি তাকিয়ে দেখলেন। সামনে পোড়ো জমি এক ফালি, খামকা একটা দেয়াল, ওপাশে বিবর্ণ একটা দোতলা। গাড়ি থেকে নেমে আস্তে এগিয়ে এলেন, চোখে পড়লো নম্বর লেখা একুশের দুই। কোনো দরকার ছিলো না, তবু নম্বরটা দেখলেন বেশ মন দিয়ে। কর্পোরেশনের ফলক নয়, দেয়ালের গায়ে আলকাৎরা দিয়ে

বাজে ক'রে লেখা। সবুজ দরজাটা ভেজানো, একটু ফাঁক হ'য়ে আছে। আস্তে ঠেলা দিয়ে ভিতরে এলেন। সরু একটা প্যাসেজ, উঠেই বাঁ দিকে চৌবাচ্চাওলা স্নানের ঘর, আর পাশেরটা—রান্নাঘর বোধহয়? কেমন চুপচাপ—স্তব্ধ—কেউ নেই? কে আবার থাকবে, আর তো কেউ থাকে না এখানে, যে থাকে সে তো নিঃশব্দেই থাকে।—কিন্তু আছে তো? বাড়ি আছে তো? হঠাৎ বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন থেমে গেলো, আর তার পরের মুহূর্তেই—যেই চোখে পড়লো ডান দিকের দরজাটা—ধোঁয়া লেগে-লেগে কালো-দেখানো নীল রঙের পরদায় ঢাকা দরজা—আর পরদার ফাঁকে একজন চেয়ারে-বসা মানুষের একটুখানি আভাস—ঐ আভাসটুকু চোখে পড়ামাত্র এমন ন'ড়ে উঠলো ঐ থমকে-থাকা হৃদযন্ত্র যে-রকম ঐ যন্ত্রটির পক্ষে আর সম্ভব নয় ব'লেই বহুদিন ধ'রে জেনেছিলেন ইনি। যৌবন—চিরন্তন যৌবন! কেউ জানে না কোথায় লুকিয়ে থাকে, কেউ জানে না কোথায় তার বাসা—কেমন ক'রে সে আসে, যায়, ফিরে আসে, চমকে দেয়; কত রূপে, রূপান্তরে, কত সূক্ষ্ম অফুরন্ত এঁকে-বেঁকে জীবন ভ'রে সে ব'য়ে চলে, কেউ কি তার হিশেব পেয়েছে কখনো? এই মহিলা—স্মিত, আত্মস্থ, সম্ভ্রান্ত, যাঁকে দেখে মনে হয় ইনি অভাবের মুখ ছাখেননি কখনো—কোনো অর্থেই না—মনে হয় ইনি জীবনের সঙ্গে ঝগড়া করেননি কোনোদিন, সময়ের উজান বাইতে যাননি, যৌবনের আকুল ফুল ঝরাতে-ঝরাতে শান্তভাবে ফলের দিকে এগিয়েছেন, সুন্দর ক'রে প্রৌঢ় হ'য়ে উঠছেন এখন—ঐ ময়লা পরদাটার বাইরে দাঁড়িয়ে ষোলো বছরের মেয়ের মতো কাঁপন লাগলো এঁর বুকের মধ্যে—কিন্তু এমন কখনো

কাঁপে কি কোনো ষোলো বছরের? ভদ্রমহিলা দেরি করলেন একটু, শাড়ির আঁচল টান করলেন, জোরে নিশ্বাস নিলেন একবার, তারপর দরজার পাল্লায় আস্তে দু-বার টোকা দিয়েই চ'লে এলেন ঘরের মধ্যে।

* . * *

অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখলো মৌলিনাথ। এক ঝলক রোদ এলো তার ঠাণ্ডা ঘরে, উজ্জ্বল একটি দিন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঐ লাল শাড়ি, জলজলে সিঁদুর, রক্তেমাংসে উদ্ভাসিত প্রতিমা—তার এই মৃত ঘর, এই মৃত মন—এখান থেকে কত দূরে এ-সব, কোন সুদূর পরপারে! যেন এই শীতের বিকেলে এখনো যেটুকু আলো আছে পৃথিবীতে, যেটুকু রোদ, স্বাস্থ্য, প্রাণের তাপ, তা অঞ্জলি ক'রে ধ'রে নিয়ে এলেন এই—এই ভদ্রমহিলা, এই অতীব শোভন মহিলাটি—আর কয়েক বছরের মধ্যে যিনি রীতিমতোই মোটা হ'য়ে উঠবেন মনে হয়, থুতনিতে হয়তো ভাঁজও পড়বে—কিন্তু যাঁর মুখের রেখায়, চোখের ছায়ায়, শরীরের ভঙ্গিতে, এই পূর্ণ, সমৃদ্ধ অবস্থার কোনো-এক ঠিকানাহীন অন্তরালে, এখানো চেনা যায় অন্য একটি মেয়েকে—সেই হালকা-নীল শাড়ি-পরা অন্য মেয়ে, যার ঠোঁটে হাসি আর চোখের কোণে বিষাদ, আর যার পাণ্ডুর গালে হঠাৎ এক-একটি রঙের ফোঁটা দেখা দিয়ে কী জানি কোন গোপন লজ্জা ধরিয়ে দেয়। অন্তত, মৌলি দেখামাত্রই চিনলো।

মহিলাটি—মেয়েটি—ঘরের মধ্যে বেশি দূর এগোয়নি, মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়েছিলো গৃহস্বামীর চোখে চোখ প'ড়ে। একটু পরে উঠে

দাঁড়ালো মৌলিনাথ, তার ছাইরঙের আলোয়ানটা হালকা হাতে ফেলে দিলো পিঠ থেকে, এগিয়ে এসে বললো, 'এসো।' অতিথিকে বসতে দিলো তার পুরোনো-কেনা আরাম-চেয়ারে, নিজে দাঁড়িয়ে থাকলো টেবিলটায় ঠেশান দিয়ে। একটু সময় কেউ কোনো কথা বললো না। এই ঘর, যা বলতে গেলে সারাদিনই চুপচাপ থাকে, আর আজ এই দুপুরের ঘণ্টাগুলি ভ'রে একটু বিশেষ অর্থেই স্তব্ধ ছিলো—এই ঘরে অন্য রকম নীরবতা নামলো এখন—তা-ই মনে হ'লো মৌলির—বন্ধ্যতার নয়, ব্যর্থতার নয়—কোনো-একটা অর্থ যেন পেয়েছে এতক্ষণে, বলা যেতে পারে স্তব্ধতা ঠিক স্তব্ধ নেই আর, লক্ষ্য পেয়েছে, গতি পেয়েছে, চলছে। মৌলির কেমন আরাম লাগলো মনে-মনে, যেমন হয় জোর ক'রে ঘুম ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কাজ করার পর শেষ পর্যন্ত ঘুম যখন ছেয়ে নামে।

তারপর চিত্রা কথা বললো—'একটু জল খাবো।'

'জল? দিচ্ছি।' কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে দিলো মৌলি।

'খুব ঠাণ্ডা জল তো।'

'বড্ড ঠাণ্ডা, না?'

'আমার ভালোই লাগছে।' চিত্রার মুখের চেহারা তার কথার সমর্থন করলো। লালচে আভা গালের—উত্তর ভারতের স্বাস্থ্যকরতার প্রমাণ—এখন গভীর রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে সারা মুখ—প্রায় অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছে। রোদ লেগেছে গাড়িতে—এতক্ষণে তার মনে পড়লো—ছোটো-ছোটো ঠাণ্ডা চুমুকে জল খেলো, ফাঁকে-ফাঁকে তাকিয়ে দেখলো ঘরের চারদিকটায়। 'তুমি—বসবে না?'

'বসছি। গ্লাশটা দাও, রেখে দিই।'

'আমি রাখছি।' চিত্রা নিচু হ'য়ে গ্লাশ নামিয়ে রাখলো মেঝেতে, যখন সোজা হ'লো তার লাল চুল ন'ড়ে উঠে ঝলক দিলো মৌলির চোখে। এত লাল কেন, মৌলি বললো মনে-মনে, আমি ক্লান্ত, আমি ঘুমোতে চাই। হ্যাঁ—এতক্ষণে ঠিক বুঝেছে, ব্যাপারটা এই যে সে ক্লান্ত হয়েছে, তাই লিখতে পারেনি এতক্ষণ—কখনো-কখনো হার মানতেও তৈরি থাকা চাই, নয়তো শেষ যুদ্ধে জেতা যায় না।

আবার একটু চুপচাপ। ব্যাগ থেকে ছোট্ট সুগন্ধি রুমাল বের করলো চিত্রা, আস্তে চাপ দিলো মুখের এখানে-ওখানে, ব্যাগের মুখ বন্ধ ক'রে মৌলির দিকে তাকালো। 'তুমি—বোসো!'

মৌলি প্রথমে তার লেখার প্যাড বন্ধ ক'রে সরিয়ে রাখলো, তারপর চেয়ারটি ঘুরিয়ে নিয়ে বসলো ঠিক চিত্রার মুখোমুখি নয়, একটু আড় হ'য়ে। খুব সহজভাবে বললো, 'তারপর? কেমন আছো?'

আলাপ শুরু হ'লো। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়; এমন দু-জন, কোনো-এক কালে পরস্পরের জীবনে যাদের অংশ ছিলো, অনেকদিন পর দেখা হ'লে তাদের কথাবার্তা যে-সব দিকে সাধারণত চলতে পারে, এখানে তার ব্যতিক্রম কিছু হ'লো না। তখন যাদের চিনতো তাদের কথা উঠলো; যারা ইতিমধ্যে স'রে গেছে জীবন থেকে, তাদের কথা—মৌলিনাথের মা তাদের একজন। নতুন যারা এসেছে তারাও বাদ গেলো না। লিপিযোগ্য আলাপ বলে না একে, আবার পরিমাণেও প্রচুর নয় তেমন। থেমে-থেমে চললো, আস্তে, নিচু গলায়, চিত্রাই কথা তুললো পর-পর, কিন্তু তারও যেন বলার চাইতে দেখাতেই আগ্রহ বেশি, কথায় ভুলে চোখের ছবির টুকরোটিও যেন হারাতে

চায় না সে। ফাঁকে-ফাঁকে বার-বার ঘুরে এলো তার চোখ, ঘুরে এলো ঘরের চারদিকে—ধোঁয়া-লাগা পরদা থেকে আঁশ-বেরোনো সুজনিতে ঢাকা বিছানা পর্যন্ত, লক্ষ্য করলো বইয়ের শেলফ, বইগুলি—কোনো-কোনোটা উল্টো হ'য়ে দাঁড়িয়ে—বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে টুকরো খাম, সিগারেটের প্যাকেট, আস্ত একটা প্যাম্ফলেট বোধহয় সিনেমার বিজ্ঞাপন?—দেখলো ঝুল জমেছে সীলিঙের কোণে-কোণে, চুন খ'সে-খ'সে ঝাপসা ম্যাপ আঁকা হয়েছে দেয়ালে, মেঝেতে সূক্ষ্ম ফাটল ভাবনার মতো বেঁকে-বেঁকে চলেছে। গৃহস্বামীকেও দেখলো মন দিয়ে—ক্রমশ যখন তার মুখের রং স্বাভাবিকতা ফিরে পেলো, আর শরীরের ভিতরকার কলকব্জাও ভদ্রগোছেরই ব্যবহার করলো আবার—মনে-মনে টুকে নিলো সেই মুখে যা-কিছু এঁকে দিয়েছে এই বছরগুলি, কোনো-এক দিন যে-মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলো 'টেম্পেস্ট' নাটকটাকে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় তেমন বদল হয়নি, কিন্তু আস্তে-আস্তে ধরা পড়ে সময় ঠিক আদর ক'রে হাত বুলিয়ে যায়নি ওখানে, আর মানুষটির মনের ভূগোলেও আরো অনেক অদল-বদল হয়েছে ইতিমধ্যে। চুল তেমন ঘন নেই আর—আবার সিঁথি না-ক'রে উল্টিয়ে দিচ্ছে ব'লে চওড়া দেখায় কপালটা, আরো স্পষ্ট দেখায় কপালের শির—সেই 'রাজদণ্ড' তার—না কি কোনো অভিশাপের বিধিলিপি? রং ফর্শা হয়েছে আগের চাইতে—ফর্শা? না, ফ্যাকাশে, রক্তহীন?—অসুস্থ মনে হয় ভালো ক'রে দেখলে—সত্যি কি কোনো অসুখে ভুগছে ভিতরে-ভিতরে? যখন চুপ ক'রে থাকে বড্ড যেন গম্ভীর—ঐ নিবিষ্ট হ'য়ে শোনার ভঙ্গিটি ওর নতুন দেখছি—আর যখন ঠোঁটের কোণে হাসে তখন ঐ-যে চোখে আলোর

মতো ঝিলিক দেয়, সেটা হয়তো—হয়তো তার প্রতিভারই আভা, কিন্তু মনে হয় অস্বাভাবিক, অনিদ্রারোগীর উজ্জ্বল চোখের মতো অস্বাভাবিক।

আর মৌলিনাথ—ঐ ক্ষীণ, মন্থর কথোপকথনে সে যেটুকু অংশ নিলো তা প্রধানত শ্রোতার। যা বললো তা বেশির ভাগই কোনো প্রশ্নের জবাব, নতুন ক'রে প্রশ্ন করলো খুব কম, কিন্তু চিত্রা যখন তুচ্ছ কোনো প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োজনের বাইরেও খানিকটা ব'লে ফেললো, তখন সমস্তটা শুনলো মন দিয়ে। ক্লান্ত মনে হ'লো তাকে, যেন ঘুম পেয়েছে, অথচ ব'সে থাকতেই ভালো লাগছে বেশি। বসেছে শিথিল হ'য়ে চেয়ারে, পা দুটোকে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে, মাথাটি একটু হেলানো—ঠিক মুখোমুখি নয়, একটু আড় হ'য়ে—আঙুলে-ধরা সিগারেটের ধোঁয়া পেঁচিয়ে উঠছে চুলের উপর দিয়ে। এইভাবে ব'সে থাকলো দু-জনে, অনেক বছর পর দেখা হয়েছে যাদের, এই শীতের বেলায়, রোদ-না-লাগা ঘরের এই ধূসরতায়—অজাত কথার বেদনায় ভরা ধূসর হাওয়ায় এই দু-জন, যারা না-ব'লে এখন শুনতে চায়, না-ব'লে এখন দেখতে চায়, হয়তো আরো অনেক বেশি চায় অনুভব করতে আপন মনে।

তারপর কথাটা উঠলো। দৈবাৎ এমন হ'লো যে মৌলি—দু-জনের মধ্যে বলার অংশ যার ক্ষীণতর—তার মুখ দিয়েই প্রথম বেরোলো নামটা। এর আগে পর্যন্ত অন্য নানা বিষয়ে কথা হয়েছে, শুধু ঐ নামটি উচ্চারিত হয়নি একবারও। তার মানে এমন নয় যে ইচ্ছে ক'রে এড়িয়ে গেছে কেউ—চিত্রা নিশ্চয়ই সুযোগ খুঁজছিলো, অপেক্ষা করছিলো—আর অবশেষে কথাটা যখন উঠলোই, তখন দু-জনেই যেন বুঝে

নিলো, মেনে নিলো, যে এরই জন্য তারা অপেক্ষা করছিলো এতক্ষণ, যে অন্য সব কথা এরই ভূমিকামাত্র, এরই প্রস্তাবনা।

ঢাকার কথা হচ্ছিলো, পুরানা পল্টনের, কিন্তু স্মৃতিমন্থনে মৌলিনাথের যেন উৎসাহ নেই; পুরোনো দিনের কথা উঠলে যে-রকম কথা স্বভাবত সবাই ব'লে থাকে—যাতে কখনো একটু বেদনার ছোঁয়া লাগে, কখনো বা নিশ্বাস-ফেলা সুখের হাওয়া ব'য়ে যায়—সে-রকম একটি কথাও বেরোলো না সাহিত্যিকটির মুখ দিয়ে। খুব হালকা ক'রে সে ছুঁয়ে গেলো প্রসঙ্গটাকে; ভাবটা এইরকম যেন প্রাণের ধর্মে ফিরে যাওয়া নামক ঘটনা যেহেতু নেই, অতএব ফিরে তাকাতেও ইচ্ছুক নয় সে—না কি ফিরে তাকাতে তার ভয়, ভয়—যেহেতু মধ্যবয়সের সংকটকালে একবার পিছন ফিরে তাকালে বারে-বারেই তাকাতে হয়, একবার ধরা দিলে আর সহজে নিষ্কৃতি দেয় না অতীত। চিত্রা আড়চোখে একবার তাকালো; মৌলির চোখের পলকের কাঁপন দেখলো সে, সিগারেটের ছাই-ঝাড়া হাতের শ্লথ ভঙ্গি—একটু চুপ ক'রে থেকে অন্য কথা তুললো। দিল্লির কথা এবার; মন্দ না সিভিল লাইন্স জায়গাটা—সেখানেই ইউনিভার্সিটি—আর আজকাল তারা যে-বাড়িতে আছে তার বারান্দা থেকে যমুনা দেখা যায়, বাগান আছে সামনে, সবুজ ঘাস, মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে যে মৌলিনাথ একবার—কিন্তু মৌলিনাথের বোধহয় দিল্লির আবহাওয়া ভালো লাগে না?

আর এ-প্রশ্নেরই উত্তরে মৌলি বললো যে গীতাকে তখন দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে খুব ভালো করেছিলো চিত্রা, প্রশংসনীয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলো।

সেই দুর্বিনীত রক্তিমা হঠাৎ ফিরে এলো চিত্রার মুখে। অস্ফুট স্বরে উল্লেখ করলো তাদের তখনকার পারিবারিক অবস্থা; বাবার পেন্সন হ'লো সেবার, এদিকে বেণুর ডাক্তারি পড়ার খরচ—সে তাই ভেবেছিলো—

ঠিক!—মৌলি সমর্থন করলো সঙ্গে-সঙ্গে—ঠিক ভেবেছিলো চিত্রা। দিল্লি খুব ভালো জায়গা, কিন্তু বিলেত আরো ভালো, বিলেত আরো দূর। একটু হাসি ছুঁয়ে গেলো মৌলির ঠোঁট, ছুঁতে-না-ছুঁতেই মিলিয়ে গেলো।

হাসিটুকু বিঁধলো চিত্রাকে। তাকাতে গিয়ে চোখ নিচু হ'লো তার, বলতে গিয়ে বেধে গেলো কথা। সে কি ভালো করেছিলো? সে কি ভুল করেনি? কেন সে তখন গীতাকে নিয়ে এলো দিল্লিতে; কেন, তারপর, প্রোফেসরকে দিয়ে নানা দিকে চেষ্টা ছড়িয়ে দিলো যাতে তার বিলেত যাওয়ার উপায় হয়? বাবাকে সাহায্য করা—শুধু তা-ই? স্নেহ, হিতৈষণা, বোনের ভালো হোক—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—কিন্তু সেই ভালোর মানেটা কী? মৌলি যেখানে নেই সেখানেই গীতার ভালো—এই তো ছিলো শুভানুধ্যায়িনী দিদির মনে? তা-ই না? এই গোপন কথাটি—যা সত্যি বলতে গোপনই নয়, যা কেউ মুখে না-আনলেও সকলেই মেনে নিয়েছিলো সেই সময়ে পারিবারিক মহলে, আর যা এড়াতে, লুকোতে, চাপা দিতে চিত্রা তার নিজের মনেও ব্যর্থ ছলাকলা ছড়িয়েছিলো কম না—এই কথাটি আজ এতকাল পর যেন প্রথম বার সে নিজের কাছে স্বীকার করলো। প্রথম বার প্রশ্ন করলো নিজেকে: ঠিক করেছিলাম?

হ্যাঁ, মানতেই হয়—এখন আর না-মানারও কোনো অর্থ নেই—মানতেই হয় যে এইটে ঘটাতে রীতিমতো চেষ্টা করেছিলো সে—যাকে

ব'লে উঠে-প'ড়ে লাগা প্রায় সেই রকম—লম্বা-লম্বা চিঠি লিখেছিলো, লিখেছিলো মা-কে, গীতাকে—মৌলির মা-কেও বাদ দেয়নি—সে-চিঠি লেখায় বুদ্ধি খাটিয়েছিলো খুব, তার সাংসারিক বুদ্ধির সবটুকু, সেই সঙ্গে সূক্ষ্মতর সেই চাতুরী যা মেয়েদের কখনো দিতে ভোলেন না প্রকৃতি দেবী। যেন সে পণ করেছিলো যে গীতাকে উপড়ে আনা চাই। কিন্তু যদি…সে কিছু না-ই করতো? সব জেনেও, সব বুঝেও, চুপ ক'রেই থাকতো যদি সে, শান্তিতে থাকতো তার আপন সংসারে—তাহ'লে? তাহ'লে যা হ'তো—হয়তো বা হ'তে পারতো কোনোদিন—তা কি ঠিক তা-ই নয় যা ছিলো সবচেয়ে ভালো, নিখুঁতরকম সংগত ও সুন্দর? মৌলি আর গীতা—ওরা তো জন্মেছিলো পরস্পরের জন্য, তৈরি হয়েছিলো সব দিক থেকে; ওরা মিলতে পারলে সার্থক হ'তো দু-জনে, আলো হ'তো অন্য আরো জীবন, এই পর্বতপ্রমাণ সাধারণতার সংসারে কোথাও একটি উপত্যকা হ'তো যেখানে ফুল ফুটে এক বেলাতেই ঝ'রে যায় না।

চিত্রার পরিপুষ্ট চিক্কণ মুখে বিষাদের ছায়া নামলো। এই সম্ভাবনা, যা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, পুরানা পল্টনের সবুজ কাহিনীর উজ্জ্বল উপসংহার—একে এমন ক'রে মুখোমুখি কি আর কখনো দেখেছিলো সে? হঠাৎ এক মুহূর্তে, গীতার সমস্ত মন যেন স্বচ্ছ হ'য়ে বেরিয়ে এলো তার সামনে; গীতার ধৈর্য, স্তব্ধতা, ঐ অবিচলিত কর্মপালনের প্রতিজ্ঞা—তার অন্তরালে আজ—এতদিনে—চিত্রা দেখতে পেলো দীর্ঘ গোপন অপ্রতিরোধ্য প্রতীক্ষা, শুনতে পেলো সান্ত্বনাহীন হাহাকার। কত দুঃখ পেয়েছিলো গীতা—আর সে-দুঃখ কি আমিই দিয়েছিলাম?

না, না! তোর ভাগ্যকে দোষ দে গীতা, আর যদি কাউকে দুষতে হয় সে যে কোন মানুষ তা কি আমার মুখে শুনতে হবে তোকে? না, আমি ভুল করিনি; কিছুই হ'তো না রে, ওকে তুই পেতিস না কোনোদিনই, শুধু চোখে দেখে-দেখে জ্ব'লে-পুড়ে মরতিস সারাদিন। তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে;—শেষ পর্যন্ত বিমলেন্দু—কিন্তু তাও ভালো। সত্যি তা-ই না? বল, গীতা, সত্যি ক'রে বল—তুই কি তেমন মেয়ে আমার কথায় দিল্লি চ'লে আসবি—নিজের ইচ্ছেতেই এসেছিলি তুই, এসেছিলি—ভুলতে, জুড়োতে, বাঁচতে। না, কিছু হ'তো না—আমি তো জানি ওকে—তুই যত ভালো ক'রে জানিস আমিও প্রায় ততটাই—নিজের ইচ্ছা, নিজের ভাবনা, তার বাইরে কিছুই কি ও দেখতে পায়, কাউকেই কি ওর চোখে পড়েছে কোনোদিন? অন্ধ, অন্ধ, কঠিন; নিজের 'পরেও নিষ্ঠুর হওয়া যার স্বভাব, তার কাছে তোর কি কোনো আশা ছিলো?

কিন্তু কে জানে? কে জানে মৌলিরই মনের বদল হ'তো না কোনোদিন? যদি কোনোদিন খুলে যেতো তার চোখ, সেই তার অন্য চোখ তুলে গীতার দিকে তাকাতো যদি? তা কখনোই হ'তো না—এই আশ্বাসের কথা, সান্ত্বনার কথা, কেউ কি শোনাতে পারে চিত্রাকে? দেখা, শোনা, কাছাকাছি থাকা, কণ্ঠের স্বর, শরীরের তাপ—এর বাইরে আর কী আছে মানুষের, এর বাইরে যা-কিছু সবই তো শুধু ছায়া, শুধু স্মৃতি! সান্নিধ্য ছাড়া জন্ম নেই, ঘনিষ্ঠতায় আশাতীতের জন্ম হ'তে পারে। অমন-যে ঠাণ্ডা কাঠ, তাতেও ঠোকাঠুকি হ'তে-হ'তে আগুন জ্ব'লে ওঠে—আর এ তো মানুষ, এ তো রক্তমাংস। কিন্তু না, কোনো পথ আর থাকলো না তার, একেবারে

চোখের বাইরে চ'লে গেলো।...কেন হ'লো এ-রকম? এই ঘটনায় তারও যে কিছু অংশ ছিলো তা যেন তখনকার মতো ভুলে গেলো চিত্রা, অবাক হ'য়ে ভাবলো—কেন হ'লো না, যা হওয়া উচিত ছিলো তা হ'লো না কেন। এই তো মৌলি—তার চারদিকে বই, কাগজ—শুধু কাগজ—এমনি সে ব'সে থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—এমনি ক'রে সে বেঁচেছে আজ কত বছর ধ'রে এই ঘরে—কিন্তু বেঁচেছে কিনা কে জানে। চিত্রা আড়চোখে আবার লক্ষ্য করলো মৌলির মুখের পাণ্ডুতা—অস্বাস্থ্য—আর তার চোখের প্রতারক প্রতিভা, অনিদ্রারোগীর চোখের মতো উজ্জ্বল। দেখতে পেলো—একদিন যাকে দেখেছিলো পৃথিবীর যুবরাজ, দিন-রাত্রির অধীশ্বর, তাকে আর দেখলো না চিত্রা—হঠাৎ দেখতে পেলো অন্য এক মানুষ, যে-মানুষ—তবে কি তা-ই সত্যি?—বাইরে প'ড়ে আছে—জীবনের বাইরে প'ড়ে আছে।

বুকের মধ্যে টান পড়লো চিত্রার, ভিতরটা যেন ব্যথা ক'রে উঠলো। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হ'লো তার: ষোলো বছর আগে মিতু যখন জন্মেছিলো, আর তার তিন দিন পরে রসের প্লাবন টনটন ক'রে উঠেছিলো তার বুক ছাপিয়ে, আজ মৌলির সামনে ব'সে, মৌলির দিকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য সেই কষ্ট ফিরে এলো তার স্নায়ুতে, সেই রোমাঞ্চ ছুঁয়ে গেলো তার শরীর। সোজা হ'য়ে বসলো, যেন করুণ ক'রে হাসলো একটু, আর যখন কথা বলতে আরম্ভ করলো প্রথমে তার গলা প্রায় শোনাই গেলো না।

কিন্তু এই বাধো-বাধো ভাবটা একটু পরেই কাটিয়ে উঠলো চিত্রা। আত্মস্থ হ'লো আবার; যেন মনোমতো বিষয় পেয়ে এবার বেশ উৎসাহ

নিয়ে বলতে লাগলো। ক্রমশ স্পষ্ট হ'লো তার গলা, দ্রুত হ'লো লয়, যাতে মৌলি কোন ফাঁক না পায় কিছু বলার। হ্যাঁ—গীতার তখন ভালোই হয়েছিলো দিল্লি গিয়ে। শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছিলো না ওর, মিটফোর্ডের নরেন ডাক্তার শুকনো হাওয়া বাৎলেছিলেন। আর দিল্লিতে তো পড়াশুনোরও অসুবিধে নেই—মেয়েদের কলেজ তো সারা দেশের সেরা। কথা ছিলো বছরখানেকেই ফিরে যাবে—যতদিন-না কলেজের পালা সাঙ্গ হয়—কিন্তু থাকতে-থাকতে গীতারই যেন ভালো লেগে গেলো। আর বিলেত যাওয়া? ওটা নেহাৎই দৈবাৎ, নিছক বরাতজোর ছাড়া কিছু না। গীতার নিজের অবশ্য ইচ্ছে ছিলো খুব, অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলো রোডস ট্রস্টে, কিন্তু আমরা কেউ ভাবিনি যে সত্যি-সত্যি ও পেয়ে যাবে স্কলারশিপটা। আসলে ও পায়ওনি ঠিক, যে পেয়েছিলো সে বোমার ভয়ে হ'টে গেলো—গীতা লুফে নিলো তক্ষুনি। তা ওকে দিয়ে যে ভুল করেনি সেটা ও দেখাতে পেরেছে যা-ই হোক, খুব ভালো করেছে অক্সফোর্ডে, প্রাইজ পেয়েছে, মেয়েদের ম্যাগাজিনের এডিটর ছিলো—কিন্তু মৌলি বোধহয় জানে সব খবর, চিঠিপত্র তো পেয়েছে মাঝে-মাঝে?

না? চিঠি লেখেনি ওরা? বিমলেন্দু—এক কালের সেরা ছাত্র মৌলিনাথের? সে-ও না? তা মৌলির কাছে ও-সব চিঠি—কী বা মূল্য তার, শুধু সময় নষ্ট। বোধহয় শোনেনি বিমলেন্দুর খবর? হ্যাঁ, ভালোই—ডি. ফিল. নিয়েছে অক্সফোর্ডে, তার থীসিসের সুখ্যাতি করেছেন প্রোফেসররা, রিভিয়ু অব ইংলিশ স্টডিজ-এ তার লেখা বেরিয়েছে হেনরি জেমস না কি জেমস জয়স কাকে নিয়ে ঠিক মনে পড়ছে না। যাক—খুব ভালোই দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত—যা গেছে এ-ক'টা বছর ঘোর

যুদ্ধের দুশ্চিন্তা ক'রে-ক'রে! কবে ফিরবে? বাঃ, ওরা তো ফিরেছে—এই তো একমাসও হয়নি—একসঙ্গেই ফিরেছে দু-জনে—হ্যাঁ, এখানেই, কলকাতায়—আর ওদেরই জন্য তো কলকাতায় আসতে হ'লো আমাদের।

ওদেরই জন্য, তার মানে ওদের—? হ্যাঁ, ঠিক তা-ই—মৌলির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলো চিত্রা—আওয়াজ তার নিচু হ'লো আবার, মুখে যেন বিষাদের মতো গম্ভীরতা ছড়িয়ে পড়লো অথচ একটু হাসিও থাকলো ঠোঁটের কোণে। হ্যাঁ, ওদের বিয়ে। আরো আগেই হ'তে পারতো—কেন হয়নি কে জানে—তা হয়নি ভালোই হয়েছে, এই বেশ ভালো হ'লো দেশে ফিরে আত্মীয়স্বজন সকলের মধ্যে—সত্যি খুব সুখের কথা, তা-ই না? বিয়ে এখানেই—বেণুর বাড়িতেই—এই সাতাশ তারিখে: তার মানে হচ্ছে সামনের বেস্পতিবার। একটা অনুরোধ আছে মৌলির কাছে, বাড়ির সকলের একটা সমবেত ইচ্ছা আজ জানাতে এসেছে চিত্রা: মৌলি যেন বিয়েতে যায়; যাবে? যাবে তো? আর তার আগে আজ একবার—কিছু না, উপলক্ষ্য কিছু না, এমনি। একবার হোক না দেখা সকলের সঙ্গে আবার; দোষ কী? বাইরের কেউ তো না, শুধু আমরা বাড়ির লোকেরাই—সুখী হবে সবাই, আর মৌলি—তারও তেমন খারাপ হয়তো লাগবে না। অসুবিধে না থাকে তো এখনই, গাড়ি আছে সঙ্গে—কী? না, কিছু শুনবো না, যেতেই হবে—মানে, খুব যদি কাজের তাড়া না থাকে, এই তো ঘুরে আসবে খানিক পরেই—মনে হচ্ছে ইচ্ছে নেই তেমন?—তা একবার না-হয় অন্যের ইচ্ছেতে—কবে আর এমন হবে যে একসঙ্গে সবাই—রাখবে না কথাটা? ব্যাপারটা এই রকম যে মৌলিকে ছাড়া ঠিক

যেন সম্পূর্ণ হচ্ছে না, ফাঁক থেকে যাচ্ছে—সকলেরই মনের কথা সেটা—আচ্ছা কথা দিচ্ছি যখন ইচ্ছে চ'লে আসবে, একটুও জোর করবে না কেউ—শুধু একবার কাছে গিয়ে—যারা বন্ধু, যারা আপন জন—হ্যাঁ, বলতে গেলে আত্মীয় বইকি—তাদের কাছে একবার—চলো, মৌলি!—শেষের কথাটা ফিশফিশে গলায় বেরোলো।

এমনি বললো চিত্রা, এমনি ক'রে চালিয়ে গেলো তার নিপুণ বক্তৃতা, কুটিল ওকালতি—সত্য আর অসত্য মিশিয়ে, আবেগের সঙ্গে শুধু সেটুকু কপটতা যোগ ক'রে, যেটুকু না-হ'লে ভদ্রতারক্ষা হয় না। কথা শেষ ক'রে দুই হাত জড়ো করলো কোলের উপর; সাহসী চোখে, সতর্ক চোখে উত্তর খুঁজলো মৌলির মুখে। কিন্তু মৌলির চোখ নিচু হ'লো, নেমে এলো চোখের পাতা ভারি হ'য়ে। তার মনে হ'লো তারও কিছু বলার আছে উত্তরে—অনেক, অনেক-কিছু, অনেক আছে মনে করার, প্রশ্ন করার, মনে করিয়ে দেবার। চেষ্টা করলো ভাবতে, মনে আনতে, কোনো-একটি প্রশ্নের তীরে সূক্ষ্মতম কথার ফলা বসাতে। কিন্তু তাতে যেন শ্রম বড়ো বেশি, বড়ো বেশি দাবি করে তার কাছে—আর ঐ বছরগুলির ঝরা পাতার পথ আবার কি তাকে মাড়াতে হবে এখন? না, না—তার সময় নেই, সে ব্যস্ত, তার কাজ আছে। কী কাজ? কী করেছে সে আজ সারাদিন ধ'রে, এই দুপুরবেলার ঘণ্টাগুলি ভ'রে কী করছিলো সে এতক্ষণ? ঝাপসা লাগলো সব; অথচ মনে হ'লো ইতিমধ্যে কিছু-একটা ঘ'টে গেছে, কোনো-একটা বাধা কোনো দিক থেকে, গোলযোগ কিছু—অথচ উড়িয়ে দেয়া যায় না, সেটা যেন বিবেচ্য, মীমাংসাধীন, জরুরি—যেন কোনো অনুচ্চারণীয় আকাঙ্ক্ষার দিকে মরচে-পড়া দরজা খোলার শব্দ হ'লো। এলো উষ্ণতা এই শীতের

দেশে তাকে ঘুম পাড়াতে, এলো কেউ, অন্য কেউ, অন্য কিছু কানে-কানে গান গেয়ে তাকে ক্লান্ত ক'রে দিলো, ক্লান্ত হ'তে শেখালো। আর তাই, যেহেতু সে ক্লান্ত, তার ঘুম পেয়েছে, ঘুমোতে চায়—তাই মৌলি কোনো কথাই বললো না—কোনো প্রশ্ন, তর্ক, প্রত্যুত্তর, কিছুই না—শুধু মাথাটি একটু হেলিয়ে দিলো চেয়ারের পিঠে, আর চিত্রা তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললো—চলো যাই।

*　　　*　　　*

সেই ছোটো, কালো গাড়িটি আবার যখন মৌলির দরজায় দাঁড়ালো, রাত তখন বারোটা প্রায়। নামতে একটু দেরি করলো মৌলিনাথ।

'আচ্ছা, বেণু!'

'আচ্ছা, মৌলিদা! থ্যাঙ্কিউ!'

'একবার আসবে নাকি ভিতরে?'

'এখন আর থাক।' হাতের পিঠে হাই চাপলো বেণু। নিচু হ'য়ে দেখে নিলো পেট্রল আর কতটা আছে; মুখ তুলে বললো, 'বিয়ের দিন আসবেন কিন্তু ঠিক!'

উত্তরে কথা না-ব'লে বেণুর কাঁধে আস্তে একবার হাত রাখলো মৌলি। সিগারেট বের ক'রে এগিয়ে দিলো তার দিকে।

'ওঃ, বাঁচালেন! আমার আবার—' বেণু পকেট চাপড়ালো।

'নেই বুঝি? প্যাকেটটা রাখো তুমি।'

'আপনার?'

'আমার আছে। আ-চ্ছা।'

শীতের শিকল

মৌলি গাড়ি থেকে নামলো, একটু স'রে দাঁড়ালো ইট-বের-করা দেয়ালটা ঘেঁষে। পোড়ো জমিটুকুতে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো বেণু, সিগারেট-ধরা হাত তুলে বিদায় জানালো। গলির ফাঁকে অদৃশ্য হ'লো গাড়ির পিছনের লাল চোখ। এতক্ষণে মৌলি বুঝলো যে রাত হয়েছে, অনেক রাত হয়েছে।

তার সাড়া পেয়ে উঠে এলো বিশ্বস্ত কুলপ্রদীপ। উনুনের নিবন্ত আঁচে রান্নাঘরে সে ঝিমুচ্ছিলো এতক্ষণ; লালচে চোখের দৃষ্টি হেনে জিগেস করলো, 'খাবার আনবো?'

'না।'

মৌলি আর দেরি করলো না; ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লো। অন্ধকারে তার চোখে লাগলো গ্যাসের বাতিটা—রোজই লাগে—ঠিক তার জানলার বাইরে নিষ্পলক চোখ—তার অনিদ্রার নিত্যসঙ্গী, তার স্বপ্নের প্রহরী, তার শত্রু, অভিভাবক। ভেবেছিলে তোমাকে ছাড়াতে পারবো না, এড়াতে পারবো না তোমার পিশুন দৃষ্টি, ভাঙতে পারবো না ডাইনি-জাদু তোমার? না, না! আমার সব স্বপ্ন তুমি জানো না এখনো, এখনো দু-একটি রত্ন আছে আমার—লুকোনো আছে সম্ভাবনার, সতর্কতার পরপরে।

মৌলি কপালে হাত রেখে গ্যাসের বাতিটা আড়াল করলো, কিন্তু চোখ বুজলো না। অন্ধকারে, তার খোলা চোখের সামনে, ভেসে উঠলো দৃশ্য—মানুষের চলাফেরা, ভঙ্গি। হাওয়ায় উড়ে এলো চেনা গলার স্বর। কোথায় ছিলো সে এতক্ষণ? অন্য এক দেশে, অন্য এক জগতে। সে কি সেখানে বিদেশী, আগন্তুক, ক্ষণকালের অতিথিমাত্র? প্রথমে তা-ই মনে হয়েছিলো তার, যখন চিত্রার সঙ্গে

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায়, ঘরে এসে দরজার ধারে দাঁড়ালো। চোখের পাতা মিটমিট করেছিলো কয়েকবার, যেমন হয় ভুল ক'রে কোথাও এলে, কিংবা যেমন প্রবাস থেকে ফিরে এসে নিজের বাড়িও হঠাৎ মনে হয় অন্য রকম। কিন্তু তারপর—প্রথম ক-টি কথা যেই বলা হ'লো, দেখা হ'লো চারদিকে একবার তাকিয়ে—তরুণ-তরুণী, শিশুরা, মৃদুভাষিণী বৃদ্ধা—যে-মুহূর্তে এ-সব টুকরো ছবি পরস্পরে গ্রথিত হ'য়ে চলমান একটি দৃশ্য হ'য়ে উঠলো তার চোখের সামনে, তখন থেকে কিছুই তার করবার থাকলো না—কিছু করবার, ভাববার, বলবার চেষ্টা থেকে ছিন্ন হ'য়ে ভেসে গেলো সে, অথচ নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতো লক্ষ্যহীন নয়, তাকে অলক্ষিতে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তন্ময় একটি হাওয়া—চারদিকের আবহাওয়া। হ্যাঁ, একটি আবহাওয়া—স্পষ্ট অনুভব করলো সে, যদিও কোনো বিশেষণ খুঁজলো না, নাম দিতে চাইলো না—দেয়ালের ছবি, চেয়ারের কুশান, উৎসবের আর স্মৃতির সূত্রে বাঁধা এই কয়েকজন মানুষ, এই সমস্তর যেটি যোগফল, উপজাতক—সেই আবহাওয়া ঘিরে ধরলো তাকে, নিবিড় হ'লো ক্রমশ, তার সম্মতির বা প্রতিবাদের অপেক্ষা না-রেখে শোষণ ক'রে নিলো কেমন ক'রে;—আর সে, মৌলিনাথ, সে শুধু ব'সে থাকলো, চেয়ে দেখলো, হাসলো কখনো ছোট্ট কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়ে, কথা বললো যখন যেটুকু দরকার—ব'সে থাকলো নিষ্ক্রিয়, অনুত্তেজিত, সুস্থির, সংবেদনশীল।

চা এলো; আলো জ্বললো ড্রয়িংরুমে। টুংটাং পেয়ালার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে কথা চললো, মাঝে-মাঝে হাসি;—মাঝে-মাঝে মুখের সে-সব বিশিষ্ট ভঙ্গি, যা বলার সময় কি শোনার সময় হঠাৎ এক-একটি

ছবি হ'য়েই মিলিয়ে যায়। সেই সব মোলায়েম বিষয় নিয়েই কথা উঠলো পর-পর, যা দিয়ে মানুষ সফলভাবে ভুলিয়ে রাখে নিজেকে, ভুলে থাকে জীবনের জ্বালা, কীটদষ্ট রুগ্ন হৃদয়ের যন্ত্রণা: পলিটিক্স, যুদ্ধের পরে দেশের ভবিষ্যৎ, পাকিস্তানের সম্ভাবনা, এই সব মসৃণ ঢালুতে গড়াতে-গড়াতে সিনেমার দিকে কথা বেঁকলো, সাইগলের মৃত্যুর জন্য অতি গভীর দুঃখ প্রকাশ করলো বেণুর স্ত্রী, যে কিনা এতক্ষণ ঠোঁটে একটি মনোরম হাসি ফুটিয়ে অতিথিদের শূন্য থালার পুনঃপূরণের চেষ্টাতেই ব্যস্ত ছিলো বেশি। সাইগল থেকে গানের কথা—ততক্ষণে চায়ের বাসন সরানো হচ্ছে—আর গানের কথা যদি গান গাওয়াতে না-পৌঁছলো তাহ'লে তো এই সম্মেলনটাই অনর্থক বলতে হয়। তাই চেয়ার ঠেলে-ঠেলে জায়গা করা হ'লো মেঝেতে, হালকা পায়ে ছোট্ট তিনটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো—বেণুর প্রথমা, আর দুই বন্ধু তার;—ঘুরে-ঘুরে নাচলো তিনজনে, কখনো হাতে হাত ছুঁয়ে, কখনো স'রে-স'রে গিয়ে, কখনে পিঠে পিঠ দিয়ে ছন্দে-বাঁধা ব্যায়ামের ভঙ্গিতে; সঙ্গে টিংটাং গীটার বাজালো মিতু, আর হিম—মিতুর ভাই—সে এ-সব মেয়েলি বিষয়ে অত্যধিক অবজ্ঞা দেখিয়ে আলগোছে স'রে দাঁড়ালো এক কোণে, কিন্তু লুটিয়ে-পড়া চুলের তলায় তারও চোখ দেখতে-দেখতে নেচে উঠলো। সুন্দর ছেলে, হিম, সুন্দর ছেলেমেয়েরা! নাচের সঙ্গে গানও গাইলো ওরা—খুব একটা ছেলেমানুষি চপল গান—লাফানো তালের চটপটে সুরে বসানো; যখন সুর চড়লো তখন গলার পরদা স্থির রাখতে গিয়ে এ ওর চোখে তাকিয়ে ওরা হেসে ফেললো।

ঘণ্টা কাটলো, আরো ঘণ্টা; মৌলিকে ফাঁকি দিয়ে ব'য়ে গেলো

সময়, সময়ের দাঁতের ধার অনুভব করা আর সম্ভব হ'লো না তার পক্ষে। আবছা কেমন মনে হচ্ছিলো যে উঠলে হয় এবার, কিন্তু বিদায় নেবার ফাঁকটুকুই যেন জুটছিলো না—অথচ কেউ যে তাকে পিড়াপিড়ি করছিলো তেমনও নয়, সব সময় স্বতন্ত্রভাবে তাকে লক্ষ্যও করছিলো না, খুব সহজেই মেনে নিচ্ছে তাকে, আছে ব'লেই ধ'রে নিচ্ছে যেন—এটাই তার সত্তার কোন গভীর স্তরে স্পর্শ করলো তাকে; ভালো লাগলো তার, মনে হ'লো যেন নিজের ভার নেমে গেছে হঠাৎ, বাধ্যতা আর নেই, কথা বলার, চিন্তা করার, কাজ করার কোনো বাধ্যতা নেই আর। হ্যাঁ—এতই সব সহজ এখানে, সজীব, স্বতঃস্ফূর্ত, যে একবার তাকে একা ফেলেও চ'লে গিয়েছিলো অন্যেরা—যখন ড্রয়িংরুমের পালা ভাঙলো আর এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো সবাই—সে ব'সে ছিলো দক্ষিণের বারান্দায়, গোলাপি রঙের শেড-পরানো আলোর তলায়, কোলের উপর তিন মাসের পুরোনো 'ল্যানসেট' পত্রিকা—নেহাৎই অভ্যেসের বশে তুলে নিয়েছিলো টেবিল থেকে। তাকিয়ে দেখছিলো ড্রয়িংরুমের দিকে, তার ওপারে লম্বা সরু খাবার ঘর—এরই মধ্যে রাতের খাওয়ার টেবিল সাজানো হচ্ছে—সেখানে দেখছিলো বিমলেন্দুকে—ড্রয়িংরুম পার হ'য়ে আসছে—শান্ত, মৃদু বিমলেন্দু, আগের মতোই খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, আগের চেয়েও পরিশীলিত মুখশ্রী—তার সমস্ত ভঙ্গিতে কোথাও কোনো আতিশয্য নেই, উৎসুকতাও নেই, কিন্তু প্রস্তুতি আছে অবিচল। নম্র গলায় বিমলেন্দু জানতে চাইলো মৌলিনাথের নতুন বইয়ের খবর, মৌলি সেটাকে ঘুরিয়ে দিলো ইংরেজি সাহিত্যের হালখবরের দিকে, কখন এসে মহেন্দ্রবাবু তাতে যোগ দিলেন। একটু পরে

মহিলারা এলেন সেখানে, তুলনা চললো দিল্লি লণ্ডন কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে কম খরচ এখন কোন শহরে। মৌলি এ-আলোচনায় যোগ দিলো না, শুনলোও না সবটা;—কিন্তু তার ভালো লাগলো ব'সে থাকতে, গোলাপি শেডের আলোর তলায় বেতের চেয়ারে—যখন এতগুলি মানুষের গলা এঁকে-বেঁকে ঘুরছে তার চারদিকে। হঠাৎ কী-একটা কথার পরে সে আবিষ্কার করলো যে মহেন্দ্র ঘোষ মানুষটা বেশ ভালোই;—আর যখন খেতে ব'সে প্রভূত পরিমাণ পরোটা কাবাব পোলাও কালিয়ার পরে ছানার পায়েসের সদ্গতি করতে-করতে পুরু কাচের চশমার পিছনে তাঁর চোখ দুটি ঘোলাটে হ'য়ে এলো, তখন তাঁকে দেখে উৎফুল্ল না হবে এমন চিত্ত কি মানুষে সম্ভব!

টুকরো হ'য়ে, বিক্ষিপ্ত হ'য়ে, কোনোরকম পারম্পর্য রক্ষা না-ক'রে অন্ধকারের পটের উপর দিয়ে ভেসে গেলো এলোমেলো তরল এই দৃশ্যগুলি। তারপর—হঠাৎ সব কালো হ'য়ে গেলো, মৌলির চোখের সামনে মুহূর্তের জন্য ঝুলে থাকলো শুধু অন্ধকার। মৌলি অপেক্ষা করলো, প্রতীক্ষা করলো; মনে-মনে জানলো তার ভুল হবে না। অন্ধকার কেটে গেলো আবার; বেরিয়ে এলো—ফিরে এলো—তার স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন আর নয়, সত্য। ঐ তো সে—গীতা—ব'সে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, হেঁটে যাচ্ছে, জলের গ্লাশ মুখে তুলছে, কী-একটা কথা বলছে মিতুকে। সেই গীতা—যেমন আগে ছিলো তেমনি, মনে হয় না একটুও তার বয়স বেড়েছে, মনে হয় যেন পরিবর্তনের জোয়ার-ঢেউ থমকে গেছে তার সামনে এসে—কিংবা যেটুকু তাকে ভিজিয়ে গেছে সে শুধু আরো শালীন ক'রে তুলতে, আরো স্বচ্ছ, সৌষম্যে আরো নিখুঁত। একটু রোগা হয়েছে, তার লালচেভাবের ফর্শা রংটি একটু ম্লান—ভালোই হয়েছে বিলেতের

খাওয়ার কষ্টে, না কি ভিতর থেকে তার চরিত্রই ফুটিয়ে তুলেছে নিজেকে, ব্যক্ত হয়েছে এতদিনে? দিশি তাঁতের শাড়ি পরেছে, শাদা ব্লাউজ গলায় কাঁধে অল্প কাজ করা, পরিষ্কার দুটি ভুরুর তলায় চোখের রং হালকা দেখায় আগের চাইতে, যেন চোখ দুটি ধুয়ে দিয়েছে অনেকবার, মুছে দিয়েছে অনেকবার এই বছরগুলি। বার-বার ঐ চোখে তার চোখ পড়েছে—দূর থেকে, কখনো বা কাছাকাছি ব'সে—লোকজন, কথাবার্তা, খাওয়া, সব-কিছু অতিক্রম ক'রে বার-বার—কেমন যেন মনে হচ্ছিলো মৌলির যে এতগুলি ঘণ্টার মধ্যে যখনই সে চোখ তুলেছে তখনই দেখতে পেয়েছে গীতাকে, হয়তো ঘরের অন্য প্রান্তে, হয়তো ড্রয়িংরুম পেরিয়ে খাবার ঘরে, কিংবা হঠাৎ তার একেবারে সামনে যখন একলা সে ব'সে ছিলো বারান্দায়। কোনো কথার বিনিময় হয়নি—যদি বা হ'য়ে থাকে সে খুব সাধারণ কিছু কথা—না, না, কথা না, সেটা বড্ড বেশি, সেটা সহ্য হবে হবে না—শুধু ঐ চোখ দুটি আমাকে দেখতে দাও, নির্মল চোখ তোমার—যেখানে আর প্রশ্ন নেই, বিক্ষোভ নেই, নেই মেঘ, মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক—কোন দূর সান্ধ্যঝড়ে যা-কিছু তুমি কুড়িয়েছিলে, তার কোনো চিহ্ন আর আঁকা নেই যেখানে।—আর যখনই গীতা স'রে গেছে, যখনই এমন হয়েছে যে গীতা হারিয়ে গেছে তার চোখ থেকে, তখনই সে দেখতে পেয়েছে চিত্রাকে, শুনতে পেয়েছে চিত্রার মুখে কথার সান্ত্বনা, সেই সঙ্গে এমন এক অরণ্যের মর্মর যা আরম্ভ হ'লে আর শান্ত হ'তে চায় না।

গীতা! চিত্রা!—বালিশের কানে নিশ্বাসের স্বরে উচ্চারণ করলো মৌলি—সেই দুটি নাম, যা একদিন সে ছেঁড়া চিঠির টুকরোর মতো

উড়িয়ে দিয়েছিলো হাওয়ায়, কিন্তু আজ কোন নতুন অর্থ দিয়ে তার নিদ্রাহীনতা ভ'রে দিলো। সে-অর্থ প'ড়ে দেখবে এত সাহস কি আছে তার? কিন্তু সে তো জানে—বুকের মধ্যে টান পড়েছে তাইতে তার না-বুঝে আর উপায় নেই—জীবনে যা সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে গভীর, তারই আধার আজ তার কাছে ঐ নাম দুটি, যেন ঝিনুকের দুটি খোলার মতো, যার মধ্যে বেশি কিছু নেই, কিন্তু সেটুকুই আছে যাতে মানুষের প্রয়োজন, যাতে মানুষ বাঁচে—তার ঘর, সংসার, শরীর, হৃদয়—কখনো যার অভাব হয় না সেই সব সাধারণ সুখদুঃখ। আ, চিত্রা—কেন তুমি আমাকে ভর্তি ক'রে নাওনি তোমার ইস্কুলে—জীবনের সেই আদিবিদ্যার মণ্ডপে—যেখানে কাঁচা পেয়ারা গাড়িতে ব'সে আরো ভালো লাগে, আর সেই গাড়ি থামলে দরজা খুলে দেয় কপালে-চুল-লুটিয়ে-পড়া ছোট্ট ছেলে! সেখানে কি কোনো পড়াই শেখা হ'তো না আমার—আমি কি এমন ক'রেই পালিয়েছিলাম যে কেউ আর ফিরে ডাকলো না আমাকে!···গীতা, তুমি! কিন্তু কেন তুমি কবিতা পড়লে, গীতা, তোমার চোখের হিরের ফোঁটা কবিতা প'ড়ে নিবিয়ে দিলে কেন—বোন হ'য়ে এলে কেন আমার কাছে, ডাকলে যদি আমারই গলায় ডাকলে কেন!···আবার? না, আর না, আর হবে না, আমি অনেকদূর এগিয়ে এসেছি, আমি বৃত হয়েছি—বিদ্ধ হয়েছি, গীতা!—আমার জন্য কিছু আর নেই এখন, শুধু মুহূর্তের মহিমার আস্বাদ—আর রিক্ততা—শূন্যতা—দিনের পর দিন।

বছরগুলি স্রোতের মতো ব'য়ে গেলো। কী করেছে সে, কী ঘটেছে তার জীবনে এতদিন? মৌলির মনে পড়লো তার মা-কে, মা-র মৃত্যু, তার মুক্তি—শোকের আমেজে মধুর-হওয়া মুক্তি তার। সেই তো ছিঁড়লো

পুরানা পল্টনের দড়িদড়া, চ'লে এলো কলকাতায়। তারপর? একদিকে তার সধূম কামাচার, আর এই ঘরে, ঐ একটি টেবিলে ব'সে-ব'সে, তার অসহ্য আহরণ, অকথ্য প্রতিদান। তৃপ্তি পায়নি, ইন্দ্রিয় তাকে ধুলোর ঝড়ে চাবুক মেরেছে; স্বাস্থ্য পায়নি, অসম্ভবের চেষ্টা তাকে বিকল করেছে; জীবন পায়নি, নিজে কিছু সৃষ্টি করবে এই স্পর্ধা বলি নিয়েছে তাকেই, তারই রক্তেমাংসে প্রবহমাণ প্রাণ। মেধার দীপ জ্বেলেছিলো ঘরে—কে জানতো এত ভীষণ তার ইন্ধন! কবি, শিল্পী, ভাবুক! না কি খঞ্জ, ক্ষয়িত, আতুর? চিন্তার প্রপাত, সংরাগের তুফান, শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সেই জ্ব'লে ওঠা আর নিবে যাওয়া—কিছু বলার, ব্যক্ত করার যন্ত্রণা, শূন্য থেকে বিশ্ববোধনের অত্যাচার! সেই হিমজ্বরে, আগুনজ্বরে ক্ষয় হ'তে-হ'তে কোথায় এসে ঠেকেছে সে, কোন চরম প্রান্তে—এর পরে আর ক্লান্তিও নেই, এর পরে তার ক্লান্তিও তাকে ছেড়ে যাবে, তখন আর কিছুই থাকবে না। মৌলিকে যেন অন্ধকারে ঘিরে দাঁড়ালো তার জীবনের বিধ্বস্ত বছরগুলি—পাংশু প্রেতমূর্তি সব—ছায়ার মধ্যে ছায়া হ'য়ে মিলিয়ে গেলো—আর সেই অন্ধকার পার হ'য়ে ভেসে এলো ছোট্ট তিনটি মেয়ের গান, নাচের সুর—জীবনের তুচ্ছ, মধুর রাগিণী। বিষাদ নামলো তার বুকের উপর, চাপ দিলো হৃৎপিণ্ডে, আঁকড়ে ধরলো কণ্ঠনালী, বেরিয়ে এলো তপ্ত কঠিন চোখের জলে। মৌলি নিস্পন্দ হ'য়ে প'ড়ে থাকলো, যেন কোনো নতুন দেবতার কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে, বালিশে মুখ চেপে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো—'হৃদয়, হৃদয়, আমার মৃত হৃদয়, তুমি জেগে ওঠো, বেঁচে ওঠো আবার।'

উপসংহার

একটি বসন্তের রাত্রি

'গীতা, বিমলেন্দু,

তোমাদের বিয়েতে থাকতে পারলুম না, ইচ্ছে ক'রেই থাকলুম না। যেখানে ভিড়, কথার, চোখের, মুখের ভিড়, সেখানে তোমাদের হারিয়ে ফেলতুম আমি: তোমাদের কাছে থাকবো, সঙ্গে থাকবো ব'লে, খুঁজে পাবো, ফিরে পাবো ব'লে, আমাকে চ'লে আসতে হ'লো কলকাতা থেকে দু-শো মাইল দূরে, আকাশের তলায়, শুদ্ধতার বুকে, নির্জনতায়। আমি ছেড়ে এলাম, পালিয়ে এলাম, ফিরে গেলাম: অনেক কালো, অনেক কাঁটা, অনেক আঁকাবাঁকা দূরত্ব পার হ'য়ে তোমার কাছে ফিরে এলাম, গীতা।

জায়গাটার নাম হট্টিমারিয়া। নাম শুনেই বুঝতে পারছো কেমন জায়গা। কোনো টাইমটেবিলে খুঁজে পাবে না একে, নিকটতম রেল-স্টেশন আট মাইল দূরে, পোস্টাপিশ পাঁচ মাইল। কাল ঝিকানির হাট—এদিককার বৃহত্তম, আর বলতে পারো একমাত্র ঘটনা: সকালে লরি যাবে, তাদের হাতে এই চিঠি পাঠিয়ে দেবো; কিংবা হয়তো—নিশ্চিন্ত হবার জন্য, এবং হাট দেখার জন্য, নিজেই চ'লে যাবো ভিণ্ডি ড্রাইভারের পাশে ব'সে। অতিশয় দ্রষ্টব্য হাট শুনেছি, রক্ত সেখানে আদিম ছন্দে লাফায় এখনো, ইস্পাতের ফলা-পরানো নখ দিয়ে পরস্পরের টুঁটি ছেড়ে জঙ্গি মোরগ, দশ গাঁয়ের ছেলে-বুড়োর চোখের সামনে যুবতীদের জাপটে ধ'রে টেনে নিয়ে যায় পাণিপ্রার্থীরা—আর মেয়েরা হাসতে-হাসতে অপহৃত হয়। সিংভূমের হৃদয়ের মধ্যে চ'লে এসেছি—এরা এখানে আদালত চেনে না, বই চেনে না, আর্ট কাকে বলে জানে না, ক্রাইম কাকে বলে বোঝে না—

বোঝে শুধু বিকেলের রোদ্দুরে ব'সে দল বেঁধে পচাই খাওয়া, আর সন্ধে হ'লে ছোট্ট একটি মাটির ঘর। এদের ভূতের ভয় বড্ড, সেইজন্য জানলা দেয় না ঘরে—কিন্তু জীবনের ভয় নেই, সময়ের ভয় নেই। সভ্যতা থেকে দূরে আছে এরা, তোমাদের বিয়ের রাতের কাছাকাছি।

আমি এদের তারিফ করি, ঈর্ষা করি, করুণা করি, এদের জন্য উচ্ছেদ ইচ্ছা করি আমি। কেন আর আছে এরা, ইতিহাসের উদ্বৃত্ত হ'য়ে কেন আর প'ড়ে আছে পৃথিবীতে? শুধু নৃতত্ত্বের গবেষণার জন্য? পাদ্রির হাতে মরার আগে মরার জন্য? বেড়াতে-আসা নাগরিকের রঙিন একটু আমোদের জন্য? না কি আমার মতো বুদ্ধিপীড়িত মানুষের শুশ্রূষার জন্য? কোনোটাই না; জানি এদের ও-রকম ক'রে ব্যবহার করাটা হীনতা;—কিন্তু সে যা-ই হোক, আপাতত আমার চেতনার ভার এদের মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম আমি, আমার সমস্ত ভাবনার দ্বন্দ্ব নির্বোধ প্রকৃতির পায়ে নামিয়ে দিলাম।

হট্টিমারিয়াকে আবিষ্কার করেছিলুম গেলো বছর, রাঁচি থেকে চক্রধরপুরে আসার পথে। বাস্ বিগড়োলো হঠাৎ, বোঝা গেলো দু-তিন ঘণ্টার ব্যাপার। বোকার মতো গাছতলায় দাঁড়িয়ে উদাসীন বনজঙ্গল নিরীক্ষণ করছি, এমন সময় পাহাড়ি পথে আশার দূত মোড় নিলো। ছোট্ট, লাল রঙের গাড়ি: হাত তুলে থামাতে যাচ্ছিলুম, নিজেই থামলো। মুখ বাড়িয়েই নেমে পড়লেন সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক। 'আপনি···? কী ভাগ্য আমার! কী সৌভাগ্য!' 'আমার সৌভাগ্য ততোধিক, কেননা—' 'বুঝেছি। আসুন।' যেতে-যেতে ভদ্রলোক বললেন কবে আমাকে 'বিচিত্রা' আপিশে দেখেছিলেন, আমার দশ বছর আগেকার একটা বইয়ের নাম করলেন। মুহূর্তের

জন্য নিজের উপর আমি খুশি হ'তে পারলুম বই লিখি ব'লে। একটু মুখ-বদল।

বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ার, সামনে আকাশ, ঘাস, গাছপালা, পাঁচ ঘণ্টা বাস্-এর ঝাঁকুনির পর হাত-পা ছড়াবার আরাম, আপাতদৃষ্টিতে নির্মানুষিক জনপদে হঠাৎ আতিথেয়তার ওয়েসিস। চা: তেমনি ভালো, যেমন ভালো লাগে চা শুধু পথে, কিংবা বিপথে বেরোলে; দুটি অলস ঘণ্টা: তেমনি ভালো, যেমন ভালো লাগে নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে শুধু ঘণ্টা দুই কাটিয়ে এলে। যেখানে গিয়ে বেশিদিন থাকি আমরা, তার চাইতে অনেক স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, স্মৃতি এঁকে যায় চলতি পথে অল্পক্ষণ থাকি যেখানে; যে-ইচ্ছে মিটলো না সেটা মনের মধ্যে ছবি হ'য়ে বেঁচে থাকে। আমাকে আবার বাস্-এর রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'যদি কখনো ইচ্ছে হয়, যদি কখনো সুবিধে হয়···খুব খুশি হবো।' স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম সেবার, ইচ্ছে নিয়ে ফিরে এলাম।

এ-সব ইচ্ছে কখনোই প্রায় পূর্ণ হয় না জীবনে: সেই পাহাড়ের গায়ে ডাকবাংলো, সেই শিরীষ-ফোটা বিকেলবেলার রেল-স্টেশন, সেই শহর ছাড়িয়ে বনের মধ্যে হঠাৎ-খুঁজে-পাওয়া রেস্তোরাঁ—ও-সব জায়গায় কখনোই আর ফিরি না আমরা। কিন্তু হট্টিমারিয়ার মনে-মনে প্রথম থেকেই এই ছিলো যে তার কাছে আমি আমার কথা রাখবো। সেই রাত্রে—যখন আবার দেখা হ'লো তোমাদের সঙ্গে, তিনটি ছোটো মেয়ের ছেলেমানুষি নাচের সুর কানে নিয়ে ফিরে এলাম—সেই রাত্রে ঘুমোবার আগেই আমি মনে-মনে জানলাম যে কালই আমাকে কলকাতা ছাড়তে হবে। আর হট্টিমারিয়া তখনই এসে হাজির হ'লো

আমার মনের সামনে—প্রয়োজনীয়, পর্যাপ্ত, প্রস্তুত। ওখানটাতেই প্রয়োজন আমার; যা-কিছু আমার প্রয়োজন সব ওখানে আছে। বুকের মধ্যে প্রার্থনার মতো নিঃশব্দ গান নিয়ে, অর্ধেক-লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে, সুখের মতো একটুখানি বিষাদ নিয়ে, পরের দিনই বেরিয়ে পড়লাম।

আছি সেই বাংলোতে, লম্বা, সরু, লুকিয়ে-থাকা বাংলো। এইজন্যে লুকিয়ে-থাকা যে দূর থেকে চোখেই পড়ে না, উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ ছেড়ে খানিকটা সমতল দিয়ে চলতে-চলতে হঠাৎ মোড় নিয়ে থামবে তোমার গাড়ি, আর তুমি একটু অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখবে গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অতিশয় নিমন্ত্রণকারী বাংলোটি। উঠে আসবে বারান্দায়, সামনে বাগান, আর দূরে—যেদিকেই তাকাও—আর-কিছুই নেই ঈশ্বরের মাটি ছাড়া। কোনো 'দৃশ্য' নেই এখানে, চোখের কোনো চাটনি নেই, আজকালকার বাংলা বইয়ের মতো রঙিন মলাটের বিজ্ঞাপন নেই কোথাও—মস্ত জগতের চোখের বাইরে, অখ্যাত, অজ্ঞাত, প'ড়ে আছে এই হট্টিমারিয়া। কিন্তু জানো, অজ্ঞাত ব'লে কোনো দুঃখ নেই এর—আকাশের তলায় রোদ পোহাচ্ছে শুয়ে-শুয়ে; ফুল ফুটছে, পাতা কাঁপছে, দিনের পর রাত হচ্ছে, এইটুকু নিয়েই সম্পূর্ণ এর সুখ।

গৃহস্বামী থাকেন বাংলোর পিছনে, লাউমাচা শব্জিফসলে সাজানো বাড়িতে। বাংলোটা গেস্ট-হাউস গোছের, রাজার কলকাতার আপিশের কর্মচারীরা আসেন মাঝে-মাঝে, বছরে একবার খোদ ম্যানেজর। রাজা মানে মীরপুরের রাজা—নানারকম ব্যবসা করেন তিনি, হট্টিমারিয়ায় চিনেমাটির খনি কিনেছেন, তারই তদারক করেন

এই ভদ্রলোক। ছোটো খনি, আর খুব নিঃশব্দ আর পরিষ্কার, তাল-তাল ছাইরঙের নমনীয় ঠাণ্ডা মাটি নিয়ে কারবার, হাতে নিলে দাগ লাগে না, গালে কপালে বুলোতে ইচ্ছে করে। খনিতে যেটুকু কাজ চলে তার কিছুই ঢেউ এসে পৌঁছয় না বাংলোয়—মাঝে-মাঝে লরির আওয়াজ ছাড়া—হো-মজুরদের যাওয়া-আসা, যন্ত্রপাতির চলাচল, রাজামশাইর লাভের অঙ্ক—সমস্তটাকে যেন গিলে খেয়ে চুপ ক'রে আছে অঢেল আকাশ। যেখানে আকাশ এত বড়ো, পৃথিবী এত প্রচুর, সেখানে মানুষের পরিশ্রমকে কী অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, কী তুচ্ছ! এই চিনেমাটির খনি হাট্টমারিয়ার আদিম শান্তিতে আঁচড় কাটতে পারেনি, বরং একটি বাংলো উপহার দিয়েছে জায়গাটিকে, একটি আতিথ্যপরায়ণ পরিবার, যেখানে আমি আপাতত আশ্রয় পেয়েছি।

স্তব্ধতা ছাড়া, সূর্যের ওঠা-নামার সঙ্গে-সঙ্গে আলো-ছায়ার রং-বদল ছাড়া, রাত্তিরে কুয়াশার আকাশে বাড়ন্ত চাঁদ ছাড়া, আর কোনো খবর নেই এখানকার। ভদ্রলোক সকালে উঠে কাজে বেরিয়ে যান, ফিরে এসে খেয়ে-দেয়ে ঘুম দেন দুপুরবেলায়, বিকেলে আবার আস্তে-আস্তে খনির দিকে যান একবার—আর ফাঁকে-ফাঁকে, মাঝে-মাঝে, একটু-একটু দেখা হয় আমার সঙ্গে, কথা হয়। তাঁর মুখে সব সময় হাসি, গলার স্বর নরম, জীবন সম্বন্ধে অভিযোগ কম, ছেলেপুলে অনেক। মাথায় প্রায় সমান-সমান গোলগাল বাচ্চারা—ক-জন এখনো ঠাহর করতে পারিনি—যখন-তখন বাপের জামা ধ'রে ঝুলে পড়ছে—দেখতে বেশ লাগে আমার। অবশ্য আমার কাছাকাছি বেশি ঘেঁষতে দেয়া হয় না তাদের—পাছে আমার লেখায় ব্যাঘাত হয়, কী ক'রে এঁদের ধারণা হয়েছে আমি এখানে এসেও লিখছি।

ভদ্রমহিলা—যখন অনেক ছেলেপুলে আর অধিকতর সংকোচ কাটিয়ে তিনি এক-আধবার আসতে পারেন—এই জংলি দেশে প'ড়ে আছেন ব'লে, আর আমার নানারকম কাল্পনিক অসুবিধের উল্লেখ ক'রে, ফিশফিশে গলায় বিলাপ করেন তিনি। এই ক-জনকে বাদ দিয়ে আর যে-মানুষটিকে এখানে মাঝে-মাঝে দেখতে পাচ্ছি, তার নাম—ঝিংকি বা ওনঝু বা ঐ-রকম কিছু—হো মেয়ে, কুচকুচে কালো, ধবধবে দাঁত, ফুর্তিতে উপচে-পড়া—সে আমার ঘর ঝাঁট দিয়ে দেয়, নিয়ে আসে ইঁদারা থেকে স্নানের জল, আর পথে যখন বাগানের মালি তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলে, তখন—দু-হাতে দুই ভরা বালতি নিয়েই—হেসে ওঠে হাজার পাখি একসঙ্গে যেন ডেকে উঠলো। সে কী হাসি—শুনলে মন ভালো হ'য়ে যায়, গীতা!

আমি যখন বাইরে আসি ছুটি নিয়েই আসি, কাজ বন্ধ থাকে। কিন্তু এবারের আসাটা একটু অন্যরকম, ভাবটা যেন উপরিওলার অনুমতি ছাড়াই চ'লে এসেছি, উপরিওলাও এসেছেন তাই সঙ্গে-সঙ্গে। সেই লিখতে-থাকা বইটা মাঝপথে হঠাৎ আটকে গেলো; উচিত ছিলো ওখানে ব'সেই কপাল কোটা, মাথা ফাটানো; কিন্তু ঐ দায়িত্বের প্রকাণ্ড ভার থেকে চিত্রা আমাকে মুক্তি দিলো। সে এলো আমার ঠাণ্ডা ঘরে, রুদ্ধ ঘরে; এসে বললে—হালকা হও, সহজ হও। তাই তো বাক্স গুছোবার সময় পাণ্ডুলিপিটাও বাদ দিলুম না, ঐ কাগজগুলোকে চোখে দেখে গা-বমি-বমি করলো না আমার, সাহস হ'লো নিজের মৃত্যুকে নিজের কাঁধে ব'য়ে বেড়াতে। ঐ মৃত্যু থেকেই নিংড়ে নিতে হবে নতুন জীবন: বাঁচতে হ'লে বার-বার মরতে হয়, গীতা, মরতে না-জানলে জীবন কী ক'রে নতুন হবে? এখনো অবশ্য লেখাটা বের

করিনি; ব'সে-ব'সে ভাবছি, লেখার কথা না, নানা কথাই ভাবছি— ঠিক ভাবছিও না, শুধু ব'সে আছি, হ'তে দিচ্ছি, হ'য়ে উঠছি। তার মানেই বইটার কথা ভাবছি—তাও না, আমিই হ'য়ে উঠছি বইটা, যেন অন্য কেউ আমাকে লিখে যাচ্ছে।

তোমাকে এই চিঠি: এই প্রথম এখানে এসে কলম ছোঁয়ালাম কাগজে। এ-চিঠি লিখতেই হ'লো; যখন আর না-লিখেই পারবো না, সেই মুহূর্তটির জন্য অনেকগুলো দিন আমি অপেক্ষা করেছি। আজ এসেছে সেই সময়। আজ আকাশ ভ'রে জ্যোছনা, আর হাওয়ায় যেন বসন্ত, হঠাৎ এখানকার কনকনে শীতের মধ্যে ফাল্গুনের একটি রাত্রি। আজ ডাক এলো তোমার, আর ফেরাতে পারলুম না, ধরা দিতে হ'লো। জানলার ধারে লণ্ঠনের আলোয় ব'সে-ব'সে লিখছি।

আমার একটি গোপন কথা বলবো তোমাদের। জীবন ভ'রে, দিনের পর দিন, আমার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছি আমি, আবার সেটাকে যত ভয় করেছি তেমন আর কিছুকেই না। তোমাকে জানি, গীতা; জানি তুমি কথাটাকে অহমিকার নমুনা হিশেবে নেবে না, আর তুমি— বুদ্ধিমান, মনোযোগী বিমলেন্দু, তুমিও আমার কথা বুঝবে। আমি-যে বই লিখি, না-লিখে পারি না, লোকে যাকে আর্ট বলে তারই ভাষায় জীবনটাকে তর্জমা না-করা পর্যন্ত আমি যে শান্তি পাই না, এর জন্য নিজেকে আমি যতটুকু তারিফ করেছি, তার চেয়ে ভয় পেয়েছি বেশি, নিছক ভয়, কাপুরুষ ভয়। কাপুরুষের মতো পালাতে চেয়েছি, লুকোতে চেয়েছি; পারিনি, আমার অসুস্থ, বিকৃত জেদটাকে বাগ মানাতে পারিনি। যত বছর ধ'রে আমি বই লিখেছি, বই ভেবেছি, বই খেয়েছি, বই নিয়ে ঘুমিয়েছি, তত বছর ধ'রে আমি মনে-মনে

চেয়েছি অন্য কেউ হ'তে, অন্যদের মতো হ'তে—ভালো, ভদ্র, ভদ্রলোক। তার চেয়েও বেশি ; আমি মানুষ হ'য়ে বাঁচতে চেয়েছি এই জগতে, সকলের মতো হ'য়ে ; যা আমি ভালোবেসেছি তা আমি সইতে পারিনি, যা আমি মানতে পারিনি তা আমি ঈর্ষা করেছি। আমি মহেন্দ্র ঘোষ হ'তে চেয়েছি, তুমি হ'তে চেয়েছি, বিমলেন্দু ; আর পাছে তা হ'য়ে যাই, তার যে-কোনোরকম সম্ভাবনাকেই গলা টিপে মেরেছি। এই আমার ইতিহাস : যা-কিছু আমি করেছি আর করিনি, যা-কিছু আমি ভেবেছি আর করিনি, সেই পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার ইতিহাস।

কিন্তু দুঃখ করি না। সব জেনেছি আমি : আতঙ্কের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। যদি আমি আর লিখতে না পারি, যদি আমি আর লিখতে না পারি। যদি ফুরিয়ে যায়, থেমে যায়, হারিয়ে যাই। কী হবে তাহ'লে, কী হবে, কী হবে, কী উপায় হবে আমার। কেমন ক'রে বাঁচবো, ম'রে গিয়েও বেঁচে থাকবো কেমন ক'রে। হিম হ'য়ে গেছে হাত-পা, বন্ধ হয়েছে নিশ্বাস। কিন্তু তবু তো শেষ পর্যন্ত হার হ'লো না আমার, বেরিয়ে এলুম। সেই রুদ্ধতার মধ্যে ভেঙে এলো চিত্রা, আমাকে টেনে নিয়ে গেলো মোহানার দিকে, নদী যখন সমুদ্রের কাছে এসে আরো বেশি চওড়া হয়, চাঞ্চল্য হারায়, জীবনের সেই মোহানার দিকে, গীতা। তোমাদের মিলনের মধ্যে এই আমি অর্থ পেলুম, এই নিঃশব্দ সঞ্চার, সমর্পণের সার্থকতা। যেখানে মেনে নেয়া মানে হেরে যাওয়া নয়, নুয়ে পড়া মানে দুর্বলতা নয়। ছোটো হবার শক্তি, হালকা হবার স্বাধীনতা। জীবনে যা আমি হারিয়েছি, ইচ্ছে ক'রেই হারিয়েছি, তার মূল্য বুঝে সবল হ'য়ে উঠলুম আমি। ধন্যবাদ তোমাদের—গীতা, চিত্রা, সব-কিছুর জন্য ধন্যবাদ।

একটি বসন্তের রাত্রি

রাত হ'লো, অনেক রাত হ'লো। এখানে সারাদিন চুপচাপ, আর সন্ধে হ'তেই রাত্রি, তবু মাঝরাতের বিশেষ একটি স্তব্ধতা আছে, হট্টিমারিয়াও তা থেকে বঞ্চিত নয়। চাঁদ চ'লে গেছে আমার চোখের বাইরে, জ্যোছনায় কালো-কালো গাছগুলো যেন নিজেদেরই ছায়ার মধ্যে মিশে আছে, হঠাৎ হাওয়ায় স্বচ্ছ হ'য়ে খুলে যাচ্ছে উঁচু ডালের ছোটো এক-একটি পাতা। চোখের মতো, তোমার চোখের মতো, গীতা। আমি কি জানি না যে আজকের এই হঠাৎ বসন্ত আমার জন্য তোমারই উপহার, আমি কি জানি না যে এই হাওয়ায় তোমাদেরই বিয়ের রাত্রি ভেসে আসছে আমার দিকে, আমাকে স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে তোমাদের হাতে রাখা হাত। তাই তো আর ভয় নেই আমার; এখন শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে—অন্য সব নিজে-নিজেই হবে। শুরু হ'য়ে গেছে এরই মধ্যে; এই রাত্রি ভ'রে তুলছে আমাকে, আমি বেড়ে উঠছি, আমার না-লেখা বই আমার মধ্যে বেড়ে উঠছে তোমাদের অপেক্ষমান সন্তানের মতো। মিলিত হও, গীতা, সম্পূর্ণ হও, ভালোবাসো। আমার জন্য থাক আমার নির্জনতা, শুধু তৈরি হ'য়ে থাকার এই নম্রতা, আমার ক্লান্তির কালো-কালো ফুলগুলি হো মেয়ের হাসির স্রোতে ভেসে যাক। আমি রওনা হলাম, বুকের মধ্যে নিঃশব্দ প্রার্থনা নিয়ে, সুখের মতো এক ফোঁটা বেদনা নিয়ে, আবার আমি পথে বেরোলাম: আর এই নতুন পথে চলতে-চলতে, পৃথিবীর ধুলো-হাওয়া গায়ে মেখে-মেখে, বৃষ্টির মতো শিকড়ে-শিকড়ে ব'য়ে যেতে-যেতে, হয়তো আমি নিজেকে সহ্য করতে শিখবো কোনোদিন, ক্ষমা করতে পারবো শেষ পর্যন্ত, কোনো-একদিন কোনো-একটি লেখা শেষ ক'রে জেনে যাবো যে আমার বেঁচে থাকাটা একেবারেই ব্যর্থ হয়নি।'